বঙ্গভারতী
প্রাঙ্গণ
সম্পাদক
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
মাঘ চৈত্র ১৪১৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৪১৩ ○ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭

তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচি

চিত্রসূচি

মূল্য ষাট টাকা

শিলং পাহাড়

সুখেন গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকবিতার আধুনিকতা

পিনাকেশ সরকার

আধুনিকতা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক ধারণা (Concept)। তার সঙ্গে একদিকে আছে একটি বিশিষ্ট সময়ের বোধ, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়সীমাকে উত্তীর্ণ হবার চেতনা। আমরা প্রায়শই কতকগুলি বহির্লক্ষণ দিয়ে 'আধুনিকতা'-কে সনাক্ত করতে চাই। তাদের মধ্যে কতকগুলি ইতিবাচক। যেমন— মানবিকতা, সংস্কারমুক্তি ও প্রগতি। আধুনিকতা সেখানে এক সুস্থ সবল জীবনাদর্শেরই অন্য নাম। ম্যাথু আরনল্ড আধুনিকতা বলতে একেই বুঝেছিলেন।[১] আবার এর বিপরীতক্রমে আধুনিকতা বলতে বোঝায়— সংশয়বোধ, অমঙ্গলচেতনা, ক্লান্তি-নৈরাশ্য-অবক্ষয় ও গ্লানির বোধ— যে লক্ষণগুলি এককথায় নেতিবাচক। পুরোনো রীতিনীতি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক মনোভঙ্গিও লক্ষ করা যায় এই আধুনিকতার মধ্যে। একজন বিশিষ্ট কবির ভাষায়, "দ্বিধাপন্ন মানুষের আর সমাজের নির্যাস (essence)-টাকে তুলে ধরাই আধুনিকতার চরিত্র। এর মধ্যে লুকোনো আছে একটা বিরুদ্ধাচরণের জোর, একটা প্রতিবাদের নিশ্বাস। একই সঙ্গে হ্যাঁ আর না-এর প্রতিঘাত জড়ানো থাকে সেই লেখার মধ্যে।"[২] আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজটি তাই খুব সরল নয়। তবে শিল্পসাহিত্যে এই আধুনিকতার ধারণাটিকে প্রয়োগ করতে গেলে আমরা দেখব, সেখানে কালগত সীমানাকেও যেমন কিছুটা মানতে হবে, তেমনি শিল্পের প্রকাশরীতির অভিনবত্বের দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার প্রশ্নটি শুধুমাত্র বিষয় বা ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রয়োগের দিকটিকেও মোটেই উপেক্ষা কবা চলে না।

রবীন্দ্র-কবিতায় এই আধুনিকতার সূচনা কবে থেকে? আত্মসচেতন ও বিশ্বসচেতন মনের এক দ্বন্দ্বময় অভিক্ষেপ আমরা হয়তো দেখতে পাব তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) থেকেই। বিষ্ণু দে বলেছেন, 'সংকট বা ক্রাইসিসবোধ, এই দ্বন্দ্বময় ক্রমিকতাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিস্বরূপের সবচেয়ে বড়ো কথা।'[৩] 'কবি-কাহিনী'র নায়ক কবির মধ্যে দেখি এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব। একদিকে—

হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত,
সমস্ত পৃথিবী দেবি, পারিত বেষ্টিত
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে।

অন্যদিকে প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের স্বরূপ দেখে শিহরিত কবির মর্মযন্ত্রণার ভাষারূপ—

কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব-মনে বিষ মিশাইয়া!
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,...

চরম বেদনার সঙ্গে নায়ক কবি লক্ষ করেন—

স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল
দুর্বল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জিতে!

ব্যক্তিমনের গুহা থেকে বেরিয়ে বিশ্বের দিকে তাকানো, বিশ্বের দর্পণে ব্যক্তির আর্তমুখটিকে লক্ষ করা— ব্যক্তি-বিশ্বের এই টানাপোড়েনে জেগে-ওঠা এক আধুনিক কবিস্বরূপকে আমরা হয়তো প্রথম দেখলাম 'কবিকাহিনী'-তেই।

তবু, 'কবিকাহিনী'তে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে নি। সেদিক থেকে স্মরণীয়, 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২)। সন্ধ্যাসংগীতের কবিতায় হয়তো সংহতি নেই, নেই বিন্যাস-সৌকর্য। কিন্তু এখানে আমরা সন্ধান পাচ্ছি বিবৃতিধর্মিতার বদলে আশ্চর্য কিছু প্রতিমার (image), যা সংশয়পীড়িত আর্ত কবিমনকে একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাল। কয়েকটি তেমন প্রতিমা :

ক) দিবা সে যেমন করে আসে / মরিবারে স্বামীর চিতায় / পশ্চিমের জ্বলন্ত সন্ধ্যায় (সন্ধ্যায়)
[তুলনীয় : 'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা' ('নিরুদ্দেশ যাত্রা' / সোনার তরী)

খ) মনোদুঃখে আত্মঘাতী / চিরনির্বাপিত-ভাতি / শত শত মৃত তার কার / মৃতদেহ রয়েছে শয়ান ('তারকার আত্মহত্যা')

[তুলনীয় : জীবনানন্দ দাশের 'হাওয়ার রাত' কবিতায়—
'যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে']

গ) হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ ('দুঃখ-আবাহন')

ঘ) মুখ দিয়া আঁখি দিয়া বাহিরিতে চায় হিয়া
শিরার শৃঙ্খলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায় ('অসহ্য ভালোবাসা')

ঙ) প্রাণের মর্মের কাছে / একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে / দুই হাতে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে / নিতান্ত উন্মাদসম ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্ ('দুঃখ-আবাহন')
[তুলনীয় : এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ / হতাস বিশ্বাস, এই ভাঙা বুক, / ভাঙা বাদ্যসম বাজিবে কেবল / সাথে সাথে দিবানিশি ('রাহুর প্রেম' / ছবি ও গান)]

এ-পর্যায়ের কবিতায় বার বার আসছে সর্বগ্রাসী শূন্যতার কথা, তার নানা প্রতিমা—

ক) জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে / নিদারুণ শূন্যতার ছায়া ('পরাজয়-সংগীত' / সন্ধ্যাসংগীত)

খ) গ্রাসিছে চাঁদের কায়া   ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার।

...

ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা।

...

আমি শুধু নেহারি পাখার অন্ধকার। ('সংগ্রাম-সংগীত' / ঐ)

এর সঙ্গে তুলনীয় 'মানসী' (১৮৯০)-র 'মরণস্বপ্ন' কবিতার এই ছবি :

গ্রাসিয়া আকাশকায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া,
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গনিতেছে মৃত্যুপল— এক, দুই, তিন।
...
কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লৌহভারে।
কাতরে ডাকিতে চাহি শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার।
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

একই সুতীব্র সত্তাসংকটের ছবি আছে 'ছবি ও গান' (১৮৮৪)-এ। 'রাহুর প্রেম' কবিতায় প্রেমের যে অ-রাবীন্দ্রিক দখলদারি মনোবৃত্তি (Possessiveness) প্রকাশ পেয়েছে, সেই জোরালো ভঙ্গিটি একধরনের 'অবসেশন' ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু মনোভাবটি এবং তার বহিঃপ্রকাশের ধরণটি নিঃসন্দেহে আধুনিক—

রোগের মতন বাঁধিব তোমারে / নিদারুণ আলিঙ্গনে—
মোর যাতনায় হইবি অধীর, / আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর / কিছু না রহিবে মনে।
গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া / সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর / তোর পাশে শুয়ে আছে।
... ...
বুকের ভিতরে ছুরির মতন, / মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন / রব আমি অনিবার।

ওই একই কাব্যগ্রন্থের 'পোড়োবাড়ি' (অনেককাল পরে 'বীথিকা' (১৯৩৫)-তেও ঐ একই নামে আর-একটি কবিতা পাই), 'নিশীথজগৎ', 'নিশীথচেতনা' কবিতাগুলিও স্মরণীয়। 'নিশীথজগৎ' কবিতায় রাত্রির যে ছবি আঁকেন কবি, তাতে ব্যক্তি হৃদয়ের গূঢ় আর্তনাদই যেন বেজে ওঠে চাপা স্বরে—

চরণে বাধিছে বাধা, পাষাণে বাজিছে মাথা,
কাঁদিছে বসিয়া—
অগ্নিহাসি উপহাসি উল্কা-অভিশাপশিখা
পড়িছে খসিয়া।
তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার
স্তব্ধ গগনেতে,
আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়িছে মাথা
মাটির পানেতে।

তেমনি 'নিশীথচেতনা' কবিতায় অন্ধকারের চিত্রকল্প—

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।

একই সূত্রে মনে করা যেতে পারে 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)-এর 'মানবহৃদয়ের বাসনা', 'অক্ষমতা', 'চিরদিন' কবিতাগুলি। এই কবিতাগুলিতে অন্ধকারের চিত্ররূপ অনেকক্ষেত্রেই সংকেতবাহী, তাৎপর্যপূর্ণ। 'মানবহৃদয়ের বাসনা' কবিতায় শ্মশান ও প্রেতচ্ছবি—

কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন!
অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়!
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আবার 'চিরদিন' কবিতায় স্তব্ধ নির্জন আঁধারপ্রতিমা—

গভীর অসীমগর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশমণ্ডপে শুধু 'বসে আছে এক 'চিরদিন'।

এই নৈরাশ্য ও সংকটবোধ ফুটে উঠেছে 'মানসী'র পূর্বোল্লিখিত 'মরণস্বপ্ন' বা 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'র মতো কবিতাতেও। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'তে বিশৃঙ্খলতার Cosmic চিত্ররূপ :

মনে হয় যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক—
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্য চন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষকোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি—
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল—
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশ দিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

এর সঙ্গে তুলনীয় 'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩)-এর 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতার এই অংশ—

ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল, টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,
আকাশের অনন্ত হৃদয়—
অগ্নি, অগ্নি, শুধু অগ্নিময়।

রবীন্দ্রনাথ কখনোই স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী নন। ফলে 'ঝুলন' বা 'বিশ্বনৃত্য' (সোনার তরী / ১৮৯৪)-র মতো কবিতায় ঝুঁকি নেবার কথা বলেন, যখন লক্ষ করেন জীবন হয়ে পড়েছে গতিহারা জাহ্নবীর মতো, দেখেন 'বসে আছে এক মহানির্বাণ / আঁধার মুকুট পরিয়া', তখন প্রতীক্ষা করেন এক মহাপরিবর্তনের, সংস্কারমুক্ত ত্রাসহীন আদর্শ জীবন-প্রকল্পের। আধুনিকতার এই সুস্থ সুষম সুষ্ঠু আদর্শের দিকটিকে যেমন তিনি বুঝতে চেয়েছেন, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিক জীবনের অস্থায়ী, ক্ষণিক, চঞ্চল, খণ্ডিত রূপটিও ধরা পড়েছে তাঁর

চেতনায়। 'নগরসংগীত' (চিত্রা/১৮৯৬) কবিতায় যেমন বলেন তিনি এই দ্রুত পরিবর্তমান প্রেক্ষণীতে অনিত্যতার বোধ থেকে :

সকলি ক্ষণিক খণ্ড ছিন্ন
পশ্চাতে কিছু রাখে না চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যুপাথারে।
...
স্থির নহে কিছু নিমেষমাত্র,
চাহে নাকো কিছু প্রবাসযাত্র—
বিরামবিহীন দিবসরাত্র
চলিছে আঁধারে-আলোকে।

এই ভাবনাটাই আরো জোরালো, আরো তীব্র হয়ে ফুটে উঠবে 'বলাকা'-পর্বে।

রবীন্দ্রকবিতার আধুনিকতার অন্যতম আর-একটি লক্ষণ— এর সংকেতধর্ম। 'সোনার তরী'-র যুগ থেকেই এর সূত্রপাত। 'সোনার তরী' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'ঝুলন', দেউল', 'বিশ্বনৃত্য', 'দুইপাখি', 'পরশপাথর' বা 'আকাশের চাঁদ'-এর মতো কবিতার কথা আলাদা করে মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে। Metaphor ও Symbol-এর প্রয়োগ এ সময় থেকেই আমরা দেখতে পাই। খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্যায়ের কবিতায়, 'লিপিকা'-র গদ্যরচনায় এবং রাজা-ডাকঘর-অচলায়তন-ফাল্গুনী ও পরবর্তী মুক্তধারা-রক্তকরবীর মতো নাটকে এই সংকেতময়তার আধুনিকতার ব্যবহার। নদী-নৌকো-মাঝি-ঘাট, পথ-পথিক, পাখি-খাঁচা-আকাশ ঘর-মন্দির-দীপ— এ-সব অতিপরিচিত উপকরণ নিয়েই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রকবিতার এক বস্তু-অতিক্রমী পরাজগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও যা হয়তো ইন্দ্রিয়াতীত। নঞর্থক বা ধ্বংসাত্মক মনোভঙ্গির বিপরীতে আধুনিকতার এ এক বিশ্বাসধর্মী ভুবন।

এই সাংকেতিকতার পাশাপাশি সহজ সরল কবিভাষার প্রয়োগ নতুন এক আধুনিকতা তৈরি করেছে 'ক্ষণিকা' (১৯০০)-র যুগের কবিতাচর্চার পর্বে। অনেক সময় বিনা আড়ম্বরে প্রায় প্রাত্যহিক বাচনভঙ্গির মধ্যেই সেখানে সঞ্চারিত হয়েছে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা। তেমন একটি দৃষ্টান্ত 'ক্ষণিকা'র 'স্থায়ী-অস্থায়ী' কবিতাটি। বোঝার সুবিধের জন্য পুরো কবিতাটাই এখানে উদ্‌ধৃত হলো :

তুলেছিলেম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা—
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা,
বাজল বুকে ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!
বেলা যখন পড়ে এল,
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে—
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!
আরো তোমার অনেক কুসুম
ফুটবে যথা-তথা,

অনেক গন্ধ অনেক মধু
অনেক কোমলতা।
হে সংসার, হে লতা!
সে ফুল তোলার সময় তো আর
নাহি আমার হাতে।
আজকে আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা
হে সংসার, হে লতা!

আধুনিক লিরিক-এর প্রতীকময়তা ব্যঞ্জনাধর্ম আশ্চর্য শিল্পরূপ লাভ করেছে এ কবিতায়। এর সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে নিতে পারি 'খেয়া' (১৯০৬)-র উৎসর্গ-কবিতার (জগদীশচন্দ্র বসুকে) এই পঙ্‌ক্তিগুলি :

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে,
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাবে— খেয়ার 'অনাবশ্যক' কবিতাটির কথা। ঐ কবিতার তিনটি অংশে পৃথকভাবে ছিল কবির এই অনুনয় : 'আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা / দেউটি তব হেথায় রাখো বালা!' প্রত্যুত্তরে মেয়েটি বলেছে :

ক) সে কহিল, 'ভাসিয়ে দেব আলো / দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।'
খ) সে কহিল, 'আমার এ যে আলো / আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।'
গ) সে কহিল, 'এনেছি এই আলো / দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।'

তেমনি লক্ষণীয়, 'অকারণে' শব্দটির তিনটি স্বতন্ত্র ব্যবহার :

ক) চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে / প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।
খ) চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে / প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।
গ) চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে / দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

'অনাবশ্যক' কবিতার এই বালিকাই যেন অন্যরূপে ফিরে এসেছে 'পলাতকা' (১৯১৮)-র 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতার 'ছোট্ট মেয়ে বামী' হয়ে। সেও চলেছিল প্রদীপ-হাতে 'তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে' ছাতে তার বাবার কাছে। হাওয়ার ঝাপটায় হঠাৎ মুঠোয়-ধরা প্রদীপ নিভে সে হয়ে পড়েছিল একা, বলে উঠেছিল, 'হারিয়ে গেছি আমি।' দুটি কবিতাই প্রতীকধর্মী, আধুনিক। মনে পড়বে, কবির একটি গানের কথা ('অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক'), যেখানে তিমির গহন রাতে নিজের আলো-ধরে-চলা কবি গর্বভরে পথ চলছিলেন, কিন্তু 'হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে, / হঠাৎ হাতে নিবল আমার বাতি।' আকস্মিক অন্ধকারে পথ-হারানো মানুষটি আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলেন— 'শক্তি আমার রইল না আর কিছু।' অন্য একটি গানে ('এ পথে আমি যে গেছি বার বার') পেয়েছিলাম এই আত্ম-আশ্বাস : 'একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা। / তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা।' এই উত্তরণের আস্থা পূর্বোক্ত গানে নেই, বরং সেখানে আছে এক অসহায় বিপন্নতার বোধ।

প্রতিমার নানা বিন্যাসে যেমন প্রতীকধর্ম নতুন নতুন তাৎপর্যে ফুটে ওঠে, তেমনি আপাত সরল কবি ভাষার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে এমন-সব গূঢ় সংকেত ভরে দেন, যা পাঠককে চমকে দেয় মুহূর্তেই,

আমরা ভাবতে বাধ্য হই— কেন এভাবেই বললেন কবি, অন্য কোনো ভাবে ভিন্ন কোনো ভঙ্গিতে কি উদ্ভিন্ন হতে পারত না কবির অনুভব? 'উৎসর্গ' (১৯১৪) কাব্যের ২৩-সংখ্যক কবিতায় যখন এরকম একটা ছবি পাই :

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা
নানা আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা
কর্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

তখন বৈপরীত্যের সংঘাতে জেগে-ওঠা এক আধুনিক মনেরই কি পরিচয় পাই না আমরা, এই একান্ত লিরিকের মধ্যেও? কিংবা 'গীতালি' (১৯১৪)-র ৬১-সংখ্যক কবিতার এই সূচনাচিত্রটি :

ওই যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলংকার।
ওই সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার॥

গানের মধ্যে এই চিত্রসংবেদনার আধুনিক রূপটি আমাদের চোখ-কানকে আকর্ষণ করে বার বার। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত :

ক) ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ
মৃদু হাসির অন্তরালে গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস

খ) সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে

গ) সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।

ঘ) যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে
দেয় আপনায় উজাড় করে।

ঙ) বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল।

'বলাকা' (১৯১৬)-র যুগ থেকে আধুনিকতার সংকটদীর্ণ রূপটি ক্রমশ জটিল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে রবীন্দ্রকবিতায়। অবশ্য তারও অনেক আগে 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতায় যুগসংকটের উপলব্ধি আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে। সেই সংকটকে কবি কখনো কখনো লক্ষ করেছেন আমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে, সংকীর্ণ সামাজিক সংস্কারগ্রস্ত পঙ্গুত্বে বা অন্ধতায়—

কর্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সংকীর্ণ রুধি দ্বার-বাতায়ন— (৫২-সংখ্যক)

তাই আক্ষেপ করেছেন কবি—

অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ—
আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ

নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ (৪৯-সংখ্যক)

অন্ধকারের এই চিত্রকল্পের পাশাপাশি এখানে আরো পাই নিরভিভাবক শূন্যতার ছবি—

যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে
অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে। (৫৯-সংখ্যক)

এই শূন্যতা বহন করে আনে শুষ্কতার দহনজ্বালাকে—

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা— কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ। (৮৬-সংখ্যক)

কিংবা—

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্ব-পানে চাহি।... (৮৭-সংখ্যক)

কখনো আবার এই ক্রান্তিকালের উপলব্ধি বিধ্বংসী যুদ্ধোন্মাদ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে। (৬৪-সংখ্যক)

সচেতন পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাবে 'বলাকা'-র ৪৫-সংখ্যক কবিতার এই ছবি—

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।

কিংবা বহুবছর বাদে লেখা 'প্রান্তিক' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের শেষ (১৮-সংখ্যক) কবিতার কথা-

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

অথবা 'নবজাতক' (১৯৪০)-এর 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতার এই অংশে—

বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা॥

একদিকে যুগসংকট ও আত্মসংকটের অগ্নিক্ষরা শিল্পরূপায়ণ, অন্যদিকে জগৎ জীবন অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্নাতুরতা এই পর্বের কবিতায় বার বার দেখা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের 'অপূর্ণ', 'প্রশ্ন', 'নবজাতক'-এর 'প্রশ্ন', 'কেন' কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। এই নিরুত্তর সত্তাজিজ্ঞাসার চূড়ান্ত পরিচয় অবশ্যই ধরা আছে 'শেষ লেখা' (১৯৪১)-র ১৩-সংখ্যক ('প্রথম দিনের সূর্য') কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যগুলিতে আছে আধুনিকতার আর-এক প্রয়োগনিরীক্ষা। তবে সে-সব কবিতা প্রায়শই আধুনিকতার বাহ্য উপকরণের সমাবেশে ভারাক্রান্ত, উপলব্ধির অন্তর্ভেদী উচ্চারণ সেখানে খুব একটা শুনতে পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম— 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি। মূল কবিতাটি (The Child) ইংরেজিতে লেখা হলেও তার বঙ্গীয় রূপায়ণে আছে এক অকৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্য। লক্ষণীয় এর আপাতসরল অথচ অন্তর্জটিল গদ্যভঙ্গি, উপমা-প্রয়োগের অভিনবত্ব, স্বপ্নের মতো আপাত-অসংলগ্ন চিত্রাবলি— বলাকা-পলাতকা তো বটেই, এমন-কি 'পরিশেষ'-এর কবিতার সঙ্গেও এর দুস্তর পার্থক্য। আধুনিক ফিল্ম-এর টেকনিককে আশ্চর্যভাবে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকল্প-রচনার ক্ষেত্রে :

পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো,
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ;
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট—
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত।

আবহমান ইতিহাসের পথ বেয়ে আজকের মানবসভ্যতা যে চরম ক্রান্তিপর্বে এসে দাঁড়িয়েছে তার আশ্চর্য প্রতীকী রূপায়ণ দেখি এই কবিতায়—

সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয়-ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি-পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো, নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে;
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল!'
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে;
বলে— কিছুতে কিছু আসে যায় না।

বোঝা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর আবহ রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে ছুঁয়ে গেছে। তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। ব্যক্তিগত আবেগকে প্রচ্ছন্ন রেখে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যান বা নাট্যকথার আধারে ভাবনাকে পরিবেশন করার এই বিশেষ এলিয়টীয় পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। আধুনিকতার এও এক ধরন। অবশ্য শুধু গদ্যছন্দে লেখা কবিতায় নয়, প্রচলিত ছন্দরূপকে মেনে

নিয়ে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছেন তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে, তাদের মধ্যেও ধরা পড়েছে রীতির আধুনিকতা, শব্দ ও প্রতিমা-প্রয়োগের অভিনবত্ব। যেমন—

ক) আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে
সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি। ('পোড়ো বাড়ি' / বীথিকা)

খ) দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি (প্রান্তিক / ৯)

গ) দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী, অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা। (প্রান্তিক / ১৬)

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাও যোগ হচ্ছে এ পর্বের কাব্যশিল্পে। 'নিষ্ঠুর' 'পরুষ' 'উৎকট' অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটছে কবিতায়। 'প্রান্তিক'-পরবর্তী কাব্যধারায় তাঁর আঁকা ছবির অসুন্দর অসংলগ্ন অসমঞ্জস জগৎ মাঝেমাঝেই জেগে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। প্রকাশভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে তাঁর চিত্রভুবনের রহস্যময় ভঙ্গি, কবি যাকে বলেন 'আলোছায়ার নাট-বসানো সে আর এক কাণ্ড।' (শেষসপ্তক / ১৬) উদাহরণ :

১) ঊর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে চলে গেল বাদুড়ের পাখা।
যেন সে নির্মম
অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।
বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অজগর অন্ধকার গিলিয়াছে তারে। ('ঘরছাড়া' / সেঁজুতি)

২) জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা। ('জানা-অজানা' / আকাশপ্রদীপ)

৩) আদিমহার্ণবগর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ— (রোগশয্যায় / ৯)

অনুপুঙ্খের প্রয়োগও উল্লেখযোগ্য এই পর্বের কবিতায়। একটি পুরোনো বিস্মৃতপ্রায় প্রেমের আবহ কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন অনুপুঙ্খের প্রয়োগে, প্রতীকী তাৎপর্যে। দুটি ভিন্ন কবিতায় তাদের রূপায়ণে কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় একই অনুষঙ্গ :

১) তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়ো বাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি;
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,

তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাসের গন্ধ ওঠে, দুর্গ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ। ('পোড়ো বাড়ি' / বীথিকা)

২) পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুরবেলা। (জন্মদিনে / ২৪)

আখ্যানধর্মিতা, অজস্র অনুপুঙ্খের উল্লেখে এই পর্বের কিছু কিছু কবিতা, বিশেষত গদ্যকবিতা যেমন কোথাও কোথাও হয়ে উঠেছে প্রয়োজনের তুলনায় স্ফীতাবয়ব, অহেতুক বিবৃতিনির্ভর, তেমনি বিস্তারের বদলে অন্তঃসংহতি রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয় শেষ পর্যায়ের কাব্যচতুষ্কে। গীতাঞ্জলি-পর্বটি যেন নতুন করে ফিরে এসেছে এখানে। শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় কবিমনের প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিন্যাসের বদলে যেমন দেখি প্রতীক ও প্রতিমার প্রয়োগে সৃষ্ট অন্তঃসংহতি, তেমনি কথা-ছবি-গানে মেশানো এক নতুন শৈলী, মিতকথনে যার নান্দনিক নিবিড়তার আভাস। তেমন কিছু দৃষ্টান্ত। :

১) আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। ('বিস্ময়' / পরিশেষ)

২) ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক,
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতসবাজি। (শেষসপ্তক / ১১)

৩) তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন—
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা। ('আসা-যাওয়া' / সানাই)

শেষ কাব্যচতুষ্কে আমাদের অভিভূত করে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য আত্মসংবরণের ক্ষমতা! কবিতাগুলিতে বাইরের চাকচিক্য নেই, নেই প্রথালঙ্ঘনের উদ্যত উত্তেজনা বা নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সচেতন তৎপরতা। বরং আত্মশাসনের একটি চাপা ভঙ্গি কবিতাগুলিকে দিয়েছে স্ফটিকের আয়তন, যাকে বলা হয়েছে 'দিব্য-কার্পণ্যগুণে ভরা'।[৪] এই মিতভাষণের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) গ্রন্থের সর্বশেষ (৩৯-সংখ্যক) কবিতাটি :

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নীচে চুপিচুপি করিছে মন্ত্রণা
স'রে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে;
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি॥

'শেষলেখা'র একাদশ কবিতায় ('রূপনারানের কূলে') জীবনরহস্যের গহন উপলব্ধির ইঙ্গিত ছুঁয়ে যায় পাঠকের কল্পনাকে। 'এ জগৎ স্বপ্ন নয়'— এ উপলব্ধিটি হয়তো নতুন নয়, কিন্তু এর প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ নতুন। গীতাঞ্জলির

যুগের 'রূপসাগর' আজ রূপানারায়ণের বেশে দেখা দিয়েছে— কিন্তু মাঝখানে কেটেছে অনেক সংক্ষুব্ধ মুহূর্ত, অনেক টানাপোড়েনের প্রহর, পেরিয়ে আসতে হয়েছে বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত 'পীড়নের যন্ত্রশাল'-এর ক্ষতযন্ত্রণা। 'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ'— এ শুধু কাব্যোক্তি নয়, মর্মোত্থিত সংবেদনার বাণীমঞ্জরী। এই কবিতাগুলিতে তাই ফুটে উঠেছে এক তীব্র অন্তর্নাট্য, জয়-পরাজয়ের সংঘর্ষে জ্বলে-ওঠা কবিমনের পবিত্র আগুন। এখানেই ধরা পড়েছে কবিতার রহস্যমণ্ডিত রূপ— রবীন্দ্রকবিতার যথার্থ আধুনিকতা তাই এখানেই।

উল্লেখপঞ্জি :

১. 'On the Modern Element in Literature', Matthew Arnold : Poetry and Prose, ed. John Bryson, London, 1954, pp. 272
২. জার্নাল, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২৫ বৈশাখ ১৩৯২, পৃ. ৪০
৩. 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা', বিষ্ণু দে, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৯
৪. 'একটি রক্তিম মরীচিকা', 'এ আমির আবরণ', শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ৯১

মঙ্গলকাব্য ও আধুনিক উপন্যাস

প্রসূন ঘোষ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের তুর্কীযুদ্ধ আর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পলাশীর যুদ্ধ— যুগপৎ রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যবর্তী কালসীমায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ব্যাপ্ত। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের চূড়ান্ত মুহূর্তে তাবত বাঙালি সমাজ যখন আলোড়িত, সামাজিক ও লৌকিক জীবনে তথা জনজীবনেও তখন নেমে এসেছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। এই সর্বৈব অসহায়তার কালে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মানুষ তার নিজস্ব প্রবাহকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টির পশ্চাতে যেমন দৈশিক জীবনের দুর্যোগ কিংবা লৌকিক ও সমাজজীবনের নিরুপায়তা পরিস্ফুট, তেমনি মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে সেই রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র কিংবা লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনের অনুপুঙ্খতা উপস্থাপিত। মানুষ যখন চূড়ান্ত অরাজকতাকে নিজের চোখের সামনেই দেখতে পেল, তখন সেই মুহূর্তে সে এমন কোনো অবলম্বন পায় নি যাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারে। ঘটে যাওয়া কাজের যখন কোনো কারণ অনুসন্ধানে মানুষ ব্যর্থ মনোরথ হল, তখন লৌকিক জগতের বাইরে অলৌকিক দেবদেবীর জয়গান করতে বাধ্য হল। অন্যদিকে বিপর্যয়ের মুহূর্তে সে ফিরে দেখল অতীতকে, পর্যালোচনা করল নিজেকে, বাইরের শত্রুর হিংসার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য এ যাবৎকাল যাদের ঘৃণা করেছে তাদের কাছাকাছি এল। সুতরাং ব্রাহ্মণ মন শুচি করে না হোক নিতান্ত বাধ্য হয়ে পতিতের হাত ধরব বলে আহ্বান জানাল আর এর ফলেই আর্য সমাজের দেবতার সঙ্গে অনার্য সমাজের দেবী মিলেমিশে গেল। তাই যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ কবিগণ মঙ্গলকাব্য লিখেছেন, তবুও তাঁরা এই মিলনসাধনের প্রসঙ্গে সত্যকে বর্জন করেন নি। সুতরাং তাঁরা মূলত আর্য দেবতার চেয়ে অনার্য দেবীর জয়কেই মঙ্গলকাব্যে বারে বারে দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ পরিচালিত বর্ণ বিভাজিত সমাজেই নর-নারী ভেদ ছিল, নারীরা ছিল অন্দরের জগতেই সীমাবদ্ধ, সদরের জগতে পুরুষের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু লোকায়ত সমাজে, প্রান্তিকায়িত সমাজে নারী-পুরুষের কর্মের জগতে কোনো ভেদ ছিল না, বরং তাদের সমাজ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিকও বটে। আবার সেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত ছিল নানা টোটেম ও টাবু, আচার-আচরণগত বদ্ধতা, ব্রত পালন ইত্যাদি। দৈশিক জীবনের বিপর্যয়ের মুহূর্তে, দুই সমাজের একে অপরের কাছাকাছি আসার মুহূর্তে এ-সবের কোনো কিছুই ঘৃণাব্যঞ্জক মনে হল না, বরং যাবতীয় প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে সন্ধিস্থাপন জরুরী বলে মনে হল। সুতরাং এমত কালপটভূমিতে মঙ্গলকাব্য রচিত হলে তা যে দেবীবন্দনাসূচক হবে, তাতে যে পৌরাণিক দেবতার পরাজয় ঘটবে, লোক প্রচলিত কথা প্রাধান্য পাবে, ঘটবে অলৌকিকতার আতিশয্য, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য হল সংস্কৃতপুরাণের সঙ্গে লোকপুরাণের সমন্বয়সূচক কাব্য, বলাবাহুল্য যেখানে পৌরাণিক দেবতার স্থলে লৌকিক দেবীর জয়গান করা হয়েছে, ঘটেছে লোকপুরাণের প্রাধান্য।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে একাধারে লোকদেবতা ও লোকপুরাণের মহিমার প্রকাশ ঘটেছে, অন্য দিকে প্রতিভাবান কবি-কর্তৃক সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীর সংযোজন ও অনুসরণের প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই লোকসমাজের কথা আর্যেতর-সমাজের লোকগাথা এই কাব্যগুলিতে ঠাঁই পেয়েছে, ঠাঁই পেয়েছে তাদের অন্দরের কথা, নারীদের ব্রতকথা। আবার সেগুলিই তাঁদের লেখনীতে পৌরাণিক মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখণ্ডে সংস্কৃতপুরাণের কাহিনী অনুসরণ করে উদ্দিষ্ট দেবতার দেবলোকে প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভে তাই দেববন্দনার যে অংশ সংযোজিত, যাতে থাকে সৃষ্টি পত্তনের

কাহিনী যা সংস্কৃতপুরাণ অনুসারেই কল্পিত। সংস্কৃতপুরাণরীতি অনুযায়ী সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিতের মতো পঞ্চলক্ষণ বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও রয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-বৃত্তেও দেববন্দনা, সৃষ্টি পত্তন কাহিনী, কবির দেবী-কর্তৃক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি বা গ্রন্থোপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে সংস্কৃত পুরাণানুসারী কাহিনীতেও পরিলক্ষিত হয় কৌম-সমাজের বিশেষত্ব। তাই সব ধরনের মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-বৃত্তেই থাকে লোক-সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ কাহিনী বারোমাস্যা, চৌতিশা প্রভৃতি, থাকে রাঁধা-খাওয়ার বিশদ বিবরণ, থাকে লোক-সমাজের কিংবা গ্রামীণ-সমাজের ফুল-ফল-বৃক্ষ-মাছের বিস্তৃত তালিকা।

আসলে বাংলার লোক-সমাজের পুরাকথা আদিভাষা সংস্কৃতে রচিত হয়ে সংস্কৃতপুরাণের মর্যাদা পায় নি, বাংলা ব্যতীত অপরাপর স্থানেও তা পরিচিত হয় নি। একথা সত্য যে, স্থানীয়পুরাণ এমন-কি বৌদ্ধপুরাণ কিংবা সংস্কৃতপুরাণের সঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যের বৈসাদৃশ্যও বড়ো কম নয়। পুরাকথা (Myth) ও পুরাণের মধ্যে যুগপৎ সাদৃশ্য ও পার্থক্য পরিলক্ষিত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পুরাণানুসরণ থাকায় পুরাকথারও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেখানে। মানবপ্রবাহের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে পুরাকথা ও পুরাণ সৃষ্টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পুরাকথা বা মিথ পুরাণের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে। মানবসভ্যতা অভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে পুরাণের কাহিনীমালা গড়ে উঠেছে। তাই পুরাণের কাহিনীমালায় মিথের উপাদান মিশ্রিত থাকে। আসলে প্রাচীনকালে মানব অভিজ্ঞতাগুলি সংরক্ষিত থাকত কোনো লিখিত গ্রন্থমালার মধ্যে নয়, সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি ছিল শ্রুতিনির্ভর তথা মৌখিক। মানুষের স্মৃতিবাহিত অভিজ্ঞতাগুলি প্রারম্ভেই সুস্পষ্ট কাহিনীর আকার ধারণ করে নি। মানবসভ্যতার পূর্বের সময়ে আদি মানবসমাজের অভিজ্ঞতাগুলি স্মৃতিবাহিত হয়ে শ্রুতিপরম্পরায় রক্ষিত হওয়ার ফলে নানা রূপান্তর সত্ত্বেও মহাকালের ধারায় তা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আদি পর্বের মানবসমাজের সেই জীবন অভিজ্ঞতা তথা কথাবৃত্তই পুরাকথা বা মিথ। পুরাণে আছে সুস্পষ্ট গল্পের ধারা, সভ্যতা সৃষ্টির পরবর্তীকালে যখন বর্ণ ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে, তখন পুরাণের গল্পমালা সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই গল্পমালায় থেকে গেছে আদি পর্বের মানবসমাজের কথাবৃত্ত তথা পুরাকথা। ক্লড লেভি স্ট্রাউস বলেছিলেন যে, পুরাকথা সৃষ্টির মূলে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু, সু ও কু প্রভৃতি দ্বিমাত্রিক বৈপরীত্য (Binary opposition)। সুতরাং এক একটি বিশেষ বিশেষ দেশকালে গড়ে ওঠা বিশেষ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যালোচনা জরুরী আর তা করতে গেলে সেই বিশেষ সংস্কৃতির ধারক কৌম-সমাজটির যাবতীয় বৃত্তান্ত জানা প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে সামাজিক বার্তা প্রচারের ফলে গড়ে উঠেছে রূপকাশ্রয়ী মিথ। জীবন সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞাসা মিথে বার বার প্রযুক্ত হয়। যেমন বিশ্ব, বৃক্ষ, প্রকৃতি, প্রাণী, মানব সৃষ্টিসংক্রান্ত মিথ। এই ধরণের পুরাকথায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাতের প্রসঙ্গ যেমন রয়েছে; তেমনি পর্বত, অরণ্যভূমি, সমুদ্র তথা প্রকৃতি ও নানা প্রাণী-মানুষ প্রভৃতির প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে। এর সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন ও পরিপূরকভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে আগুনের উদ্ভব, মৃত্যু রহস্য, সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা বা ঋতুসংক্রান্ত মিথ। যেহেতু আদিম কৌম-সমাজে দলবদ্ধভাবে মানুষ বাস করত, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তারা সংগ্রাম করত, তাই সেক্ষেত্রে গোষ্ঠীপতির উদ্ভব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জয়-পরাজয়ের কাহিনীসংক্রান্ত নানা মিথ সর্বত্রই প্রচলিত। অন্যদিকে কৌম-সমাজে সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সংস্কারসংক্রান্ত কিংবা বিবাহ প্রভৃতি প্রথাসংক্রান্ত নানা মিথ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। আবার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে ধনসম্পত্তি আহরণ ও নারীহরণ যেহেতু হামেশা ঘটত তাই সে-সংক্রান্ত লক্ষ্যপূরণের জন্য কারো ভ্রমণ, যুদ্ধ-জয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে মিথ স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে পুনরাবৃত্তি, পুনরুজ্জীবন, আরোহণসংক্রান্ত মিথ। বলাবাহুল্য নানা বিষয় নিয়ে মিথ গড়ে উঠলেও এবং মিথের বিষয়ভিত্তিক বিভাজন দৃষ্ট হলেও অনেকক্ষেত্রেই একই মিথেই একাধিক বিষয় প্রবিষ্ট হয়েছে। আবার এ মিথগুলিও শ্রুতিপরম্পরার মধ্য দিয়ে বহমান হওয়ার ফলে তার নানা রূপান্তর যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি এতদ রূপান্তরিত হওয়ার পরেও কিংবা নানা কথক লেখকের মধ্য দিয়ে যুগযুগ অতিবাহিত হওয়ার পরেও কথাবৃত্তের মূল আত্মাটিকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়

না। পরবর্তীকালে যখন পুরাণ গড়ে উঠেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরাণের গল্পমালায় পুরাকথার উপাদানগুলি থেকে গেছে। আরো পরবর্তীকালে পুরাণ কাহিনীগুলির সমবায়ে আদি মহাকাব্যগুলি গড়ে উঠেছে। যাইহোক, সংস্কৃতপুরাণের অনুসরণে মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে ওঠার ফলে এবং মঙ্গলকাব্য স্রষ্টারা সংস্কৃতপুরাণ সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত হওয়ার ফলে শুধু পুরাণ নয়, পুরাকথার উপাদানও মঙ্গলকাব্যে বিরল নয়। কিন্তু পুরাণ যেহেতু বর্ণ ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার পরবর্তীকালে সৃষ্টি, তাই পুরাণের কাহিনীবৃত্তে শ্রেণী ও বর্ণ বিভাজনভিত্তিক সমাজকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের প্রচেষ্টাটি সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতপুরাণ যেহেতু আর্যদের দ্বারাই সৃষ্ট, তাই তাঁদের নিজস্ব স্থানটিকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টাতেই বর্ণ ও শ্রেণীভিত্তিক বিন্যাসকে ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করে পুরাণের কাহিনীমালায় বর্ণিত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে মহাকাব্যের ঘটনাধারাতেও। কিন্তু মনে রাখতে হবে পুরুষশাসিত ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবন কখনোই সমগ্র জাতির পরিচয়বহ হয়ে ওঠে না। মঙ্গলকাব্য গড়ে ওঠার মূলে যেহেতু রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে আর্য-সমাজের আর্যেতর-সমাজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা ক্রিয়াশীল, তাই সেখানে কেবল সংস্কৃতপুরাণের মতো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জীবনবৃত্তান্ত নেই। বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে খৃস্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রচলিত হলেও তার পূর্বে বঙ্গ নামটির উৎপত্তি ঘটেছে, যা প্রারম্ভে ছিল জাতিবাচক, পরবর্তীকালে হয়েছে দেশবাচক। আর্যেতর-সমাজের মানুষরা মৃধ্রবাচা, অব্রতা, অনামা, অদেবা, শিশ্নদেবা প্রভৃতি হিসাবে পুরাণে যেমন উল্লেখিত; তেমনি অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয়, নেগ্রিটো ইত্যাদি রূপে ইতিহাসে প্রচলিত। এই মানুষজনই আর্য তথা উন্নত সমাজের মানুষের কাছে পক্ষিজাতীয় মানুষজন বা 'বয়াংসি' হিসাবে উপেক্ষিত। সুতরাং, সংস্কৃতপুরাণে যে এদের জীবনযাত্রার কথা লিপিবদ্ধ হবে না, এই-সব উপেক্ষিত মূক মানুষদের কথামালা গ্রথিত হবে না তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু মঙ্গলকাব্য যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কবিদের রচনা, তবুও বিশেষ দেশ-কালের প্রভাবে এই কাব্যগুলি গড়ে ওঠায় বাংলার লোক-সমাজের মানুষ যেমন ব্যাধ, ডোম, জেলে প্রভৃতি উপেক্ষিতজনদের বৃত্তান্তও স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে তারাই সে কাহিনীর নিয়ামক হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-বিষাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে নারীরা মনুসংহিতায় ব্রাত্য ও অপাংক্তেয় সেই নারীদেবীর বন্দনা করা হয়েছে অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে। অর্থাৎ ভারতীয় মিথের ও সংস্কৃতপুরাণের লোকায়ত কথামালার উপাদান মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে তথা কাহিনীবৃত্তে স্থান পেয়েছে।

গেওর্গ লুকাচ তাঁর থিয়োরি অব দি নভেল গ্রন্থে (১৯১৪ খৃস্টাব্দে রচিত, ১৯২০ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) উপন্যাসকে ঈশ্বরহীন পৃথিবীর মহাকাব্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন উপন্যাস হল হোমারের মতো আদি কবির মর্যাদাময় শিল্পকর্মের অবনমিত প্রজন্ম। উপন্যাস মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহাকাব্যিক আখ্যান যাতে নেই সেই যুগের ঈশ্বর বা দেবতা, নেই উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদাবান নায়ক। লুকাচের মতে হোমারের যুগ ছিল ঈশ্বরসৃষ্ট যুগ, সমগ্রতার যুগ, সম্পূর্ণতার সময়। অন্য দিকে, উপন্যাস সৃষ্টি হয় সেই সমগ্রতার কালের অবসানের ফলে। হোমারের যুগ তথা আদি মহাকাব্য সৃষ্টির যুগ সমগ্রতা বা সম্পূর্ণতার যুগ কি না তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে উপন্যাস এক খণ্ডিত কালেরই সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগীয় দেববাদনির্ভর মানবতাবাদের পরিমণ্ডলে। ধর্ম বিনষ্টির আতঙ্ক যখন মানুষকে গ্রাস করেছে; প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ, শোক প্রাত্যহিক বেদনায় মানুষ যখন মুহ্যমান, তখন সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ হয়েছে দিশাহারা। সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে ঈশ্বরকে, অবলম্বন করেছে দেবতাকে, অনৈসর্গিতা ও অতিলৌকিকতার কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও সেই দেবতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে প্রতিকূল আবহকে দূর করার মতো মানসিক শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়েছে, আবার সবশেষে সেই দেবতাকে মেনেও নিয়েছে। মধ্যযুগের মতো পরিমণ্ডল আধুনিককালে নেই, কিন্তু আধুনিক কথাকার যখন খণ্ডিত যুগে মঙ্গলকাব্যের উপাদান অনুসরণে বয়ান গড়ে তোলেন তখন সচেতনভাবে মধ্যযুগীয় ধর্মীয়

পরিমণ্ডলটি বাদ দেন, অন্যভাবে উপস্থাপিত করেন অলৌকিকতামণ্ডিত আবহটি। মঙ্গলকাব্যের কুশীলবদের প্রেম-প্রীতি-হতাশা-আকাঙ্ক্ষা-ঈর্ষা-লোভ-যৌনতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী সেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলেও অনুপস্থিত ছিল না, তাকেই ঔপন্যাসিক উপস্থাপিত করেন নানাভাবে। ফলে সমকালের যে জিজ্ঞাসা ও সংকট ঔপন্যাসিককে নিয়ত তাড়িত করে, বিভিন্নভাবে তাকেও তিনি উত্থাপিত করেন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর আধারে। অনেকক্ষেত্রেই কথাকোবিদ মঙ্গলকাব্যের আখ্যানকে একটি পর্বে নিয়ে এসে পরবর্তীকালে তার সমকালের ক্রান্তিলগ্নের আখ্যানকে উত্থাপন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক জটিল জীবনধারাকে বিন্যাস করতে গিয়ে লেখক নিয়ে আসেন প্রাগাধুনিক মঙ্গলকাব্যের কোনো উপাদানকে। আবার উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে ভিন্ন আধেয় থাকলেও তার আধারটিকে ঔপন্যাসিক গড়ে তোলেন মঙ্গলকাব্যের আদলে। তাতে উপন্যাসের দেশজরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের নিজস্ব কথনরীতি নির্মাণের প্রচেষ্টাটিও। অন্যদিকে উপন্যাসের ন্যারেটিভে মঙ্গলকাব্যের মোটিফ প্রয়োগ করে লেখক দেখান যে ঘটনা চরিত্র ও কৌম-জীবনের উপর তা কতখানি প্রভাবশীল হয়েছে। মনে রাখতে হবে, একালের কথাকার যখন সেকালের মঙ্গলকাব্যের কাহিনী উপাদান গ্রহণ করেন তখন কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের গল্প পরিবেশন করতে চান না, বরং তাতে মিশ্রিত হয়ে থাকে ঔপন্যাসিক-সমকালীন সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধি। নেহাৎ গল্পটুকু পরিবেশনের উদ্দেশ্য যদি ঔপন্যাসিকের অভীষ্ট হয় এবং মনোরঞ্জনই হয় তাঁর বাসনা, সেক্ষেত্রে শিল্পরূপের হানি ঘটে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যেহেতু একালের বয়ানে কথাকার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মঙ্গলকাব্য আশ্রয় করেন, মঙ্গলকাব্যের গল্প বা কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে বসেন না, তাই সেখানে কখনো কখনো মিথ বা পুরাণের উপাদানও অবিচ্ছিন্নভাবে মিশ্রিত থাকে।

দুই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে মনসামঙ্গল কাহিনীর পুনর্নির্মাণ করেছেন হিজল বিলে বসবাসকারী বিষবেদেদের জীবনকথা অবলম্বনে। মনসামঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক দেবতা শিবের চেয়ে লোকায়ত দেবী মনসার প্রতিষ্ঠার কাহিনী স্থান পেয়েছে, আর 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে তারাশঙ্কর লোকায়ত তথা ব্রাত্য জীবনকেই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। বাংলা উপন্যাসের চরিত্র বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমাজের শাসক, উচ্চবর্ণের চরিত্র কিংবা অভিজাত কুশীলবকে কেন্দ্র করে একদা উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে অপাংক্তেয়, ব্রাত্য, শাসিত মানুষ চরিত্র হিসাবে স্থান পাচ্ছে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের সত্যচরণ উপলব্ধি করেছিল যে সভ্যতাগর্বী আর্যসমাজের মানুষেরা অনার্যদের সম্পর্কে কোনোদিন জানতে চায় নি, লেখা হয় নি তাদের ইতিহাস। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ধারায় সেই জগদ্দল পদ্ধতিটি বহমান থাকে নি— এ মঙ্গলজনকও বটে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৯৩, চতুর্থ সংস্করণ) উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রাজসিংহ, যিনি রাজা তথা ভূম্যধিকারী; রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (১৯৭৬) উপন্যাসের চরিত্র নিখিলেশ জমিদার তথা অভিজাত সম্প্রদায়ের, আর 'গণদেবতা' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের অনিরুদ্ধর মতো চরিত্র গ্রামীণ সমাজের একজন যৎসামান্য ব্যক্তি। তাই, 'গণদেবতা'-র মতো উপন্যাসে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিক চরিত্রের বির্বতনের কথা নেই, আছে গণজীবনের আলেখ্য। তাই ঔপনিবেশিককালের আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা পুঁজিবাদী একদেশের গ্রামীণ সমাজের বিপর্যয়ের চিত্রই কেবল এই উপন্যাসে নেই, আছে বাঙালি জীবনের এক বিকল্প ইতিহাসকথাও। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'-র মতো উপন্যাসে আবার গ্রামের ব্যক্তি কিংবা জনজীবন নয়, মঙ্গলকাব্যের ব্যাধ-শবরের মতোই বিষবেদেদের জীবনকথাকেই অবলম্বন করলেন ঔপন্যাসিক। উপরন্তু সে জীবনের সংগ্রামকথা, ক্ষমতাদ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সমরূপ।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসের শুরু হয়েছে মনসামঙ্গলের কাহিনী অংশের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। চাঁদসওদাগর-লখীন্দর-বেহুলার কাহিনী মনসামঙ্গলে স্থান পেয়েছে। বেহুলা-লখীন্দরের বাসর ঘরে রাত্রিযাপনের কথা মনসামঙ্গলের অতি পরিচিত ঘটনা। এই ঘটনা থেকেই লোকপুরাণের প্রচলিত কাহিনীরও সূত্রপাত। বিষবেদেদের আদিপুরুষ শিরবেদে ধন্বন্তরি ছিল চাঁদের মিতা, তাকেই সেই রাত্রিতে চাঁদ নিযুক্ত করেছিল প্রহরী হিসাবে। কিন্তু ধন্বন্তরি সক্ষম হয় নি চাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে, কেন-না কালনাগিনী মৃতকন্যার বেশে দেখা দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তার চৈতন্যকে বিলুপ্ত করেছিল এবং দংশন করেছিল চাঁদপুত্র লখীন্দরকে। চাঁদবেনের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বে নিয়তি ছিল মনসার সহায়। সেই নিয়তির ছলনায় সাঁতালী পাহাড়ের সমস্ত কিছুকে সেদিন ভুলিয়ে দিয়েছিলেন বিষহরি তথা মনসা। অথচ শিরবৈদ্য ও তার জাতিকে চাঁদ বাক্যহন্তা ও বিশ্বাসহন্তা অভিধায় ভূষিত করেছিল এবং দিয়েছিল নির্বাসন দণ্ড। সাঁতালী পাহাড়ে নিষ্কর সনদ বর্জন করে সেই পাহাড় তথা সমাজ থেকে ঠাঁই নিয়েছিল কেড়ে। 'মনসামঙ্গল'-এর কাহিনীতে বিষহরি তথা মনসা চাঁদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল; কেড়ে নিয়েছিল তার বাণিজ্যতরী, তার পুত্রদের, এমন-কি আদরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরকে; হরণ করেছিল তার মহাজ্ঞান। মনসা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। আধুনিক সমাজে অর্থ শক্তি, প্রতিপত্তি দম্ভের আকর; অর্থবান ধনীরাই শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত— মার্ক্সীয় তত্ত্বে পরিবেশিত এ হেন বাণীকে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের সমাজে অলৌকিকতাও অন্যতম শক্তি, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনসাও তাই শক্তিবান শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাই, মনসার সঙ্গে চাঁদের দ্বন্দ্ব শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্বেই পরিণত হয়, মনসা চাঁদকে শাসন করতে পারে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে পূজা আদায় করতে পারে। মনসামঙ্গলের এই আখ্যান লোকায়ত পুরাণের উপাখ্যান নয়। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসও তাই চাঁদের কাহিনী নয়, চাঁদের সনদের অন্তর্গত বিষবেদেদের জীবনবৃত্তান্ত। এখানে চাঁদই শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত, বিষবেদেদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে সে, অভিশাপ দিতে পারে তাদের। এক্ষেত্রে পৌরাণিক দেবতা শিবের আদেশেই চাঁদ দেয় সেই অভিশাপ। অন্যদিকে অভিজাত বণিক চাঁদের শত্রু লৌকিক দেবী মনসা আর তার বাহন কালনাগিনীই বিষবেদেদের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠে। লক্ষ্যণীয় ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর অভিমান তথা ক্ষোভ এই ঘটনায় পরিস্ফুট। তাই দেখি, চাঁদ যেখানে বিষবেদেদের বাকহন্তা-অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে, বসতির মধ্যে ঠাঁই নিষিদ্ধ করে, সেখানে বিষহরি তাদের দেয় নতুন পরিচয়, নতুন জাতি ও কুলমর্যাদা। চাঁদের শাপে তাদের বর্ণ হয়ে গিয়েছিল কালিবর্ণ, বিষহরির আশীর্বাদে সেই বর্ণে ফুটে ওঠে ঔজ্জ্বল্য, বর্ণচ্ছটা। উপরন্তু বিষহরি আদেশ দেয় অন্য বাড়িতে ভাত না খেতে তবেই সে তাদের ফুল-জল গ্রহণ করবে। বিষহরি তাদের দেয় বিষের উপর পূর্ণাঙ্গ অধিকার। সে বিষ তাদের মাধ্যমে বৈদ্যদের কাছে গেলে হয়ে উঠবে অমৃত আর তাতে বাক্‌বন্ধ ফিরে পাবে বাক, পঙ্গু অসাড় দেহ হয়ে উঠবে সচল। পুরাকথা সৃষ্টির মূলে ক্লড লেভি স্ট্রাউস দ্বিমাত্রিক বৈপরীত্যের (Binary opposition) কথা বলেছিলেন। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসেও বিষবেদেদের লোকসমাজে সু ও কু, অভিশাপ ও আশীর্বাদ, অমৃত ও বিষের দ্বিমাত্রিক বৈপরীত্যের প্রসঙ্গগুলি ঘুরে ফিরে এসেছে। তাই দেখি, অমৃতবৎ-কন্যা স্নেহে অন্ধ হয়ে আদি শিরবৈদ্য বিষবৎ অভিশাপকে আহ্বান করেছিল, কুড়িয়ে নিয়েছিল চাঁদের অভিশাপ। নববধূ বেহুলাকে দংশন করার অপরাধে কালনাগিনীও অভিশপ্ত হলে দুই অভিশপ্ত তথা সতীর্থ বিষবেদে ও কালনাগিনীর ঘটেছিল অমৃতবৎ মিলন। আবার এই বিষ ও অমৃত প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে বিষবেদেদের পরিবেশিত গানের মধ্যে, যেখানে তারা ভদ্র সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছে যে, তারা সুধার মধু খেলেও বেদে-সমাজ খায় বিষ। আবার বেদে-সমাজে প্রচলিত একটি উপাখ্যানের মধ্যেও যেমন নিষেধ লঙ্ঘনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত তেমনি বিষ ও অমৃতের দ্বিমাত্রিক বৈপরীত্য উপস্থাপিত। পৃথিবীর আদি পাপ ছিল নিষেধ লঙ্ঘনের পাপ। সাঁতালী পাহাড়ে বিষবেদেদের জীবনেও যেন ঘটেছে সেই আদি বিষবেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তার নিষেধ লঙ্ঘনের শাস্তি। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার নিষেধ না শোনার জন্য চাঁদও পেয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে রয়েছে 'যাত্রা' মিথের প্রসঙ্গ। কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য, কোনো কিছু সন্ধানের জন্য, কোনো অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বা বাসস্থানের সন্ধানের জন্য যাত্রা সংক্রান্ত থিমের মিথে বারংবার প্রয়োগ দেখা যায়। মনসামঙ্গলে বাণিজ্যের জন্য যাত্রা, বিশেষত বেহুলার লখীন্দরের সহমৃতারূপে তথা লখীন্দরের জীবন ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার মিথটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসেও একদিকে দিবাপ্রভাতে বেহুলার মান্দাস ভেসে গেছে, অন্যদিকে চম্পাই নগর ও সাঁতালী পাহাড় ত্যাগ করে গাঙুরের জলে রাত্রির অন্ধকারে বিষবেদের নৌকা ভেসে গেছে। যুগপৎ যাত্রার ফল দুরকম হয়েছিল, বেহুলার যাত্রা যেখানে স্পর্শ করেছিল সফলতার পূর্ণাঙ্গ চূড়া, যেখানে শিরবেদেদের যাত্রায় সম্বল হয়েছিল কেবল হতাশা, তারা ফিরে পায় নি কিছুই। শিরবেদে হারিয়েছিল তার একের পর এক সঙ্গীকে, হয়েছিল সর্বহারা ও নিঃস্ব। শেষপর্যন্ত ছিল কেবল দুইসঙ্গী যারা হিজল বিলে নতুন সাঁতালী গ্রামের পত্তন করেছিল। অর্থাৎ এই যাত্রা মিথের প্রসঙ্গে লোকায়ত-সমাজের অভিমান ও লাঞ্ছনার ইতিবৃত্তই স্থান পেয়েছে।

অবশ্য কালনাগিনী শিরবেদের তথা বেদে-সমাজের সঙ্গ ছাড়ে নি। কেন-না সেও তো বিষবেদেদের মতো অভিশাপগ্রস্ত। বেহুলা তাদের দিয়েছিল অভিশাপ, জাঁতিতে কেটে নিয়েছিল তার লেজ। সে পাবে না স্বামী, অন্যের ঔরসে সন্তানের জন্ম কখনো হলেও তাকে সে ভক্ষণ করবে, মায়াবী শক্তির অধিকারী সত্ত্বেও চিরকাল থাকবে অতৃপ্ত। সেই অতৃপ্ত কালনাগিনীর কাহিনীই তো 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'। বিষবেদে-সমাজের নাগিনীকন্যা পাঁচ বছর বয়সে স্বামীহীনা হয়, তার পর নাগিনীকন্যা হয়ে উঠবার পর আর পায় না স্বামী। যদি সন্তানের জন্ম দিয়েও ফেলে তবে সে নিজেই সে সন্তানকে হত্যা করে। এভাবেই বেহুলার কালনাগিনীকে দেওয়া অভিশাপ বহমান হয় নাগিনীকন্যার ক্ষেত্রে। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে শিব আর মনসার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র আর্য-অনার্য অথবা প্রতিষ্ঠিত ও ব্রাত্যের দ্বন্দ্ব নয়, পুরুষ ও নারীর দ্বন্দ্বও বটে। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে মহাদেব ও শবলা কিংবা গঙ্গারাম ও পিঙলার সংঘাতের মধ্য দিয়ে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বই পুনরায় দেখা দিয়েছে। তাই কবিরাজ গৃহে বিষবিক্রির সময় মহাদেব নাগিনীর দংশনে শবলাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়, নাগিনীকন্যার প্রেমিককে রাজগোখরোর দংশনে হত্যা করে। শবলা ও তার শরীরে চাঁপা ফুলের সুগন্ধ বের হলে মহাদেবের নৌকায় তার রক্ষিতা দধিমুখীর বেশে প্রবেশ করে এবং মহাদেব শিরবেদের ধর্মকে বিনষ্ট করে। শুধু তাই নয়, তার দেহে বিষ কাঁটা প্রবিষ্ট করে তাকে হত্যাও করে। একদিকে নাগিনীকন্যার সঙ্গে শিরবেদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে উভয়ের মধ্যে যেমন দূরত্ব রচিত হয়েছিল, তেমনি সেই দূরত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল নাগিনীকন্যার প্রেমাস্পদ হত্যায়। মহাদেব কন্যাসমা শবলাকে যে আসক্তির দৃষ্টিতে দেখত তা নারীর সজ্ঞায় শবলার অগোচরে ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শিবও তার কন্যা শবলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। উপরন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে পিতৃতুল্য শিবের স্থানে কন্যাসম মনসার প্রতিষ্ঠাকে উপজীব্য বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্য দিকে অপর নাগিনীকন্যা পিঙলাকে ভালোবেসেছিল নাগঠাকুর। কিন্তু শিরবেদে গঙ্গারাম নাগঠাকুরের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে তাড়িয়ে দেয়। আবার গঙ্গারাম চক্রান্ত করে মুর্শিদাবাদ থেকে চাঁপাফুলের আরক এনে পিঙলার বিছানায় ছিটিয়ে দেয়। আসলে নাগিনীকন্যার পিঙলার প্রতি গোপন আসক্তির কারণেই গঙ্গারাম এক দিকে যেমন নাগুঠাকুরের বিরুদ্ধাচারণ করে, অন্যদিকে তেমনি পিঙলার মনে বিষবেদে-সমাজের সংস্কারটিকে জাগ্রত করে। নাগুঠাকুরের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমূল প্রোথিত সংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে নাগুঠাকুরের রেখে যাওয়া শঙ্খচূড়ের দংশনে সে আত্মহত্যা করে। নাগিনীকন্যা শিরবেদের দ্বিতীয় কাহিনীতে পিতৃপ্রতিম বিরোধকেই উপজীব্য করা হয়েছে। আবার যে নাগিনীকন্যা শবলার জয় মহাদেবকে হত্যার মধ্য দিয়ে ইতিপূর্বেই ঘটেছিল তা আর রইল না পিঙলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিক দেখালেন বিষবেদে-সমাজের অবসান ঘটল, একটা যুগের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হল, উপরন্তু মাতৃপ্রাধান্যও আর রইল না। এ যেন লোকায়ত-সমাজ সভ্যসমাজ ব্যবস্থায় নিজেকে সমর্পণে বাধ্য হল।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর মতো 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসেও স্থান পেয়েছে নানা লোকশ্রুতি। কৃষ্ণ-কালীয় নাগ উপাখ্যানে রয়েছে বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনী। কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমন কাহিনীটির লোকায়ত-সমাজে প্রচলিত রূপান্তরিত কাহিনী তাদের নিজস্ব অভিমানের সূচকও বটে। কৃষ্ণ কালীয়নাগ কন্যাকে ভালোবাসার পর বিবাহের অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি সে শপথ পালন করেন নি। অন্য দিকে কালীয়কন্যা চাঁপা ফুলের অলঙ্কারে নিজেকে শোভন সজ্জিত করে কৃষ্ণের জন্য কাতরভাবে প্রতীক্ষা করে। এ ঘটনায় নাগকন্যা তাকে বিদ্রূপ করলে সেও দেয় তাদের অভিশাপ— নাগকন্যার অন্তরে যৌন বাসনা জাগলে তাদের শরীরেও বের হবে সেই চাঁপাফুলের গন্ধ। বিষবেদে-সমাজের নাগিনীকন্যাদের শোণিতে এই সংস্কার বহমান। তারাশঙ্কর নাগিনীকন্যা পিঙলার মুখ দিয়েই এ কাহিনী বলিয়েছেন, আবার এ কাহিনীর অনুরূপ জীবন পরিণামও তার জীবনেই যেন ঘটেছে। তাকে আর্য নাগুঠাকুর ভালোবেসে বিবাহ করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন, কিন্তু পিঙলাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে সে ফিরে আসবে। চাঁপা ফুলের গন্ধ নিয়ে পিঙলাকেও দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। লক্ষ্যণীয় এ কাহিনীতেও আর্য কৃষ্ণের অনার্য কালীয়নাগ কন্যাকে প্রবঞ্চনা করার মধ্য দিয়ে লোকায়ত-সমাজের সঞ্চিত ক্ষোভটি প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের অপর উপাখ্যানটি চিরাচরিত নিষেধ লঙ্ঘনের। বণিক বধূ বড়ো করেছিল দুটি নাগকে। বিষহরির কাছে সেই নাগদুটি তাদের দিদি অর্থাৎ বণিক বধূকে নিয়ে আসার জন্য প্রার্থনা করেছিল। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হলে নাগ দুটি বণিক বধূর শ্বশুর গৃহে ভাই সেজে বিষহরির কাছে তাকে নিয়ে গেছিল। বিষহরি তাকে সহস্র নাগের সেবা করতে আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখতে নিষেধ করেছিলেন। গরম দুধ নাগেদের খেতে দিলে তারা রেগে গিয়ে বেনে বউকে দংশনে উদ্যত হয়। মা বিষহরি নাগেদের নিরস্ত করেন, নাগে নরে বাস হয় না— উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। যদিও বেনে বউ তার অঙ্গীকার পালন করতে পারে নি, দক্ষিণ দিকে চেয়ে সে লঙ্ঘন করেছিল তা। বেনে বউ মা বিষহরির সেই রূপ দেখেছিল, যে রূপ দেখে স্বয়ং শিব অভিভূত হয়ে পড়েছিল, যে রূপ মা বিষহরির বিষময়ী মূর্তি। কিন্তু বিষহরি যখন তাকে তা জিজ্ঞেস করেন তখন বেনে বধূ তাঁর লজ্জার কথা এবং দেবসমাজের কলঙ্কের কথা ঢেকে রাখে। সুতরাং মা বিষহরি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মর্ত্যভূমিতে তার লজ্জার কথাও তিনি ঢেকে রাখবেন। তাই শবলা ও পিঙলা নাগিনীকন্যা থাকাকালীন যথাক্রমে শিরবেদে ও গঙ্গারামের লজ্জা ঢেকে রাখে।

মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন তাঁর কার্নিভাল (Carnival) সংক্রান্ত তত্ত্বে বলেছিলেন যে, লোকায়ত-সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শোষক-সমাজের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘ সঞ্চিত ক্ষোভেরই প্রকাশ ঘটে তথা প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কেবল 'লোক-উৎসবের মধ্যেই নয়, লোক-শ্রুতির মধ্যেও সেই প্রতিবাদটি উচ্চারিত হয় তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই শিবরামের জবানিতে ঔপন্যাসিক বলেছেন যে, ওদের পুরাণ কথা ওরাই সৃষ্টি করেছে এবং আর্যসৃষ্ট পুরাণ যদি সত্য হয় তাহলে লোকপুরাণও সমপরিমাণেই সত্য।

তিন

'নাগিনীকন্যা কাহিনী' উপন্যাসের পূর্বেই তারাশঙ্কর ধর্মমঙ্গলের দেবতা ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল দেবদেবীদের ভক্ত সম্প্রদায় সমগ্র বাংলার যেমন পরিবেষ্টিত ছিল তেমনি নানা উপধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে রায়মঙ্গল, বাসুলীমঙ্গল, সত্যপীরের পাঁচালি, ধর্মমঙ্গলের দেবদেবীদের পূজা উপাসনাও প্রচলিত ছিল। ধর্মমঙ্গলকে বলা হয় রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য, ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা বলেই পূজিত। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঠাকুর এক মিশ্রদেবতা। পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে প্রাচীন আর্যেতর দেবতার মিশ্রণে এই দেবতা গড়ে উঠেছে। ধর্মঠাকুরের মূলে

বৈদিকদেবতা বরুণ ও সূর্যের প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনি অনার্য লৌকিক শৈবধর্ম সংস্কারের আদর্শও যে নেই তা বলা যায় না। রাঢ় বাংলার বিভিন্ন গ্রামে ধর্মসম্প্রদায়রা ধর্মপূজা অনুষ্ঠান ও ব্রতকৃত্য পালন করে, মন্দির বা বৃক্ষমূলে ধর্মঠাকুরের উপাসনা করে। লোকায়ত-সমাজের, বিশেষত ডোম সম্প্রদায়ের সেবকই ধর্মের প্রধান পূজক তথা পুরোহিতরূপে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়। বীরভূমের কোপাই নদীতীরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম বাঁশবাদির কাহারকূলের লোকায়ত চরিত্রদের ধর্ম তথা দেবতার— উপাসনাজনিত সংস্কার ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে লোকায়ত মানুষের বিশ্বাস সংস্কার শ্রুতি কেমনভাবে নবজীবনের পটভূমিতে পর্যালোচিত হল, কেমন করে উপাস্য দেবতা আধুনিককালে বিলীয়মান হয়ে গেল, বাস্তব প্রেক্ষিতে প্রাচীন সংস্কার, আদিম লোক-বিশ্বাস কেমন বারে বারে হোঁচট খেল তারই বৃত্তান্তকে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। তাই যদিও বাঁশবাদি গ্রামের ভদ্রসমাজের উল্লেখ উপন্যাসে রয়েছে এবং তাদের শোষণের নানা কৌশলের ও কাহারদের লাঞ্ছিত হওয়ার প্রসঙ্গ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, তথাপি সেই দিকটি উপন্যাসের মুখ্য প্রসঙ্গ নয়। ধর্মমঙ্গলে দেখা যায় ধর্মঠাকুর লোকায়তদেরই আরাধ্য দেবতা, তাই ধর্মঠাকুরজনিত বিশ্বাস বিশেষভাবে তাদের মধ্যেই ক্রিয়াশীল। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে নানান ধরনের সংস্কার প্রচলিত। বাঁশবাদী গ্রামের কাহারদের দেবতা কর্তাবাবা, তাদের দেবতা কালারুদ্র। এই কর্তাবাবা তাদের কূলদেবতা, তাঁকে কখনো সুচাঁদ-বনোয়ারীর মতো কাহারেরা বলে বাবাঠাকুর, কখনো বলে কত্তাঠাকুর বা বেলবনের মহারাজ; আবার করালীর কাছে সেই দেবতা তাচ্ছিল্যসূচক ব্রেহ্মদত্যি মাত্র। সুচাঁদ বনোয়ারী তথা তাবত কাহারকূলের কল্পনায় সেই দেবতার মাথা ন্যাড়া, গলায় রুদ্রাক্ষ, ধবধবে পৈতে, পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র, পায়ে খড়ম। কাহারপাড়ার শিমুল গাছ বিশেষভাবেই বাবাঠাকুরের আর তাঁর বাহন অজগরতুল্য চন্দ্রবোড়া সাপ, যে সাপের মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর ভ্রমণ করেন। প্রথম ফসল উঠলে সে ফসলের ভোগ বাবাঠাকুরের থানে প্রারম্ভে দিতে হয়। সে ভোগে থাকে মুগসিদ্ধ, বরবটি সিদ্ধ আর এক বোতল পাকা মদ্য। বাবা খান পুরোহিতের মুখে আর তা হল গোটা কলাই। বাবা কালারুদ্র কর্তাঠাকুরের উপরওয়ালা, কাহারদের লৌকিক পরিমণ্ডলে নানা দেবতা পরিবেশিত অলৌকিক বাতাবরণ মুহূর্তের মধ্যেই স্থাপিত হয়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে ধর্মঠাকুর যেমন নানা সংস্কৃতির মিশ্রণে কল্পিত হয়েছে এবং সেই দেবতার মধ্যে যেমন পৌরাণিক ও অনার্য দেবতার মিশ্রিত রূপ পরিলক্ষিত, তেমনি জীবন-অভিজ্ঞ শিল্পী তারাশঙ্করের অঙ্কনে কাহারদের উপাস্য দেবতার যথার্থ স্বরূপটি উন্মোচিত হয়েছে।

কিন্তু কেবল দেবতার যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন নয়, সেই দেবতাকে কেন্দ্র করে কাহারকূলের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক লোকসংস্কাবের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন রাঢ়ের প্রতিটি ধূলিকণা সম্পর্কে জ্ঞাত তারাশঙ্কর। তাই দেখি, হাঁসুলীবাঁকের গভীর জঙ্গল থেকে শিস্‌ধ্বনি শোনা গেলে বাঁশবাদি গ্রামের কাহার-সমাজ আতঙ্কিত হয়। এমন-কি পার্শ্ববর্তী জাঙল গ্রামের কুমোর, সদগোপ, গন্ধবণিক, নাপিত অধ্যুষিত তথাকথিত ভদ্রসমাজের মানুষজনও ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। সেই ধ্বনি শোনা যায় বিভিন্ন স্থান থেকে— বেলগাছ ও শ্যাওড়া ঝোঁপে পূর্ণ ব্রহ্মদৈত্যতলা, জাঙলের পূর্বদিক অর্থাৎ কোপাইয়ের তীরের কুলকাঁটার জঙ্গল, হাঁসুলীবাঁকের দূরবর্তী স্থান কিংবা বাঁশবাদির বাঁশবন থেকে তারা সে সংবাদ শোনে। জাঙল গ্রামের বাবুদের নির্দেশে পুলিশ বন্দুকের আওয়াজ করে, লাঠিসোঁটা নিয়ে গ্রাম পরিভ্রমণ করে, দীর্ঘ টর্চের আলো দিয়ে দেখেও সেই শিসের কিনারা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে কাহাররা যদিও বিষয়টিকে চোর ডাকাতের নয় বলে মনে করেছিল, তবুও তাদের ধারণা ছিল এ নেহাতই কাহারকূলের যুবকযুবতীর প্রেম-খেলা মাত্র। এই কারণে তারা যথেষ্ট ক্ষিপ্তও ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের সে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের মনে হয় ব্রহ্মদৈত্যতলার দেবতা অর্থাৎ তাদের আরাধ্য কর্তাবাবা কোনো কারণে বিশেষভাবে রুষ্ট হয়েছেন। তাদের লোকবিশ্বাসে এই ধারণা উচ্চারিত হয় যে কর্তাবাবা বেলবন ও শ্যাওড়া জঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধারে চলে যাচ্ছেন, শিস দিয়ে সেকথা জানিয়ে দিয়ে চলেছেন তিনি। তারা এ বিষয়ে একদিকে যেমন জাঙলের ভদ্রসমাজের

বাবুমশায়দের উদাসীনতায় হতাশ হয়েছে অন্য দিকে তেমনি নিজ নিজ কুলুঙ্গিতে সিঁদুর মাখিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থ সঞ্চিত করেছে। এই কারণেই কাহারপাড়ার মাতব্বর বনোয়ারী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মজলিস আহ্বান করেছে। কাহারপাড়ার মধ্যে 'পানুর আতঙ্কই বেশি হয়, কেন-না পানুর যে পাঁঠাটি কর্তাবাবার পূজাতে বলি দিয়েছিল চৌধুরীরা তাতে ছিল খুঁত, কুকুরে কামড়ে ছিল সেই পাঁঠাটিকে। ভয় পেয়ে পানু সে কথা জানায় তাদের কাহারপাড়ায় আর তাতেই কাহারপাড়ার আদি মানবী সুচাঁদ কিংবা মাতব্বর বনোয়ারী পানুর দোষই দেখতে পায়। সুতরাং সরোষ কর্তাবাবাকে প্রসন্ন করতে যে আসন্ন পূজার সমারোহ চলে তাতে পানু আরেকটি নধর পুষ্ট ছাগ বলি দেবে বলে প্রস্তুত হয়। এ হেন কিংবদন্তী মুখর কাহারপাড়ার পরিমণ্ডলে সহজেই মধ্যযুগীয় আবহ নেমে আসে।

মধ্যযুগের ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বে আছে নিরাকার ধর্ম-মেদিনী সৃষ্টি করার পর তার অঙ্গের স্বেদ থেকে জন্ম হয়েছে আদ্যাদেবীর, যাঁর গর্ভজাত সন্তান হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁদের মধ্যে আদিদেব নিরঞ্জন তথা ধর্মঠাকুরের পরীক্ষায় কেবলমাত্র মহাদেব উত্তীর্ণ হলেন এবং পিতার নির্দেশে দুর্গাকে বিবাহ করে জীবরক্ষার ভার নিলেন। অন্য দিকে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র কাহারপাড়ার অলৌকিক জীবনে সুচাঁদের কথকতায় তাদের সৃষ্টি তত্ত্বের নিজস্ব কাহিনী পরিবেশিত হয়। তাদের উপকথাতেও পৃথিবী সৃষ্টি হয়, কাহার সৃষ্টি করেন বিধাতা, কাহারদের মাতব্বরকেও তিনি সৃষ্টি করেন একই সঙ্গে। বাবা কালারুদ্রের গাজনের পাটার ঘূর্ণাবর্তে দিনরাত্রি মাস বছর অতিবাহিত হয়। আবার সুচাঁদের কথকতায় সেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে কাহারদের লৌকিক জগতের ইতিহাসের প্রক্রিয়াটিও ব্যক্ত হয়। বন্যায় কাহারপাড়া ডোবে, সাহেব-মেম ডুবে মারা যায় আর কাহাররা হারায় জমি। কিন্তু সেই আখ্যানেও এক অপার্থিব অলৌকিক জগতের বৃত্তান্তই পরিবেশিত হয়। কোপাইয়ের প্রলয়ে পঞ্চশব্দের বাদ্য বাজিয়ে চতুর্দিক আলোকিত করে বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো নৌকা এসে থামল নদীর বুক হাঁসুলীবাঁকের দহের মাথায়। সাহেব মেমের নিষেধ অগ্রাহ্য করে এক কোমর জল পার হয়ে সেই নৌকা ধরতে এল। হঠাৎ বাবার যান থেকে কত্তা বেরিয়ে এসে জলের উপর খড়ম পায়ে দাঁড়িয়ে সাহেবকে নৌকা ধরতে নিষেধ করলেন এবং জলের ঘূর্ণিতে তাদের দিলেন ভাসিয়ে। কিন্তু সাহেবদের নীলকুঠির গোমস্তা চৌধুরীদের ডোবালেন না, নির্দেশ দিলেন তাঁর পূজা করতে, দেবতার কাছে মাথা নোয়াতে, অতিথিকে জল দিতে, ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে, গরিবকে দয়া করতে, মানুষকে সুমিষ্ট কথা বলতে। এই একই বিষয়ের অপার্থিব দিকটি কাহারপাড়ার বাইরের ভদ্রসমাজ বিশ্বাস করে না। কিন্তু কাহারপাড়ার মাতব্বরের কাছে সুচাঁদের কথাই প্রকৃত কথা, কর্তাবাবাই সব-কিছু করছেন। আবার কর্তাবাবার পরে তারা স্থান দেয় চৌধুরী বা ঘোষ প্রভৃতি বাবুমশায়দের। তারাও এক অর্থে তাদের দেবতাই। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলের মতো নিম্নবর্গীয় সমাজের অধীনতা স্বীকার করার প্রবণতা, দৈব নির্ভরতায় নিজেকে সমর্পণ করার প্রসঙ্গটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ অর্থনীতিগত প্রকৃত বাস্তবতার দিকটিও চিহ্নিত করলেন তারাশঙ্কর।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশেষত ধর্মমঙ্গলের দিগ্‌বন্দনা অংশে ব্রহ্ম দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। নানা দেবদেবীদের পূজা করার মধ্য দিয়ে ধর্মমঙ্গলের কবি তথা ভক্তদের উদার ও অসাম্প্রদায়িক হৃদয়টির পরিচয় পাওয়া যায়। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহারপাড়ার মানুষজনও কালারুদ্রর পূজা করে, কর্তাবাবাকে মেনে চলে, কালীর থান থেকে মাদুলী নেয়, ভাদু কিংবা ভাঁজো গান করে। উপরন্তু দেখা যায় যে, ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত তিনপ্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যপূজা বা নিত্যসেবায় ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসা কিংবা পৌরাণিক দেবদেবী বা লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবীদের বন্দনা করা হয়। ব্রাহ্মণ অথবা ডোমপুরোহিত প্রতিদিন নৈবেদ্য সহযোগে এই পূজা করে থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার পূজা পদ্ধতি হল বাৎসরিক। এই বাৎসরিক পূজায় ধর্মদেবতাকে সেবা উপলক্ষে ভক্তগণ নানা কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানে একদিকে ধর্মসেবকগণ আগুনের উপর হাঁটা, কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেওয়া, পরস্পর যুদ্ধের অভিনয় ইত্যাদি নানা বিপজ্জনক আচার পালন করেন; অন্যদিকে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী গান করে শোনানো, বলিদান ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়

প্রকার পূজাকে বলা হয় 'ঘরভরা'। কোনো মানুষ কোনো কিছু প্রার্থনা করে পূরিত হলে এই প্রকার উৎসবে বহু ব্যয় করে তা পালন করা হয়। রোগগ্রস্ত নারী-পুরুষ ও অপুত্রক মানবীরা আশীর্বাদ প্রত্যাশায় এই প্রকার অনুষ্ঠানে সমাগত হয়। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও কাহারপাড়ার নারীপুরুষ বালকবালিকারা কর্তাবাবার ঠাকুরতলায় অপরাধের পূজার আয়োজন করে। কাহারপাড়ার আদি কথক সুচাঁদ স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পূজা বাৎসরিক পূজা নয়, সুতরাং আনন্দও নেই তাতে। আগে ছাগবলি দিয়ে কর্তাবাবাকে সন্তুষ্ট করে অপরাধের মাশুল গুনে দিয়ে তবে তারা আনন্দ উপভোগ করুক। কাহারপাড়ার বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে চড়কের সময় অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির সময়। তাকে তারা গাজনও বলে থাকে। গাজনের সময় কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত হয়ে তাঁর চড়কের পাটায় শুয়ে বনোয়ারী কালো শশীজনিত কলঙ্ক তথা পাপকে অপসৃত করতে চেয়েছে। কাহারপাড়ার এই পূজানুষ্ঠানে প্রধান ভক্ত চড়কের পাটার গজালের ডগায় শোয়, সে দু'হাতে আগুনের ফুলের অঞ্জলি নিয়ে চাপিয়ে আসে বাবার মাথায়, সে আগুনের উপর নাচে, মড়ার মাথা নিয়ে খেলে। কাহারপাড়া মানুষজনের বিশ্বাস এই যে, বহুবিধ পুণ্যকর্মের সঞ্চয় কিংবা দেবতার বিশেষ দাক্ষিণ্য ব্যতীত কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত কেউ হতে পারে না। নিম্নবর্গীয় বা বর্ণের পূজিত দেবতা ধর্মঠাকুর, তাই ডোমজাতির সেবক 'পণ্ডিত' উপাধি নিয়ে ধর্মের প্রধান পুরোহিতের মর্যাদা অর্জন করে ধর্মপূজার সময়। বক্ষ্যমান উপন্যাসেও এই মর্যাদা পেয়েছে কাহারপাড়ার মাতব্বর বনোয়ারী। আবার শূন্যপুরাণে বা ধর্মপুরাণে দেখা যায় ধর্মের উপাসক এক এক যুগে এক একজন। সত্যযুগে সেতাই পণ্ডিত, যার শিষ্য সংখ্যা চারশো; ত্রেতাযুগে নীলাই, যার শিষ্য সংখ্যা আটশো; দ্বাপরে কংসাই, যার শিষ্য সংখ্যা বারোশো; কলিযুগে থাকবেন গোঁসাই, যার শিষ্য সংখ্যা হবে অগণিত। অন্য দিকে হাঁসুলীবাঁকের কাহারপাড়ার আদি ভোলা মহেশ্বর কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত ছোটোজাতের রাজা বাণ গোঁসাই। গোঁসাই মদ্য মাংস খেত, আবার বাবার চরণে ফুল দিত, গাজনে সন্ন্যাসী হয়ে আচার-আচরণ পালন করতে ভুলত না। গাজনে সন্ন্যাসী হয়ে আগুনের উত্তাপে বসে বাবাকে স্মরণ করত, লোহার কাঁটার শয্যায় শয়ন করত, সোনা রুপোর মূল্যবান অলংকার ছেড়ে মৃত মানুষের হাড়ের মালা গলায় পরত। সুচাঁদের কথনে জানা যায় সেই বাণ গোঁসাইয়ের ছিল একশো স্ত্রী, কিন্তু একটিমাত্র সন্তান, সে সন্তান কন্যা। সেই কন্যা ঊষার সঙ্গে নারায়ণের নাতির প্রণয় হল। বাণ গোঁসাই জানতে পেরে নারায়ণের নাতিকে অস্ত্র দিয়ে খণ্ডিত করতে চাইল, নারায়ণের সঙ্গে হল যুদ্ধ। নারায়ণ তার চক্র দিয়ে গোঁসাইয়ের হাত পা কেটে দিলেও গোঁসাই পরাজিত হয় না, মরেও সে বেঁচে ওঠে। কালারুদ্র আবির্ভূত হল, হরি-হরের মিলন ঘটল। বাবা কালারুদ্র ঊষার সঙ্গে নারায়ণের নাতির বিয়ে দিল। হরি বাণ গোঁসাইকে পৃথিবীর রাজা করতে চাইলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করল। চেয়ে নিল সেই বর যাতে কালারুদ্রের সঙ্গে তার একত্রে পূজা হয়, তার জাতি-জ্ঞাতি-প্রজারাই কেবলমাত্র কালারুদ্রের গাজনে ভক্ত হতে পারে। তাই বাণ গোঁসাইয়ের পূজা হলে তবেই বাবা কালারুদ্র পূজা নেয়। এ কাহিনীতে রয়েছে নিম্নবর্গীয় সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

আধুনিক ঔপন্যাসিক তাঁর আখ্যানের বয়ানে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলটিকে সূচিত করতে গিয়ে পুনঃপুনঃ 'অন্ধকার' প্রসঙ্গটির প্রয়োগ করেন। তারাশঙ্করের মতে বাঁশবাদির বাঁশবনে জমে থাকা অন্ধকার আদিমকালের অর্থাৎ অগ্নিসৃষ্টির পূর্ব যুগের। আর সেই অগ্নি আবিষ্কারের পূর্ব যুগেই, সভ্য সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির পূর্বেই উদ্ভব হয়েছিল মিথের। কাহারপাড়ার মানুষরা মিথের যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য জন্তুর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে পুরাকথাকে শুনিয়ে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। কিন্তু তারাশঙ্করের এই উপন্যাসে অন্ধকার কেবল আদিমতার প্রতিভূস্বরূপ একমাত্রিকভাবে অঙ্কিত হয় নি, তার বহুমাত্রিক উপস্থাপন রয়েছে। লেখকের বর্ণনায় এ অন্ধকার যেমন ঘোষ মশায়দের মেনে চলার, চৌধুরী মশায়দের ভয়ে কাঁপার, বণিক মশায়দের দেখে শিউরে ওঠার বা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার অন্ধকার, তেমনি যুদ্ধের বাজারে কাহারপাড়ার আলো না জ্বলার অন্ধকারও বটে। পশ্চিম ইয়োরোপের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কস তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। সামাজিক প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের

উদ্ভব হয় সেই সময় যখন সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর আধিপত্য দেখা যায় এবং সেই শ্রেণীর অধীন কৃষকবর্গের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়, সৃষ্টি হয় এক ভঙ্গুর অবস্থার। কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় ভিন্নতা, সৃষ্টি হয় ভূমিসংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণীর। আবার এর পাশাপাশি বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য শুরু হয়, পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন যেমন হয়, তেমনি হয় শিল্প-উৎপাদনের প্রসারও। গ্রামশি বলেছিলেন যে, শ্রেণী বিভাজিত সমাজব্যবস্থায় প্রভুত্ব ও অধীনতা সম্পর্কটি মূলত বিরোধমূলক সম্পর্ক। জনমানসের উপাদানে থাকে কিছু ন্যায়বোধ, যা প্রাতিষ্ঠানিক আইন বা ধর্মের চেয়ে শক্তিশালী। তাই যদিও জনমানসে গড়ে ওঠা লোক-উপাদান, লোকাচার তথা লোকসংস্কৃতি অনেকক্ষেত্রে ধর্মবোধে আচ্ছন্ন থাকে তবুও প্রতিদিনের জীবনে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু বাছাই করে জেহাদের হাতিয়ার হিসাবে। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য থাকে, শাসিত শ্রেণী তাদের লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অস্ত্রকেও পায়।

তাই দেখি, অন্ধকারমণ্ডিত কাহারকূলের ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যেই হাঁসুলীবাঁকের বিবর্তনের রূপরেখাটি তারাশঙ্কর অঙ্কন করেন। তাই সুচাঁদ এক ইতিহাসের কথক হয়েই থাকে, অবশ্যই সে ইতিবাস আর্য-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় রাজার ইতিহাস নয়; লোককথায়-জনশ্রুতিতে ভরপুর, কিংবদন্তী-অপার্থিবতা-অলৌকিকতায় মুখর নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস। সে হয়ে যায় আর্যেতর লোকায়ত সংস্কৃতির উপকথার ধারক, শ্রুতি পরম্পরার রক্ষক। চোখের সামনেই সে পরম্পরাকে বিনষ্ট হতে দেখে, কর্তাবাবা-কালারুদ্রের কোপানলে পড়তে হবে ভেবে সেই দেবতার বিরুদ্ধপক্ষ করালীকে সে ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না, তার তীব্র বিরোধিতা করে সে। কিন্তু বনোয়ারীকে বার বার বলে পাপ করালীকে শাসন করতে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। অন্যদিকে বনোয়ারী কাহারকূলের মাতব্বর, সে সমস্ত প্রথা জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করে, কাহারকূলের সৃষ্টি বিষয়ে কিংবা কর্তাবাবার বিষয়ে চৌধুরীদের নয়, সুচাঁদের কথাকেই মান্য করে। কিন্তু বনোয়ারী লোকায়ত সংস্কৃতিতে বিশ্বাস রেখেও পৌরাণিক সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়। বর্ণবিভাজিত সমাজব্যবস্থায় শাসিতের হয়ে প্রতিরোধ সে গড়ে তুলতে চায় না, ঘোষ মশায়দের সে মেনে চলে। আবার করালীকে শাসন করেও তার কোনো কোনো আচরণে অন্তর থেকে আকর্ষণ অনুভব করে। অন্যদিকে করালী পাশ্চাত্য সাহেবদের অনুকরণে নানা আচরণ শিখে আসে এবং কাহারপাড়ার অন্ধকারে অচিরেই তা প্রবিষ্ট হয়। বনোয়ারী তাই এক হিসাবে সুচাঁদ আর করালীর অথবা মিথ তথা আগুন সৃষ্টির পূর্বের যুগের এবং আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী পর্যায়ের মানুষও বটে, কেন-না দুই যন্ত্রণাকেই তাকে ধারণ করতে হয়।

তাই কাহারপাড়ার আদিম যুগের মিথ পরিবেষ্টিত জীবনটি আধুনিক রূঢ় বাস্তবতায় বার বার ধাক্কা খায়, মার্কস কথিত এক ভঙ্গুর অবস্থার সৃষ্টি হয়। অবশেষে উপকথার জগৎ তথা মিথের জগতের অবসান ঘটে, কোপাই মিশে যায় ইতিহাসের গঙ্গায়। কাহার-সমাজের আরাধ্য দেবতা বাবাঠাকুরের বাহনকে করালী হত্যা করে, দেবতার আবাসস্থল শিমূলবৃক্ষের উপরে চড়ে। অর্থাৎ কাহারপাড়ার আজন্মপ্রোথিত বিশ্বাস ও সংস্কারে তুমুল আঘাত হানে সে। উপরন্তু গ্রামসিকথিত প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কের বিরোধমূলক দিকটি তৈরি করে সে-ই। যে বনোয়ারী ঘোষ-চৌধুরী-হেদো মণ্ডলকে দেখে শিউরে ওঠে, থরহরি কম্প হয়, দেবতার পরেই তাদের স্থান দেয়, করালী তাদের যথার্থ স্বরূপটি উন্মোচন করে। তাই ঘোষ মশায়দের অত্যাচারে যে করালী একদা চন্দনপুরের সাহেবদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা রেললাইনের শ্রমিকের কাজে যোগ দেয়, সেই করালীই আজ ঘোষবাড়ির এঁটোকাটা সংগ্রহ করতে কাহার যুবকদের নিষেধ করে, হেদো মণ্ডলের সম্মুখেই তার আচরণের প্রতিবাদ করে। শুধু তাই নয়, করালী একদিকে যেমন কাহারপাড়ার দীর্ঘদিনের সংস্কার অমান্য করে কোঠাবাড়ি নির্মাণে তৎপর হয়, অন্যদিকে চৌধুরী মশায়দের অনুমতির প্রতীক্ষাও করে না। উপরন্তু চৌধুরীরা আটপৌরে পাড়ার নবীন মাহিন্দরকে তার কাছে পাঠালে সে সেটেলমেন্টের পরচার প্রসঙ্গ তুলে আইনমাফিক কথা বলে। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের তথা অধীনতার বিরোধমূলক দিকটি করালী উদঘাটিত করে, যা

কাহারপাড়ায় প্রথম। আবার কৃষকদের মধ্যেও পৃথকীকরণ শুরু হয়। তাই যে কাহার-সমাজ কেবলমাত্র জমিচাষের উপর নির্ভর করত, সেই সমাজে করালী আনে নতুন ধ্বনি : কারখানায় কাজ করার আহ্বান। অর্থাৎ শহরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও শিল্পোৎপাদন শুরু হয়েছে তাও বোঝা যায়। আবার করালীই কাহারদের রেশনকার্ড করার কথা বলে, কার্ডপ্রতি কেরোসিন-চিনির ব্যবস্থা করে। মাথলার ছেলে সর্পদংশনে মারা গেলে কেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নি সে প্রসঙ্গ তুলে বনোয়ারীর কাছে প্রতিবাদ জানায়। অর্থাৎ কাহারপাড়ার লৌকিক জীবন কিংবা তৎকালীন সমাজ অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও প্রভুত্বের রূপ বদলের প্রসঙ্গটি, পাশ্চাত্য প্রভুদের দাসত্ব করার দিকটি তথা পুঁজির হাতবদলের চিত্রটি স্পষ্ট অঙ্কিত হয় এ উপন্যাসে।

কিন্তু কাহারপাড়ার মানুষজন এই নব রূপায়িত প্রভুত্বের অধীনেই থাকবে, তাদের স্বাধীন সত্তা বিকশিত হবে না— যথার্থ ইতিহাস সচেতন তারাশঙ্কর এই বিষয়টিকেও নির্মোহ ভঙ্গিতে দেখালেন। তাই কর্তার থান বেলগাছ ঝড়ে উপড়ে পড়ে যায়, বনোয়ারী ও কাহারকূলের লোকেরা তাকে সোজা করে দাঁড় করায়, কিন্তু সাহেবরা এসে সেই থানেই অফিস খোলে। অর্থাৎ বেলগাছের মতোই চ্যুত হয় কাহারপাড়া। কাহারপাড়ার বাঁশবন কাটা হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ উড়ে যায়। বনোয়ারীর মতো কাহারপাড়ার কোনো কোনো মানুষ তখনো ভাবে করালীর পাপেই এই সর্বনাশ হল। সেই-সব মানুষের দিনও শেষ হয়ে যায়, কাহারপাড়ার মাতব্বরিও লুপ্ত হয়ে যায় করালীর কাছে বনোয়ারীর নির্মম পরাজয়ের ফলে। পুঁজিবাদী বিস্তারের এই সমাজব্যবস্থায় রতনের মতো কাহারপাড়ার কেউ কেউ হেদো মণ্ডলের মতো মনিব বা সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে রেগে ওঠে বটে, তবুও অপর প্রভু শ্বেতবর্ণের শাসকদের অর্থাৎ ইংরেজদের তাকে মেনে নিতেই হয়। আবার বনোয়ারীর মতো মাতব্বরের আচরণে একসময় অসন্তুষ্ট হয়েছিল কাহারপাড়ার নয়ানের মতো কেউ কেউ, কিন্তু নতুন মাতব্বর করালীর আচরণেও রাগে দুঃখে ক্ষোভে পাখিকে আত্মহত্যা করতে হয়। আবার তাতে করালীর কোনো অনুশোচনাও দেখা যায় না। আসলে কাহারপাড়ার নিম্নবর্গীয় জীবনে, তাদের কৃষিজমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত জীবনে ছিল বৃহত্তর জনসমাজের যোগ, তাদের জীবনে তাই নৈতিকতাও ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক আগ্রাসী লেহন ক্ষমতার কবলে পড়ে করালীর মতো মজুরেরা শুধু শ্রেণী সমাজচ্যুত হয় নি, কেবল নৈতিকতা হারায় নি, নিজের পরিচয়কেও গড়ে তুলতে পারে নি। তাই কাহারপাড়ার বাঁশবাদির বাঁধের বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বের হয়; কচি কচি ঘাস দেখা যায়, করালী সবল হাতে গাঁইতি চালায়, বালি কাটে, মাটি খোঁজে। নতুন হাঁসুলী বাঁক নির্মাণের জন্য, উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেওয়ার পথ কাটে, যে পথ কাটা আসলে কখনো শেষ হয় না। এই স্বপ্নের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া, একটা স্বপ্ন পূরিত হলে পুনর্বার স্বপ্ন গড়ে তার দিকে ধাবিত হওয়া মানব জয়যাত্রার দিকটিকেই দেখায়। তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে একদা মার্কসবাদী সমালোচকগণ যেমন তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর মতো মেধাবী সমালোচকও তাঁর মার্জিত রুচি দিয়ে তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যকে দেখতে গিয়ে গ্রাম্য অভীধায় ভূষিত করেছিলেন। এই উভয় সমালোচনাই যে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যোপ্রণোদিতও বটে এই উপন্যাস যথার্থ অনুধাবণে তা স্পষ্ট হয়।

চার

নাগিনীকন্যার কাহিনী ও অরণ্যবহ্নি (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের স্ট্রাকচারে এসেছে মঙ্গলকাব্যের গল্প বলার ভঙ্গি। বর্তমান সমালোচকগণ অভিযোগ জানান যে, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত উপন্যাসের স্ট্রাকচার নির্মাণের ধারাটি পাশ্চাত্য, সেই ধারায় আমাদের নিজস্ব কথা নির্মাণের পরম্পরাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ মঙ্গলকাব্য-পাঁচালী-কথকতায় আমাদের সেই পরম্পরা ছিল। মঙ্গলকাব্য ছিল গেয়কাব্য, তা শ্রোতাদের পাঠ

করে বা গান করে শোনানো হত, অর্থাৎ তার মাধ্যম ছিল শোনার মাধ্যম। নাগিনীকন্যার কাহিনী উপন্যাসে নাগিনীকন্যাদের সুর করে ধরে কথা বলার মধ্য দিয়ে বা অরণ্যবহ্নিতে পটুয়ার গানের কথা দিয়ে পরিবেশিত চিত্রপট দেখানোর মধ্য দিয়ে গল্প বলার নয়, শোনার মাধ্যমটিকেই অবলম্বন করেছেন তারাশঙ্কর। এক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিককেই যেন পুনর্নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক।

পাঁচ

১৯৫১ খৃস্টাব্দে সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস (প্রথম লিখিত উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি') 'উত্তরঙ্গ'-এ বিদ্রোহী সিপাহী হীরালাল ওরফে লক্ষ্মীন্দর বা লখাইয়ের কাহিনী নির্মাণে মনসামঙ্গলের উপাদান প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক। মনসামঙ্গলে বাসরসজ্জায় কালনাগিনীর দংশনে প্রাণ হারিয়েছিল লখীন্দর, পরবর্তীকালে তার ঘটেছিল পুনর্জন্ম। নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তথা কোম্পানীকে বরবাদ করতে গিয়ে ইংরেজদের তাড়া খেয়ে হীরালাল জলে ভেসে এসেছিল গঙ্গা তীরবর্তী জগদ্দলে। এই হীরালালকে জগদ্দলের মানুষজন সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তির ফিরে আসা বলে মনে করল, মনে করল স্বয়ং মা মনসা ভেলায় ভেসে আসা বিষে নীল হয়ে যাওয়া মানুষের বিষ তুলে নিয়েছে। প্রায় মৃতজীবন ফিরে পেয়ে জগদ্দলে লখীন্দর বা লখাই নামে হীরালাল সেনদের প্রহরী হয়, তবুও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত জীবনেরই ছবি। মধ্যযুগীয় আলো অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বাগদীপাড়ায় মানুষজনের দৈশিকবোধ নেই; তারা জানে মা মনসা, সাপ, বিষ, বেহুলা, লখীন্দর এই-সব পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলিকে। তারা প্রতিদিনের খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত, জীবধর্ম পালনই সেখানে শেষকথা, নরনারীর অবৈধ সম্পর্কের আলোচনাই তাদের দিন গুজরানের উপায়, অর্থবান সেনদের কথা তারা মেনে চলে। কিন্তু লখাই ভুলতে পারে না তার সর্পদংশনের জ্বালা। তাই দেখি, অতীত স্মৃতিচারিতায় সে পরাধীনতার যন্ত্রণাকে বারবার উপলব্ধি করে, ইংরেজদের সে শত্রু বলেই মনে করে। জগদ্দলের প্রাণের সমারোহপূর্ণ পরিবেশে লখাই সম্পর্কে শ্যামের স্ত্রী কালীকে নিয়ে কলঙ্কের রটনা হয়, সেই রটনা থেকে লখাই মুক্তিও পায়। কাঞ্চনের প্রতি লখাই আকর্ষণ অনুভব করে, তাকে সে বিয়েও করে। এইভাবেই ভারতবর্ষের বোধহীন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও লখীন্দর মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। মুরলী বাবাজীর আখড়াতে দুই গোরা জুতো পরে মন্দিরে উপস্থিত হলে লখাই সে অনাচার সহ্য করতে না পেরে এগিয়ে যায় স্পর্ধিত সিংহের মতোই। আসলে যে ইংরেজদের বিরুদ্ধতা সে করেছিল, সেই ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা তার মজ্জাগত, আজন্ম তার শোণিতে সেই ঘৃণা বহমান। লখাই উপলব্ধি করে যে, সে মারাত্মক বিপদের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তবুও সে নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারে না। এ যেন সর্পদংশনের জ্বালাকে ভুলতে না পারার মারাত্মক যন্ত্রণার তাড়না। ইংরেজ শাসকরা লখাইয়ের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়, আবার চতুর ইংরেজ তাকেই চটকলে মজুর খাটানোর যথার্থ ব্যক্তি বলে মনে করে। অন্যদিকে কাঞ্চন-লখাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে সেন বাড়িতে লখাইয়ের ডাক পড়ে আর সেখানেই সে জানতে পারে যে মহারানীর জয় হয়েছে। লখাই প্রথমে মনে করে এ মহারানী ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, পরবর্তীকালে সে জানে এ হল ভিক্টোরিয়া। সেন বাড়ির মেজকর্তা মহারানীর রাজত্বে খুশি হয়। কিন্তু মেজকর্তা, যে লোকের কাছে উন্মাদ হিসাবেই পরিচিত, সে আমাদের বিকলাঙ্গ অবস্থাকে ব্যঙ্গই করে। লখাই মুহূর্তের মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ে, নিজেকে সে পলাতক সেনানীরূপে অভিহিত করে বোঝায় সাবধান ও শান্ত হতে, অধীর হয়ে নিজের বিপদকে ডেকে না আনতে। তাঁতীয়া টোপীর ফাঁসির খবর শুনে তার বুক যেন তীক্ষ্ণ তলোয়ারের প্রবেশে আমূল বিদ্ধ হয়ে যায়, হৃৎপিণ্ড হয়ে যায় খণ্ডিত ও রক্তাক্ত। লখাই বারংবার প্রতিবাদের কথা বলতে চায়, জানাতে চায় হীরালালদের জেহাদের কথা, কল্পনা করে ইংরেজদের বিতাড়িত করার কথা— কিন্তু পারে না। যে রাজনৈতিক পরাজয়ের বিষদংশন তার শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে আছে, তার জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। এই বিষদংশন থেকে লখাই মুক্তি খুঁজেছে, পেয়েছে কিছুটা ব্যক্তিক

পারিবারিক জীবনের মধ্যে, জগদ্দলের আধিদৈবিক-আধিভৌতিক পরিমণ্ডলে কাঞ্চনের প্রেম সংসর্গ পেয়ে। তাই একমাত্র কাঞ্চনকেই সে বলতে পারে তার অতীত সিপাহী জীবনের কথা। কিন্তু এই লখাই আর এক নৃশংস বিষদংশনের শিকার হয়, সে বিষদংশন এদেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস প্রক্রিয়াকে দেখে যাওয়ার বিষদংশন। সে দেখে কোম্পানীর বাড়বাড়ন্তকে, প্রজাদের উপর খাজনা বৃদ্ধি করার নির্মমতাকে। এক একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, সর্বস্বান্ত হয়ে যায় জগদ্দলের মানুষজন। কোম্পানী চটকল তৈরি করে, রিষড়েতে কারখানা খুলে শ্বেতবর্ণের মানুষরা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রলোভন দেখায়, কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারকে ধ্বংস করে, তাদের ঘরের নারীদের ইজ্জত কেড়ে নেয়, চটকলে নিয়ে এসে ধর্ষণ করে, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের জন্ম দেয়। কানুর মতো, পবনের মতো পরিবার শেষ হয়ে যায়। বিষদংশনে ক্ষতিবক্ষত লখাই ছটফট করে, পবনের হাতে সে তাই অস্ত্র তুলে দিয়ে বলে ফিরিঙ্গিকে এক কোপে শেষ করে দিতে, আর না পারলে গলায় দড়ি দিতে। পবন গলায় দড়ি দিয়েই মারা যায় আর সেই আতঙ্কে লখাইও গ্রস্ত হয়। তার স্বস্তিটুকু অন্তর্হিত হয়, কাঞ্চন মারা যায়। সুতরাং হীরালালের শরীর থেকে বিষ একদা নিংড়ে নিতে দেখেছিল জগদ্দলের সংস্কারগ্রস্ত মানুষজন, আর আজ কোম্পানীর বিষাক্ত গোখরোর বিষ চরাচর ব্যাপ্ত করে দিয়েছে, যার নিঃসঙ্গ সাক্ষী থেকে যায় লখাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মঙ্গলকাব্যের লখাই চরিত্রকে নিয়ে এসে প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বহমান করেছেন সমরেশ বসু তাঁর 'জগদ্দল' উপন্যাসেও।

ছয়

মঙ্গলকাব্যের উপাদান সমরেশ প্রয়োগ করেছেন তাঁর 'সওদাগর' (১৯৫৬-৫৭) উপন্যাসেও। মধ্যযুগের অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনে তৎপর সওদাগরের রূপই নির্মিত হয়েছে এই উপন্যাসের মেঘনাদ চরিত্রের মধ্যে। মঙ্গলকাব্যের বণিক নায়কেরা যেমন বংশ পরম্পরায় তাদের সাধনাকে বজায় রেখেছিল, তেমনি অসম্ভব একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে মেঘনাদ গড়ে তুলেছে নিজেকে। আবার মঙ্গলকাব্যের বণিক নায়কদের অর্থ ও কাঞ্চনের সন্ধানে দূরতম দ্বীপ ও দেশ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে বারে বারে ভাগ্যতাড়িত হতে হয়েছিল। মেঘনাদও একই সাধনায় নিযুক্ত হতে গিয়ে মধ্যযুগের সওদাগরের মতোই ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েছে। মেঘনাদের বড়ো আশা সে ধনপতি সওদাগর হবে, খাল, নালা, নদ-নদী অতিক্রম করে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেবে তার সপ্তডিঙা। সে যাবে দূর-দূরান্তে, পৃথিবীব্যাপী সে করবে বাণিজ্য। তার পিতা যাবে নসীরাম গণৎকারের বাড়ি, ঠাকুরমশাই গণনা করে বলে দেবেন মেঘুর সপ্তডিঙা ফিরবে কি না। সে কামনা করে তার বেশ যেন ধনপতি সওদাগরের, গণৎকার তার পিতাকে বলছেন লাটাই চণ্ডীর ব্রতধারণ করতে, কেন-না মেঘু ফিরে আসবে হীরে জহরৎ ধনরত্ন নিয়ে। তার ফিরে আসার সময় নগরী জুড়ে বাজবে বাদ্য, গৃহবধূরা দেবে উলুধ্বনি। যাবতীয় প্রতিকূলতায় মেঘনাদ যখন দিশেহারা তখন ধনপতি সওদাগর তার মনে আশার সঞ্চার করে। তার মনে পড়ে যায় অভিশপ্ত সওদাগরও একদা সর্বস্বহারা হয়ে ক্রন্দন করেছে, ভিক্ষা করেছে নগরীর দুয়ারে দুয়ারে। তার স্ত্রী ধান পাতা সিঁদুর আমের পল্লব দিয়ে ক্রন্দন করতে করতে সংবর্ধনা করেছে লক্ষ্মীর। সাতচল্লিশের মধ্যরাত্রিতে ভারত ভাগের মুহূর্তে মেঘনাদের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়েছিল। যে বিত্ত কাঞ্চনের সঞ্চয় ছিল মেঘনাদের স্বপ্ন, যে ব্যবসা ছিল তার প্রাণ, সে-সবকিছুই তাকে হারাতে হয়েছিল। বংশ পরম্পরায় বণিক হওয়ার সাধনা যাদের ছিল মজ্জাগত সেই সাহাবাড়ির ছেলে মেঘনাদ সাতচল্লিশের কালরাত্রিতে মুহূর্তের মধ্যে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তবুও তারই মধ্যে সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভোলে নি, সংগ্রামী মনোবৃত্তি সে বিসর্জন দেয় নি। তাই মঙ্গলকাব্যের ধনপতি তার আদর্শ হলেও সে যেন আর এক মঙ্গলকাব্যের আর এক নায়ক চাঁদের মতোই। সপ্তডিঙার ভরাডুবি, একের পর এক পুত্রবিয়োগ, প্রিয়তম পুত্র লখীন্দরের মৃত্যু, অভিজ্ঞান বিচ্যুতি সমস্ত কিছু ঘটার পর চাঁদ তার সংগ্রামপরায়ণ মনোবৃত্তিটিকে বিসর্জন দিতে পারে নি। তার সংগ্রাম

ছিল লোকায়ত দেবী মনসার বিরুদ্ধে। মেঘনাদের জীবনে লীলার আবির্ভাবও যেন অনুরূপ। ঔপন্যাসিক সমরেশ কালসর্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখালেন যে, মেঘনাদের জীবনে লীলাও তেমনি প্রাণ সংহারক। তাই এক দিকে মেঘনাদ বিত্ত ও কাঞ্চনের সংস্থানে অমানুষিক পরিশ্রম করে, অন্য দিকে তাঁর স্ত্রী লীলা বিশ্বসংসারে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায়, সোনা দানা ঐশ্বর্য যা আছে সব-কিছু বিনষ্ট করে দিতে প্রয়াসী হয়। কালনাগিনীর মতোই কালো ও সুন্দরী স্ত্রী লীলা মনসার মতোই লোকজ-নিম্নজ; সে সোনাদুলির চরের মেয়ে, তাদের সঙ্গে সমাজের বর্ণহিন্দুরা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে চায় না, চায় না কোনো রকম সম্পর্ক তৈরি করতে। সোনাদুলির চরের জীবন শৃঙ্খলাহীন, যে কোনো রকম বন্ধন স্বীকারে তারা অপারগ। এই লীলা মেঘনাদের জীবনে ঐশ্বর্য ও মর্যাদার ক্ষয়সাধনে তৎপর। বিবাহের পর একদা সে তার স্বামীর কাছে পেতে চেয়েছিল ভালোবাসা, কিন্তু বিত্ত ও কাঞ্চনের সাধনায় নিযুক্ত মেঘনাদ সে চাওয়ার কোনো মূল্য দেয় নি, তার শরীর ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে জানতেও চায় নি কোনোদিন। স্বামী মেঘনাদের প্রতি লীলার ছিল তীব্র ক্ষোভ আর তাই সে নেমেছিল হৃদয়ভেদী মারাত্মক এক আত্মহননের খেলায়। মঙ্গলকাব্যের মনসাও পূজা পাওয়ার প্রত্যাশায় চাঁদের মনোযোগ দাবি করেছিল এবং ব্যর্থ হয়ে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছিল। একইভাবে মেঘনাদের সওদাগরি ধ্বংসে লিপ্ত হয়ে লীলা বিনচৌকে তার সমস্ত স্বর্ণভাণ্ড দিয়ে দেয়। অন্য দিকে মেঘনাদ ধনপতির মতোই স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে তার বড়ো কারখানা গড়ে উঠবে, তাতে থাকবে ম্যাসিন। সেই মন্দিরে হবে তার টাকার পুন্যভাণ্ড, তবে ঘটবে তার সিদ্ধিলাভ। সমরেশ বসু শ্রমিক ইউনিয়ন, ভোটের রাজনীতি, পারস্পরিক বিবাদ ষড়যন্ত্রমুখর চল্লিশের দশকটিকে চিহ্নিত করলেন। অন্য দিকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের নায়ক চাঁদের সমীপবর্তী বিপরীত পটভূমিটিকেও যেন প্রতীকায়িত করলেন। বিনচৌয়ের ষড়যন্ত্রে মেঘনাদ যখন আবারও সর্বস্বান্ত হয় তখন গনৎকার নসীরাম ধনপতি সওদাগরের লক্ষণ তার ভাগ্যে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে জানায় আর মেঘনাদ দেবীর রুদ্রমূর্তিকেই লক্ষ করে। মেঘনাদের মনে হয় সে এই সংসারে একজন পরাজিত ব্যক্তি, লেখাপড়া শেখে নি বলেই তার এই পরাজয়। তবুও সেই মেঘনাদই সফল সওদাগরের আশা নিয়ে শ্রমিকের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, মিলিত হয়ে যায় শ্রমিক মিস্ত্রি বিজয়ের আশাও। আধুনিক প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্যের নায়কের আশা ও আশাভঙ্গের যন্ত্রণাকে এক্ষেত্রে দেখালেন লেখক। এই মেঘনাদ রিক্ত নিঃস্ব হয়ে চতুর্দিকে শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করেও যেন সদর্থক গন্তব্যে পৌঁছায়। স্ত্রী লীলা লাভ করে মেঘনাদের হৃদয়। মেঘনাদের লীলাকে হৃদয় সমর্পণ করার চিত্র মঙ্গলকাব্যের চাঁদের মতোই, এ যেন চাঁদ সওদাগরের মনসাকে পূজা দেওয়া আর মনসার তা আকণ্ঠ গ্রহণ করার ছবি।

সাত

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগপৎ সমালোচিত ও আক্রান্ত কবি, বিতর্কিত ও প্রশংসিত কবি ভারতচন্দ্রের জীবনকথা অবলম্বনে একালের আখ্যান রচনা করেছেন 'অমাবস্যার গান'-এর (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ) স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের গ্রন্থসূচনা অংশে প্রথাগত মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে আত্মবিবরণী দিয়েছেন, ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন কবিজীবনী। ঔপন্যাসিক সেই অংশ উপজীব্য করে আধুনিককালের বয়ান নির্মাণ করতে গিয়ে সমকালীন সমাজজীবন অভিজ্ঞতার এবং ব্যক্তিচৈতন্যের উপলব্ধির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ যখন সর্বব্যাপী নৈরাশ্য ও হাহাকারের শিকার, তখন ভারতচন্দ্র পুরাতন মঙ্গলকাব্যের আধারেই একজন বরাভয়দাত্রী মাতৃমূর্তির কল্পনা করেছিলেন দেবী অন্নদা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার অসংগতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, সমকালীন সমাজের বিকৃত ব্যবস্থার চাপে পড়ে পঙ্গু ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির ম্লান ও পাণ্ডুর মূর্তি তিনি দেখেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য এক হিসাবে কবির অন্তর্জীবনের কাহিনীও।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে রয়েছে সত্যের নানামুখী সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবনার যথার্থ রূপায়ণ নারায়ণের উপন্যাসে। একদা (ষোড়শ শতাব্দীতে) বাংলাদেশে ভক্তিবাদের উদ্দামতা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। যে সমাজে ধর্ম অভ্যাসমাত্র, শাস্ত্র কার্যসিদ্ধির উপায়মাত্র, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ, জাতির মেরুদণ্ড ন্যুব্জ হয়ে গেছে সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতচন্দ্র। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আর সামান্যতমও অবশিষ্ট ছিল না। আসলে এই সময়ে দেশের শাসকদের স্বভাব ও মানসিকতার ঘটেছিল ক্রমাবনমন, তাদের লোভ লালসা ও শোষণ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় বর্গীর অত্যাচারে বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। সিরাজদৌল্লা ওরফে মীরজা মামুদের নারী আসক্তি ও হঠকারী মনোভাবে সেকালের বাঙালি সমাজ যুগপৎ অতিষ্ঠ ও উৎকণ্ঠিত। এক দিকে দেশের বদ্ধমূল ব্যবস্থার ক্রমশ বিনষ্টি ঘটেছিল, রাজার চেয়ে আমীর ওমরাহ ও পারিষদবর্গের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্য দিকে পাশ্চাত্য জাতিও লোভের লেলিহান শিখাটিকে জ্বালাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল। দেশের রাজনীতির এই কাল মুহূর্তে সাধারণ মানুষের মনে ছিল কেবলমাত্র আতঙ্ক— সে আতঙ্ক কখনো বর্গীর কারণে, কখনো চোর ডাকাতের কারণে, কখনো-বা দলছাড়া ফৌজের লুণ্ঠনের কারণে। এর মধ্যে ঘটে চলেছে কাপালিকের ভণ্ডামি, নিষ্পাপ গৃহবধূকে দস্যু কর্তৃক পুষ্করিণী থেকে লুণ্ঠনের ঘটনা। এ যাবৎকাল জমিদারেরা যে প্রজাদের সুখে দুঃখে রক্ষা করেছেন, সেই জমিদারও অপরিমিত বিলাস ব্যসনে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। চন্দননগর, কলকাতা, কাশিমবাজার কুঠি থেকে আমদানি হচ্ছে পাশ্চাত্য সুরা; দিল্লি-লক্ষ্ণৌ-বারাণসী থেকে আসছে নৃত্যপটীয়সী বাইজী, মানুষ নারী ও সুরায় আকণ্ঠ নিমগ্ন। রাজকোষ শূন্য, দেশের অর্থনীতি তথৈবচ।

এই সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির বিকৃত অবস্থায় ভারতচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য। 'অমাবস্যার গান'-এর স্রষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর সার্বিক বিকলাঙ্গ পরিস্থিতি তথা ঘোরতর অমাবস্যার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই দেখি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় দিতে গিয়ে কৃষ্ণনগরের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকে চিত্রিত করলেন, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দীর বীরত্ব ও বিচক্ষণতার উল্লেখ করলেন, রাজবল্লভ-জগৎশেঠ-রানী ভবানী প্রমুখ নবাব ও অভিজাত ব্যক্তির বিরোধিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, আবার মীর্জা মামুদ বা সিরাজের জগৎশেঠের পুত্রবধূ হরণ করার বা রানী ভবানীর কন্যা তারার প্রতি দুর্বলতার কথাও বললেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেখতে পান দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিত্রটিকে, যে চিত্র সর্বনাশের চিত্র। অথর্ব ও অসুস্থ নবাব আলীবর্দীর পর নিষ্ঠুর মীর্জা মামুদ, ভীরু নওয়াজেম, চরিত্রহীন-অকর্মণ্য-বিলাসী শওকৎ জঙ্গ কিংবা স্বার্থপর রাজবল্লভ যে-ই ক্ষমতায় আসুন না কেন, জমিদারদের প্রতি নিষ্ঠুরতায়, প্রজা শোষণের বিষয়ে কেউই পিছুপা হবেন না। অন্যদিকে, কৃষ্ণনগরের দুর্গোৎসবের মধ্যে ভারতচন্দ্র দেখেছেন এক বাংলাকে— যে বাংলার মানুষজন ধর্মের প্রতি আস্থাহীন, চোর ডাকাতের ভয়ে ত্রস্ত, উচ্ছৃঙ্খলতা আর ব্যভিচারে পারঙ্গম, খেউড় গানে আর বাইজী নারীর নৃত্যে মুখর। চতুর্দিকে অন্নের জন্য মানুষের হাহাকার। দেশে বস্ত্র তৈরি হয় আর ইংরেজ বণিকের দল সে বস্ত্র বেশি মূল্যে ক্রয় করে, মানুষ বিবস্ত্র হয়ে যাপন করে লহমা। ভারতচন্দ্র দেখেছেন একদিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দয়াধর্ম পালন করেন, সমাজ প্রতিপালন করেন, দেশজোড়া পণ্ডিতদের মাসোহারা দেন, ধার্মিক বলে তাঁর খ্যাতি আছে; অন্য দিকে সেই মহারাজের দেওয়ান-সিপাহী-জমাদাররা ক্ষুধার্ত-অসহায়-শূন্য দৃষ্টির অধিকারী দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে না পেরে অকথ্য নির্যাতন করে। কেন-না, বাংলার কৃষিজীবী দরিদ্র প্রজাদের খাজনাতেই মহারাজা নবাব আলীবর্দীকে নজরানা দেবেন, আগত দুর্গোৎসবের এলাহী আয়োজন করবেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদারদের প্রজা শোষণের বিষয়টিকে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিটিকে যথার্থ আন্তরিকতায় চিহ্নিত করলেন, গ্রামসি কথিত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় প্রভুত্ব ও অধীনতার বিরোধমূলক সম্পর্কটিকে দেখালেন, আবার কবির অন্তরের গহনভূমিটিকে চিত্রিত করলেন। এই সমাজ পটভূমিতে অবস্থান করে ভারতচন্দ্র যে মুকুন্দের

মতো বিনম্র ভক্তির কাব্য চণ্ডীমঙ্গল লিখতে পারেন না, তিনি যে সমাজ-সঙ্কট আত্মস্থ করে নূতন মঙ্গলকাব্য লিখবেন, ন্যায়-অন্যায় সংশ্লিষ্ট দার্শনিক জিজ্ঞাসাকেই কাব্যের পরতে পরতে প্রবিষ্ট করাবেন, ভারত জীবনীকার ঔপন্যাসিক নারায়ণ সেই দিকটিকেই বারে বারে দেখিয়েছেন।

স্যমুর চাটম্যান (Seymour Chatman) তাঁর 'স্টোরি অ্যান্ড ডিসকোর্স', (Story and Discourse) গ্রন্থে রিয়েল অথর ও ইমপ্লায়েড অথরের কথা বলেছিলেন। ব্যক্তি ভারতচন্দ্র তথা রিয়েল অথর ভারতচন্দ্র যে সমাজের শরিক, সেই সমাজই গড়ে তুলেছে অন্নদামঙ্গলের ইমপ্লায়েড অথরকে। বিড়ম্বিত কবি ভারতচন্দ্র বিধির বিড়ম্বনায় ঘটে যাওয়ায় মুহূর্তগুলির সঙ্গে প্রত্যাশিত জীবনের কোনো মিল খুঁজে পান নি। বারে বারে উপলব্ধি করেছিলেন জীবন পুষ্পিত পেলব নয়, কণ্টকাকীর্ণ। জীবনের প্রারম্ভেই পিতার সঙ্গে বর্ধমানের মহারানী বিষ্ণুকুমারীর বিরোধ হলে সর্বস্বান্ত হন পিতা, তাঁকে মামাবাড়িতে বড়ো হতে হয়। মামাবাড়িতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে করায়ত্ত করার পর নিজ গৃহ প্রত্যাবর্তনকালে অগ্রজরা তাঁকে সাদর আহ্বান জানান নি, তীব্র আঘাতই দিয়েছিলেন। কেন-না, তৎকালে মুসলমান শাসকদের কাছে ফারসি ছিল সমাদরণীয়, দেবভাষায় অর্থাগমের পথে ছিল নানা অন্তরায়। সুতরাং, ভারতচন্দ্র উপলব্ধি করলেন পুষ্পিত সম্পর্কগুলির বন্ধন কতটা শিথিল। জীবনে অর্থের মূল্য কতখানি। উপরন্তু সেই সময়ে অপার সাহসী ভারতচন্দ্র বংশকৌলীন্যে কিছু হীন এক আচার্যকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং, অগ্রজদের কোপে পড়ার এ ও অন্যতম কারণ। অভিমানী ভারতচন্দ্র জীবনের রূঢ়তাকে প্রত্যক্ষ করে অপার নিষ্ঠায় শিক্ষালাভ করলেন ফারসি ভাষা। এবার ফিরে এলেন বাড়িতে। যে ভ্রাতারা একদা তাঁর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, আজ তাঁরাই তাঁকে সাদরে আহ্বান জানালেন। তাঁদের আদেশ অনুযায়ী বর্ধমানে গিয়ে তিনি সম্পত্তি দেখাশোনার ভার গ্রহণ করলেন, তাঁরা কথা দিলেন রাজস্বের অর্থ যথা সময়ে পাঠাবেন। কিন্তু এবারও অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হলেন তাঁরা, বিনিময়ে কারারুদ্ধ হলেন ভারতচন্দ্র। জীবনের বিড়ম্বনাকে আবারও প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। অবশ্য ব্রাহ্মণ সন্তান ভারতচন্দ্র আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রবল আলাপচারী হওয়ায় অচিরেই কারামুক্ত হলেন। কিন্তু গৃহজীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণাবশত ঠিক করলেন এবার গৃহী জীবন নয়, আলিঙ্গন করলেন সন্ন্যাসজীবনকে। উপস্থিত হলেন কটকে, শিবভট্টের দরবারে শ্রীক্ষেত্রে বাস করার প্রার্থনা চাইলেন। শিবভট্টের অনুমতিতে শৈব ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব ভারতচন্দ্রে রূপান্তরিত হলেন, সঙ্গে রইল নাপিত ভৃত্য রঘুনাথ। শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণবেরা নীলাচল থেকে বৃন্দাবনের দিকে পদব্রজে যাত্রা করলে ভারতচন্দ্রকে তথা কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গী করলেন তাঁরা। যাত্রাপথে খানাকুল কৃষ্ণনগরে বিশ্রাম নিলেন বৈষ্ণবেরা আর এখানেই ছিল ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতির বাড়ি। ভৃত্য ও সঙ্গী রঘুনাথ ভারতচন্দ্রের অজ্ঞাতে সেখানে খবর দিল, তাঁরা ভারতচন্দ্রকে ধরে নিয়ে এলেন তাঁদের গৃহে। সন্ন্যাসী ভারতচন্দ্র গৃহী ভারতচন্দ্রে পরিণত হলেন। এবার উপলব্ধি করলেন দীর্ঘ বিরহযাপনে কাতর স্ত্রীর যন্ত্রণাকে, অনুভব করলেন জীবনকে তিনি উপভোগ করতেই চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন পার্থিব সমস্ত কিছু থেকে, জীবনের যাবতীয় অবলম্বন থেকে প্রবল পিপাসা মেটাতে আর তিনি তা পান নি বলেই গ্রহণ করেছিলেন সন্ন্যাসজীবন। তাই যে পিতা ও অগ্রজদের জন্য তিনি যন্ত্রণাভোগ করেছেন, সেই পিতা ও অগ্রজদের গৃহে আর যেতে চাইলেন না তিনি। আশ্রয় নিলেন ফরাসডাঙায়, ফরাসিদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকটে। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সূত্রেই পরিচিত হলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আর সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতাতেই অন্নদামঙ্গলকাব্য রচিত।

রিয়েল অথর ভারতচন্দ্রের এই অস্থির জীবন এবং তৎকালের বিক্ষুব্ধ কালপটভূমি গড়ে তুলেছে অন্নদামঙ্গলের ইমপ্লায়েড অথর ভারতচন্দ্রের চৈতন্য। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে তাঁর রচনার একমাত্র পরিচয় খুঁজতে চান নি ঔপন্যাসিক নারায়ণ। বরং বলতে চেয়েছেন সমাজ-অর্থনীতিক পরিস্থিতিই লেখক ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতাকে নির্মাণ করেছে। সুতরাং, 'অমাবস্যার গান' ভারতচন্দ্রের কেবল ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় নয়। এক ঐতিহাসিক অকাল মুহূর্তকে অনুধাবণ করে অন্নদামঙ্গলের কবির জীবনদর্শনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

করলেন ঔপন্যাসিক। নারায়ণ দেখালেন কবি শ্রেণীর চৈতন্যকে ধারণ করেছেন বলেই নতুন মঙ্গল লিখতে পারেন, দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশের ফলে মুকুন্দ লিখেছেন তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আর ভারতচন্দ্র দেবীর আদেশে নয় কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় লেখেন কাব্য। দেবী অন্নদা ভারতচন্দ্রের বাঞ্ছিত দেবতা, তিনি চণ্ডীর আরাধনা করেন নি, অন্নের আকালের কালে অন্নকে কেন্দ্র করে হাহাকারকে তিনি দেখিয়েছেন, আবার অন্নকে কেন্দ্র করে স্বপ্নও তিনি রচনা করেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে। এই কারণেই এই কাব্যে তিনি অন্নদাত্রী দেবী অন্নদার বন্দনা করেছেন। এই দেবী ভারতচন্দ্রের স্বপ্নের-কল্পনার-আদর্শের প্রতিমূর্তি, তাঁর আরাধনা তিনি করেন। কিন্তু তিনি রাজসভার কবি, সুতরাং দৃশ্যমান দেবতা কৃষ্ণচন্দ্রকে ভারত উপেক্ষা করতে পারেন না। যুগপৎ কৃচ্ছ্রসাধনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করার পর যথার্থ মর্যাদা দান করে যে দেবতা কাব্য লিখতে আদেশ দিচ্ছেন, প্রতিনিয়ত যাঁর কৃপাদাক্ষিণ্য ভোগ করছেন তিনি, অর্থ আনুগত্য লাভ করছেন, তাঁর বন্দনা ব্যতীত দেবীর আদেশে তিনি কাব্য লিখবেন কেমন করে। সুতরাং, প্রতি মুহূর্তের কৃপাদাক্ষিণ্যময় মানবরূপী দেবতাটির, রক্তমাংসের দেহধারী দেবতাটির আজ্ঞায় তিনি কাব্য লিখছেন— এ সত্যটিকে তিনি বারে বারে স্বীকার করলেন, যা প্রথাগত মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় না। আবার কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করে তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখেছেন— এমনতর স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কেবল পৃষ্ঠপোষক বন্দনা করেন নি ভারত, সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ কবি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাও করেছেন। শৈব কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতির মধ্য দিয়ে শৈব ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণব বন্দনাও প্রকাশিত হয়েছে, দেখিয়েছেন প্রথাগত ধর্মের চেয়ে অনেক বড়ো অনুভূতিশীল ব্যক্তির উপলব্ধিজাত রহস্যময় সত্য যা মানবধর্মেরই অন্যতম রূপ। তাই অন্নদামঙ্গলের কবি অষ্টাদশ শতকেও চৈতন্যের বন্দনা করতে পারেন, ব্যাসকে দিয়ে বলাতে পারেন তেজোবধের বিনষ্টি হলে প্রাণবধ ভালো, দেবী অন্নদার জবানিতে প্রকাশ করতে পারেন হরিহরের অভিন্ন মূর্তিকে যে পূজা করে সে-ই প্রকৃত ভক্ত। কথাকোবিদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখান যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজসভার চটুল জীবনাচরণ ভারতচন্দ্রও প্রত্যক্ষ করেছেন, পৃষ্ঠপোষক রাজা কবিকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন আদিরসের চূড়ান্ত উপস্থাপনায় কাব্য লিখতে, চতুর্দিকে কবি দেখছেন বিলাস বৈভব উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যভিচারে পরিপূর্ণ গজিয়ে ওঠা লঘু জীবনকে। এসব দেখে কবি যন্ত্রণায় পীড়িত হচ্ছেন, কখনোই কবি উৎসাহিত হয়ে সেই আদিরসকে উপস্থাপিত করতে চাইছেন না। তাই বিবাহসভায় অশীতিপর বৃদ্ধ শিবের আচরণে মা মেনকা যখন কষ্ট পান, তখন সেই চিত্রের সঙ্গে ভৃত্য রঘুনাথ গ্রামের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকন্যার বিবাহের সাদৃশ্যকেই দেখতে পায়। যে শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূলে, কুবের স্বয়ং যাঁর ভাণ্ডারী, সেই শিবকেও ক্ষুধার তাড়নায় দোরে দোরে ভিক্ষা করতে হয়। যাবতীয় ঐশ্বর্যমূর্তির অন্তরাল থেকে বাংলাদেশের শিবই বেরিয়ে আসে, কেন-না এ দুর্গতি যে কবির নিজের চোখে দেখা। তাই অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখতে গিয়ে কবির মনে পড়ে যায়, বর্গীর আক্রমণের কথা, বাংলার চাষী-তাঁতী-ব্রাহ্মণের ম্লান পাণ্ডুর মুখের কথা, মনে পড়ে যায় তাঁর মায়ের কথা। কুপিতা বিষ্ণুকুমারীর আদেশে পেঁড়োর গড় লুণ্ঠিত হলে পিতা এবং অগ্রজরা যখন পলাতক তখন তাঁর রাজরানী মা সাশ্রুনেত্রে ভিখারীর বেশ ধারণ করেছিলেন। ধুলায় উপবিষ্টা মায়ের কাতরতাই কবির কাছে স্বপ্নাদেশ বলে মনে হয়েছে, স্বয়ং অন্নপূর্ণাই যেন তাঁকে মায়ের রূপ ধারণ করে দেখা দিয়ে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যের অন্নপূর্ণা নিষ্ঠুর ক্রূর নন, তিনি তাঁর মায়ের মতোই প্রসন্ন মধুর ও সদাহাস্যময়ী, তিনি ভক্তকে ক্ষুধার অন্ন দান করেন, দরিদ্রকে তথা লাঞ্ছিতকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

লুসিয়ঁ গোল্ডম্যান কনসায়েন্স, পসিবলের কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ অথর নামক ব্যক্তিটি যে সমাজ ও শ্রেণীর শরিক, সেই সমাজের সেই শ্রেণীর ভবিষ্যৎগামিতা উপন্যাসের মতো শিল্পমাধ্যমে সূচিত হয়। একথা ঠিক, শিল্পীর শিল্পের উপস্থাপিত শ্রেণীটি যে সুষম হবে তার কোনো মানে নেই। সেই শ্রেণীটির থাকতে পারে অসংখ্য জটিলতা, তাতেও থাকতে পারে উপলবদ্ধুতার নানা মাত্রা। নারায়ণ সেই কনসায়েন্স পসিবল সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই তিনি দেখান— ভারতচন্দ্র তাঁর লিখিত গানে বলতে পারেন দেবতা প্রতিনিয়ত যে লীলা খেলা

খেলছেন, তা মানুষের পক্ষে সর্বদা মঙ্গলজনক নয়, বরং 'আমি' মানুষ, আমি যে খেলা খেলতে চাই, দেবতা তুমি সেই খেলাই খেলাও। মধ্যযুগের কবি 'আমি'-র উচ্চারণ প্রথম করলেন, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যযুক্ত মানুষের উচ্চারণ। আবার তিনি এও জানেন যে, ব্যক্তি-উপলব্ধি প্রকাশের উপভোক্তা সে-যুগে বিরল। একথা জেনেও সেই কবিই অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখে মঙ্গলকাব্যের আধারে কালের চৈতন্যকে ধারণ করেন। সেই কাব্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে পারে না। তাই ভারতচন্দ্রকে লিখতে হয় বিদ্যাসুন্দর। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজসভার চৈতন্যবান কবিকে রাজার মনোরঞ্জনের জন্য কাব্যকে কাব্য ছন্দ অলঙ্কার চটুল বাকভঙ্গিতে মুখর করে তুলতে হয়, আদিরসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে দিতে হয় কাব্য। নারায়ণ দেখান যে, কৃষ্ণচন্দ্র যে অনুভূতিহীন রাজা মাত্র তা নয়, নাগরিক জীবনের চটুলতায় নিজেকে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত করেন তাও নয়। আসলে, মুসলমান শাসনের দিন শেষ হতে চলেছে, বণিকের দল প্রসারিত করেছে তাদের লোলজিহ্বা, সুতরাং চিন্তান্বিত কৃষ্ণচন্দ্রের আশঙ্কাময় দিনগুলিতে বিদ্যাসুন্দর হয়ে ওঠে তাঁর ভুলে থাকার পানীয় উপাদান, তাঁর মনোরঞ্জনের উপকরণ। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে দেখান যে, ভারতচন্দ্রের মৃত্যু তাই ব্যক্তির মৃত্যু নয়, কেবল এক কবির মৃত্যু নয়, এ আসলে এক ঐতিহাসিক যুগের অবসানও বটে। নারায়ণের 'অমাবস্যার গান'-ও তাই কেবল একজন মঙ্গলকাব্যের কবির জীবনী উপন্যাস মাত্র নয়, একটি শ্রেণীর চৈতন্যের ধারক, একটি শ্রেণীর ভবিষ্যৎগামিতার চিহ্নক।

আট

ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠিত কবি নয়, ষোড়শ শতকের রাঢ়বাংলার এক ব্রাত্য কবির আশা ও আশাভঙ্গের যন্ত্রণার রূপায়ণ মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৩৭২ বঙ্গাব্দ) উপন্যাস। চুয়াড় যুবক কল্‌হন আদিম আরণ্যক জীবনের পরিচয়কে মুছে ফেলে তথাকথিত সভ্যসমাজে শিল্পী বন্দ্যঘটী গাঞি হতে চেয়েছিল, চেয়েছিল দ্বিতীয়বার জন্ম নিয়ে এক দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টি করতে। কিন্তু সে জন্ম স্থায়ী হয় নি, দীর্ঘ যন্ত্রণাদগ্ধ পথ অতিক্রম করার পরও তাকে কেউই গ্রহণ করে নি। প্রথম ভুবনের মানুষজনও তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, নিষেধ অমান্য করার শাস্তি দিয়েছিল আর দ্বিতীয় ভুবনের মানুষেরা তার প্রথম ভুবনের পরিচয় পেয়ে ঘৃণায় তাচ্ছিল্যে তাকে ত্যাগই করে নি, মৃত্যুদণ্ডও ঘোষণা করেছিল। মঙ্গলকাব্যের এক প্রান্তিকায়িত কবির আখ্যান কেবল কোনো ব্যক্তির পরিচয়জ্ঞাপক নয়, এ কাহিনী আমাদের অতীত যাপনের পরিচয়টিকে তুলে ধরে, আমাদের বর্তমান লহমাটিকে দেখায়, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন দেখার আর স্বপ্নের মুখ থুবড়ে পড়ার প্রসঙ্গটিকে উপস্থাপন করে। এ উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৬৯ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ ষাটের দশক। ষাটের দশক বাঙালি জীবনের বিবর্তনের দশক। এই দশক বিবরবিলাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্য সুখপিয়াসী দিকটিকে ঘৃণা করতে যেমন শেখায়, তেমনি নিম্নবিত্তীয়-নিম্নবর্গীয়-প্রান্তিকায়িত জীবন সম্পর্কে আমাদের বোধোদয়ও ঘটে। অবশ্য মহাশ্বেতা একদিকে যেমন প্রান্তিকায়িত জনজীবনের ইতিহাস, সমস্যা, যাপনের পদ্ধতি, তাদের ক্ষোভ, জেহাদ ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন; অন্য দিকে তিনি প্রভুত্ব ও অধীনতা সম্পর্কের বিষয়টিও পূর্ণাঙ্গরূপে জ্ঞাত। সময়-সচেতন সাহিত্যিক মহাশ্বেতাকে ষাট ও সত্তরের দশকের প্রবল আলোড়ন প্রান্তিকায়িত জীবনের ইতিহাস, জাতি-বর্ণের বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ইতিহাসের আধারে উপস্থাপিত করতে প্রেরণাও জুগিয়েছিল। যে মহাশ্বেতা ইতিহাসের রোমান্সের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন, তাঁর কাছে ইতিহাসের অর্থ মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান করা। তিনি এও জানেন যে, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তথা রাজনৈতিক পটভূমিকার সচেতনতা ব্যতীত তা পাওয়া যায় না। আবার লোকজীবন সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে আর্থ-সামাজিক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। মহাশ্বেতা তাই 'বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে মেদিনীপুরকেই পটভূমি হিসাবে বেছে নেন। কারণ, বিচিত্র আদিবাসী জনজীবন, লোকসংস্কৃতির আবাসস্থল মেদিনীপুর। ষোড়শ শতকের

রাঢ় বাংলার বিশেষত মেদিনীপুরে চৈতন্যদেবের উদার মানবিকতাবাদী মতপ্রভাবে আদিবাসী জনজীবনেও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল সচেতনতা। কিন্তু যারা সুদীর্ঘকাল যাবৎ আর্থ-সামাজিক কাঠামোটিকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছে, শোষণের শিকড়টিকে সুদূর প্রশস্ত করেছে তাদের কাছে এই সচেতনতা ভীতিদায়ক হয়েছিল। সুতরাং, তারা দংশনেও হয়েছিল উদ্যত। এই প্রান্তিকায়িত জীবনের এক উত্থান ও অকস্মাৎ পতনের কাহিনীই 'বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাস।

আন্তনিও গ্রামসি নিম্নবর্গীয় জীবনকথা দিয়ে গড়ে ওঠা ইতিহাসের কথাই বলেছিলেন, যে ইতিহাস দিয়ে সমাজ অর্থনীতির অনুধাবন করা যাবে। আসলে প্রভুত্ববাদী সমাজব্যবস্থায় সর্বদা বিভাজন পরিলক্ষিত হয় এবং এই বিভাজন মূলত কেন্দ্র ও পরিধির বিভাজন। বর্ণহিন্দু সমাজে কিংবা ঔপনিবেশিক সমাজে অথবা যে কোনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কেন্দ্র পরিধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং পরিধিকে সেই আধিপত্য মানতে বাধ্য করে। এই আধিপত্য ও অধীনতার বিষয়টি সর্বদা গাণিতিক নিয়মে ঘটে তা নয়, কেন্দ্রের বদলে পরিধির পরিবর্তন ঘটবে এমন নিশ্চয়তাও নেই। পরিধিতে অবস্থানকারী সত্তা কেন্দ্রের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতেও চায় আর তার ফলে কেন্দ্র তার আধিপত্য বহন করতে গিয়ে তার আধিপত্য কায়েম করার কৌশলটি প্রকাশ্যে না করে গোপনে, স্পষ্টভাবে না করে অস্পষ্টভাবে, সরলভাবে না করে বক্র উপায়ে, বহুমাত্রিকভাবে করে থাকে। বিল অ্যাসক্রফ্‌ট, গ্যারেথ গ্রিফিথ্‌স ও হেলেন টিফিনের মতো চিন্তাবিদ সমালোচকরা উদ্ভিদবিদ্যা থেকে 'রাইজোম' শব্দটি গ্রহণ করে এই পদ্ধতিটিকে রাইজোমাটিক বলে অভিহিত করেছেন। রাইজোম জাতীয় গাছের বহু শিকড়ে যেমন নতুন নতুন গাছের জন্ম হয়, তেমনি প্রভুত্ববাদী শক্তিও তার কেন্দ্র বদল করে, এক অদৃশ্য জালের দ্বারা বঞ্চিতকে বেঁধে রাখে। শাসিতকে শাসন করার জন্য নানা সংস্কারের ঘেরাটোপে তাদের আবদ্ধ কবে, আপাতভাবে এক মধুর বাতাবরণ সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে শোষণের ধারাটিকে মজবুত করে। মহাশ্বেতা নানা উপন্যাসে এই প্রান্তিকায়িত জনজীবনকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে ক্ষমতা আধিপত্য দাপটকে যেমন উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি প্রান্তিকে অবস্থানকারীদের লোকজীবন-বিশ্বাস-সংস্কার তথা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। ফলে, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু'-র মতো উপন্যাস মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এবং মঙ্গলকাব্যের একজন কবির জীবনকথা হলেও আধুনিক কালের পটভূমিকায় তা অন্যমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের কর্ণধার রাজা গর্গের ক্ষুদ্র অথচ সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভীমাদল। ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন উচ্চবর্ণের মানুষজনের ধনভাণ্ডার স্ফীত। বর্ণশাসিত সমাজব্যবস্থা অটুট রাখাই তাই রাজার একমাত্র চিন্তা। কেন-না একাধারে ইসলাম অন্যাধারে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ভেদাভেদ না রেখে বর্ণ ও ধর্মকে না মেনে সকল মানুষজনকে উদারভাবে একীভূত করে। তাই এই দুই ধর্মের প্রচারে নিত্য আশঙ্কায় রাজা দিন কাটান এবং এই কারণে বর্ণাশ্রম প্রথার অনুকূলে নানা শ্রুতি পরম্পরায় প্রচলিত কথাকেও বারে বারে প্রচার করেন। তিনি কালী খাঁর উদাহরণ দিয়ে বলতে চান অন্ত্যজদের প্রতি ব্রাহ্মণের প্রীতি সহানুভূতিশীল কালী খাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ শাসক-সমাজের শাসনকে কায়েম করার জন্য আধিপত্যকে বজায় রাখার জন্য নানা কৌশলকে অবলম্বন করেন তিনি।

অন্য দিকে প্রান্তিকায়িত সমাজে থাকে আধিভৌতিক সংস্কার, নানা টোটেম ও টাবু। কৌম-সমাজে তথা গোষ্ঠী-সমাজে কোনো জীব বা উদ্ভিদকে সুরক্ষাদাত্রী বলে মনে করা হয়, মনে করা হয় সেই উদ্ভিদ বা জীব সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। অন্য দিকে এক অতিলৌকিক ও অলঙ্ঘনীয় নিষেধবাণীকে টাবু বলে। মধ্যযুগের দেববাদনির্ভর মানবতাবাদের পরিমণ্ডলে এবং গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে যেমন নদ-নদী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুকে কৌম-সমাজের প্রাণসত্তা বলে মনে করা হত, তেমনি অতিলৌকিক নিষেধবাণীও প্রচলিত ছিল। স্বভাবতই মঙ্গলকাব্যেও টোটেম ও টাবুর কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধখণ্ডে কালকেতু কর্তৃক গোধিকা বন্ধনের প্রসঙ্গ। 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে চুয়াড়, সমাজ নদ-নদী পাহাড়

পর্বতকে জীবন্ত সত্তা বলে মনে করে। তারা মনে করে রূপনারায়ণ নদী উন্মত্ত মানবের ন্যায় এবং তাঁর স্ত্রী শিলাবতী নদী। এই দুই নদ-নদীকে প্রণয় ও প্রতিহিংসার প্রতিমূর্তি যথাক্রমে দুই পুরুষ ও রমণী রূপেই তারা অভিহিত করে। এছাড়াও ঔপন্যাসিক প্রয়োগ করেছেন আদিম এক অরণ্য হস্তিযূথের প্রসঙ্গও। চুয়াড়-সমাজে একথা প্রচলিত যে, নিদয়ার জঙ্গলে আদিম প্রহরী হস্তিযূথ শঙ্কাহীন, তারা প্রমত্তভাবে ভীমাদল থেকে দণ্ডকারণ্য, কলিঙ্গ, মেদিনীপুর অতিক্রম করে বিন্ধ্যের পাদদেশ অবধি অবাধে গমন করে। সংস্কৃত পুরাণে যেমন সৃষ্টির ধারক হিসাবে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের কল্পনা করা হয়, তেমনি চুয়াড়-সমাজের প্রচলিত মিথ অনুসারে এই হস্তিযূথ তাদের হাতির দাঁতের দ্বারা ধরিত্রীকে ধারণ করেন। তাদের মিথ অনুযায়ী হাতিদের রক্ষাকর্তা পালকপ্যের গর্ভধারিণী ছিলেন এই হস্তিনী আর জন্মদাতা ব্রাহ্মণ সামগায়ন। পালকাপ্য মুনি হাতির সঙ্গে বাস করার ফলে মনুষ্য সংস্পর্শকে ঘৃণা ও ভয় করতেন। তিনি হাতিদের কাছে তাদের শাস্ত্র শিখেছিলেন, কিন্তু সেকথা সকলে জ্ঞাত হলে তিনি হস্তি সংস্পর্শহীন হন এবং শোকার্ত-নির্বাসিত লহমা যাপন করেন। সেই চরম দুঃখের দিনে চুয়াড়দের পূর্বপুরুষ তার তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছিলেন, চুয়াড়-রমণী তাঁকে স্তনদুগ্ধ দিয়ে করেছিলেন সিক্ত। ব্রাহ্মণকে স্তনদুগ্ধ দেওয়ার ফলে সেই চুয়াড়-রমণীকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল চুয়াড়রা আবার সেই পালকাপ্য মুনিকেও বর্ণহিন্দু-সমাজের রাজা বিশ্বাস করে নি। আর্যগ্রন্থে তাঁর স্থান নেই, আর্য গোত্রে তাঁর গোত্রের উল্লেখ নেই— একথা জানিয়ে লোমপাদ তথা দশরথ জামাতা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিল। আবার চুয়াড় সন্তান পালকাপ্য মুনিকে ফল জল দিয়েছে বলে চুয়াড়-সমাজকে বাসস্থান চ্যুত করেছেন সমাজের উচ্চবর্ণের রাজা ও মানুষজন। মানুষের অহঙ্কার মত্ততায় বেদনার্ত পালকাপ্য চোখের জল ফেলেছেন এবং তিনি চুয়াড়দের প্রতি সমানুভূতিতে তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। সেই থেকে চুয়াড়রা বাস করে অরণ্যে, বাস করে হাতির সঙ্গে। তারা দুবার রাজসমীপে আসে একবার যুদ্ধকালে অর্থাৎ রাজার হয়ে যুদ্ধ করতে এবং যুদ্ধ জয়ের পরই তারা অরণ্যে ফিরে যায়। তাছাড়া আসে চুয়াড়-সমাজের বিপন্নতার কালে রাজার কাছে বিচার প্রত্যাশায়। রাজাও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের ন্যায়বিচার করতে যেন অঙ্গীকারবদ্ধ। চুয়াড়-সমাজে প্রচলিত এই মিথ তাদের শ্রুতিপরম্পরাতেই রক্ষিত, যা কোনো শাস্ত্রে ঠাঁই পায় নি। লক্ষ্যণীয় এই মিথে চুয়াড়-সমাজের আর্য তথা বর্ণহিন্দু সমাজের প্রতি অভিমান ও ক্ষোভই ধ্বনিত হয়েছে।

পালকাপ্য মুনি ব্যতীতও চুয়াড়দের আরাধ্য অভয়া দেবী। মঙ্গলকাব্যে দেখি, লোকায়ত-সমাজের দেবী আর্য-সমাজের দেবতার সঙ্গে একত্রে স্থান পেয়েছেন। খৃস্টিয় অষ্টম শতক থেকে মাতৃশক্তি আরাধনা প্রচলিত ছিল। সেই মাতৃশক্তি নানা নামে ভূষিত, তিনি কখনো অভয়া, কখনো বা শূলী বা বিশালাক্ষ্মী, কখনো বা অরণ্যচণ্ডী-পর্ণশবরী-বিন্ধ্যবাসিনী বা বেদোক্ত অরণ্যানী। ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডী বা অভয়ার বন্দনা করা হয়েছে। যে-সমস্ত কবিরা সেই চণ্ডীমঙ্গল গান করতেন তাঁরাই কবিকঙ্কন নামে পরিচিত ছিলেন। মুকুন্দ সেই কবিকঙ্কণের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ষোড়শ শতকের কবি ও কাব্যসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণবশত এ উপন্যাস লিখেছেন সেকথা একাধিকভার স্বীকার করেছেন ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা। কিন্তু চুয়াড়-সমাজে অভয়াকে কেন্দ্র করে মিথ প্রচলিত আছে। তাই দেখি সেই সমাজে প্রচলিত যে দেবী যুবতী বেশে চুয়াড়দের পূর্বপুরুষ একলব্যের কাছে দেখা দেন সেই সময় যখন সে চরম প্রতারণার শিকার, তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। দেবী অরণ্যলতা তথা ওষধি একলব্যের সেই অঙ্গুলিতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে মুহূর্তের মধ্যে তার যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এছাড়াও তিনি তীর ধনুক নিয়ে কীভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত তীর ধরা যায় তা দেখিয়ে দেন। দেবী চাঁদ সূর্য হাতে নিয়ে খেলা করে তথা অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে একলব্যকে তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করেন। তাই চুয়াড়-সমাজে প্রচলিত এই মিথে বিশ্বাস রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে রাজপদে অভিষেক নেয় চুয়াড় সন্তান, তির ছোঁড়ার সময় অভয়ার দেখানো পথকেই অনুসরণ করে।

দেবী বিন্ধ্যবাসিনী বা পর্ণশবরী তথা অভয়া অতি প্রাচীনকালে তাদের পূজায় অরণ্যযুবতীদের সাজে ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করতেন, আনন্দ করতেন। কিন্তু দেবসমাজ দেবীর সেই আচরণের নিন্দা করে কেন-না

দেবীর সঙ্গে তাঁরাই শিবের বিবাহ দিয়েছেন, সুতরাং দেবী এখন তাঁদের সমাজের অন্তর্গত। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক দেবতা ও লোকায়ত দেবতার মিলন যেমন পরিলক্ষিত, তেমনি পৌরাণিক দেবতা ও লোকায়ত দেবীর দ্বন্দ্বে লোকায়ত দেবীর প্রতিষ্ঠার কাহিনীও পরিবেশিত। চুয়াড়-সমাজের প্রচলিত মিথে লোকায়ত দেবী অভয়া যেমন পৌরাণিক দেবসমাজের শরিক, তেমনি ব্রাহ্মণ সন্তান পালকাপ্য মুনিও চুয়াড়দের প্রতি সমানুভূতি প্রদর্শন করেন। কল্‌হন তথা বন্দ্যঘটী গাঞি যখন চরম প্রত্যাখ্যাত এবং তার সত্তা যখন দীর্ণ তখন তারও মনে হয় যে অভয়াবন্দনা না করে তার উচিত ছিল পালকাপ্য বন্দনা করা। তার আরও মনে হয় যে, সে যদি পুনর্বার ফিরে আসতে পারে তাহলে আর অভয়া বন্দনা নয়, বরং পালকাপ্য বন্দনাই সে করবে। আবার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন নারী দেবতা ও পুরুষ দেবতার দ্বন্দ্বও বটে। মঙ্গলকাব্যে নারী দেবী প্রতিষ্ঠিত, এক্ষেত্রেও কবি বন্দ্যঘটী গাঞি রাজসভায় অভয়া বন্দনাই করেছে। সুতরাং এও তো প্রকারান্তরে পালকাপ্যর স্থলে অভয়ার প্রতিষ্ঠার কাহিনীও বটে।

চুয়াড় সমাজে কিছু অতিলৌকিক ও অলঙ্ঘনীয় নিষেধবাণী প্রচলিত যা তাদের কৌম বৈশিষ্ট্যটিকে যেমন চিহ্নিত করে, তেমনি মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলটিকেও স্পষ্ট করে। চুয়াড়-সমাজ ত্যাগ করে কোনো চুয়াড়ের চলে যাওয়া নিষিদ্ধ আর যদি কেউ তা করে, তাহলে হস্তি তাকে নিধন করবে। আবার চুয়াড়দের কাছে হাতিদের জন্ম, রমন ও মৃত্যু দেখা নিষিদ্ধ এবং তা যদি কেউ দেখে ফেলে তবে অবশ্যই সে হাতির কোপানলে পড়বে এবং তার ঘটবে অবধারিত মৃত্যু। বন্দ্যঘটীকে রাজা পরিত্যাগ করেছেন, বন্দ্যঘটী কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, বেরিয়ে এসেছে রাজসভা থেকে গভীর অরণ্যে আর সেই সময় তাঁর মনে হয়েছে যে তিনি হস্তিযূথের মিলন দেখেছেন, সুতরাং তাঁর মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

মঙ্গলকাব্যে যেমন ভোজনের তালিকার কিংবা নারীদের পতিনিন্দা অংশ সংযোজিত হত, তেমনি আলোচ্য উপন্যাসেও এই দুটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তাই দেখি, মাধবকন্যা ফুল্লরার সঙ্গে কবির বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের আয়োজনে নানা ব্যঞ্জনের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার সেই অনুষ্ঠানে নারীরা উপস্থিত হলে তারা তাদের বৌমাদের নিন্দা করেছে অর্থাৎ নারীদেরই নিন্দা করেছে। আধুনিক উপন্যাসে মঙ্গলকাব্যের বিষয়টিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে ঔপন্যাসিক দেখালেন যে, বর্ণহিন্দু সমাজে অন্দরের নারীরাই পুরুষশাসিত সমাজের ধারাটি বজায় রাখে ও পুরুষদের শাসনক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

আবার যে কল্‌হন রাজসভা কবি হওয়ার পর নগরে কেবলমাত্র মাধবের জলপাত্র গুণা আয়িকে সহনাতীত মনে করত সেই কল্‌হন বা বন্দ্যঘটী চরম অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হলে গুণা আয়ির মনেও শ্রেণী প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে, উত্থিত হয়েছে সমাজ-অসাম্য সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা। ব্রাহ্মণ পুরুষরা বা বর্ণহিন্দু পুরুষরা চুয়াড় রমণীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে তাতে তাদের জাতিচ্যুত করা হয় না, মাধবকেও হতে হয় নি। তাদের সমাজে এ নিয়ে কোনো আলোচনাও হয় না। অথচ মাধবের কন্যা ফুল্লরাকে কল্‌হন ভালোবাসা সত্ত্বেও কেবলমাত্র চুয়াড় হওয়ার জন্য লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়, সমাজও ধিক্কার দেয় উভয়কে।

মঙ্গলকাব্যের কবির মতোই কবি বন্দ্যঘটীও পেয়েছেন স্বপ্নাদেশ। তবে সেই স্বপ্নাদেশের বশবর্তী হয়ে দেবীর নির্দেশ পালন করে অভয়ামঙ্গলকাব্য রচনার ফলে কবি মঙ্গলকাব্যের অপরাপর কবির মতো দেবীর আশীর্বাদধন্য হন নি। চুয়াড় সন্তান কবির মনে হয়েছে যে, পালকাপ্য মুনির অভিশাপের তিনি শিকার হয়েছেন। তাই এক দিকে চুয়াড়-সমাজ, অন্য দিকে গর্গবল্লভের সৈনিক দ্বারা কবি আবদ্ধ হয়েছেন নিদয়ার গভীর জঙ্গলে। উভয় সমাজেরই দাবি কবির বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই এবং উভয় দলই তাকে হস্তির পদপৃষ্টে মারতে চায়। সুতরাং, মঙ্গলকাব্য রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবির সঙ্গে এই অন্ত্যজ কবির পার্থক্য থেকেই যায়। আসলে মহাশ্বেতা মধ্যযুগের কবি নন, তিনি এক স্বপ্নভঙ্গের কালের শরিক এবং তিনি আধুনিক আখ্যান উপন্যাস লিখতে প্রয়াসী, সুতরাং তাঁর চরিত্রও সেই বেদনার অংশীদার। এই কারণেই, কবির অভয়ামঙ্গলের নায়িকা সুলভা আর কবির প্রেমিকা ফুল্লরা চরিত্রের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। প্রেম-পরিপূরণের পথে যে বাধা

অতিক্রম করতে পেরেছে কবি কল্পনায় সৃষ্ট নায়িকা সুলভা, বাস্তবে সে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি ফুল্লরার পক্ষে।

মঙ্গলকাব্যের কবিদের প্রথানুসরণ করে কবি বন্দ্যঘটী রাজার বন্দনা করেছেন। কোন্ রাজা? যে রাজা চুয়াড়দের ক্রমাগত অবনমিত করতে চান, যে রাজা উদার মানবিকতাবাদী ধর্মের প্রভাবে আতঙ্কিত হন, যে রাজা কোনোমতে নিজস্থানটুকু সুরক্ষিত করতে চান, সেই রাজার বন্দনাগীতি গেয়েছেন তিনি। আবার মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত ধারাকে অনুসরণ করে নানা গোষ্ঠী-জাতি-বর্ণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন রাজসভাকবি বন্দ্যঘটী। কিন্তু কল্হন গুণা আয়ীকে দেখে সন্ত্রস্ত হন, কল্হন তাঁর কাব্যে চুয়াড়-সমাজ সম্পর্কে আশ্চর্য নীরবতা পালন করেন। আসলে, মহাশ্বেতা এ উপন্যাসে দেখালেন যে, এ কেবল কোনো ব্যক্তির উচ্চাশা ভঙ্গের কাহিনী নয়, এ ইতিহাসের অসঙ্গতির প্রতিবেদনও বটে। তাই এ উপন্যাসে একদিকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করা হয়, অন্য দিকে সমাজের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বও পরিবেশিত হয়। এক দিকে ব্রাহ্মণ্যসমাজ অবনমিত বা দমিত করতে চায় আর্যেতর নিম্নবর্গীয় সমাজকে, অন্য দিকে নিম্নবর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে ভুলে যেতে চান তাঁর উৎসভূমিকে। তাই ঔপন্যাসিক দেখাতে চান একদা যে উৎসভূমিকে ভুলে যেতে চেয়েছেন তারই জাত সন্তান, সেই সন্তানেরই মনে হয় উৎসভূমি মা তথা জঙ্গলের কাছে আজ তিনি পরিত্যক্ত। তিনি নগরীর সুমিষ্ট সুখাদ্য ভুলে ক্ষুদ জাউ, দহিত শোল মাছ ও তপ্ত হরিণের মাংস খেতে চেয়েছেন। এ আসলে শিকড়কে ভোলা পরগাছা অস্তিত্বটিকে নিয়ে বেঁচে থাকার নিষ্ফলত্বটি পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিকে আশ্রয় দেন নি রাজা ও তার নাগরিক সমাজ, কবি কৃপা পান নি তার নৃশংস দেবীর কাছে। অন্য দিকে কবি তাঁর গোষ্ঠী-দেবতার বন্দনা না করে তাঁর রোষানলেও পড়েছেন। চুয়াড়-সমাজ তাঁকে বিভীষণ বলে অভিহিত করেছে। একথা ঠিক বিভীষণের মতো কবি অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে ও যন্ত্রণায় ত্যাগ করেছেন তাঁর সমাজ। মায়ের মৃত্যুর পর ক্রমাগত নিঃসঙ্গতাবোধে পীড়িত হয়েছেন তিনি। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'কাব্যে মেঘনাদ বিভীষণকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি কোন্ ধর্ম পালন করছেন? সেই ধর্ম কোন্ ধর্ম, যে ধর্ম জাতিত্ব-জ্ঞাতিত্ব-ভ্রাতৃত্ব এ সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দেয়? উনিশ-বিশ শতকের উপনিবেশীয় সমাজে স্বজাতিকে ভুলে শাসকদের স্তাবকতা ও পদলেহন করার অন্তঃসারশূন্যতার দিকটিই পুনর্বার দেখান লেখক। এ তাই কেবল বন্দ্যঘটীর কথা নয়, এ আমাদের নিজের কথা, এ আমাদের নিষ্ফলত্বের-হতাশার-যন্ত্রণার কথা। ঔপনিবেশিক শিক্ষা লাভ করে এক ভিন্ন জগৎ নির্মাণ করতে চেয়ে না পারা আবার গ্রামীণ সমাজে তথা দেশীয় সমাজে ফিরে আসতে না পারা, নিজেকে না মেলাতে পারা আমাদের ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করে, একাকী করে। নতুন পুঁথি রচনা করতে চাওয়ার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা আর চেনা পুঁথির অচেনা হওয়ার কারুণ্য দুইই যেন তুল্যমূল্য। সুতরাং, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' কোনো ব্যক্তির কাহিনী নয়, এ আমাদের যন্ত্রণার-দীর্ণতার-দাহের ইতিবৃত্ত।

নয়

মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ'ও 'ব্যাধখণ্ড' অবলম্বনে একালের উপন্যাস-আখ্যান 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৪) গড়ে তুললেন মহাশ্বেতা দেবী। চণ্ডীমঙ্গলে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনায় কবি মুকুন্দ তাঁর নিজস্ব জীবনের উচ্চাবচ উপলবন্ধুরতা অতিক্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামের সাত পুরুষের বাস্তুভিটা তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। একদা সেলিনাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দীর প্রজা মুকুন্দ ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচারে অসহ্য দুঃখকষ্টের পথ অতিক্রম করে আড়রা গ্রামে এসে পৌঁছান এবং ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন। এই বিষয়টি অনুসরণ করেই মহাশ্বেতা মুকুন্দ-জীবনীর প্রথম পর্বটিকে দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের কবির জীবনী অবলম্বনে একালে আখ্যান লিখতে

গিয়ে দুটি মাত্রাকে সংযুক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক— তার প্রথমটি হল ইতিহাস সচেতনতা এবং দ্বিতীয়টি হল নারীর অধিকার সচেতনতা। একই সঙ্গে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে যে অলৌকিকতা বা অতিলৌকিকতা স্বাভাবিক সূত্রে এসেছে সে বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রেখে ঔপন্যাসিক যথাসম্ভব কার্যকারণ পরম্পরার মধ্য দিয়ে সেই অলৌকিক প্রসঙ্গগুলিকে উপস্থাপন করেছেন। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম নিবাসী মুকুন্দদের তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর মামুদ সরিফের দ্বারা সেলিনাবাদে গৃহবন্দী থাকার প্রসঙ্গটি যেমন লেখিকা যুক্ত করেছেন, তেমনি কোনাকুনি রশি ফেলে নন্দীদের জমি মাপা কিংবা পতিত জমিকে সরস উর্বর জমি বলে ঘোষণার মধ্য দিয়ে শাসকসমাজের হীন কৌশলটিকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। আবার মুকুন্দ তাঁর অভয়ামঙ্গল কাব্যে বলেছেন দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশের কথা। মহাশ্বেতার উপন্যাসে মুকুন্দের জীবনে তাঁর মা যেন দেবীর স্তরেই উন্নীত। মায়ের মৃত্যুর পর নিদ্রায় মুকুন্দ যেন সেই মাকে কাছে পেতেন, তিনি যেন তাঁকে চিন্তার অগ্নিতে জ্বলতে নিষেধ করতেন। আবার সেই মায়ের উচ্চারণে যখন নারীর দুঃখের কথা শোনা যায়, কিংবা পরিবেশিত হয় ময়নাবুড়ির কথা, তখন আধুনিক ঔপন্যাসিক যেন দেখাতে চান নারী কোনোভাবে অপর বা চ্যুত (other) নয়, তাকে বর্ণহিন্দু-সমাজ অবনমিত করে রেখেছে মাত্র।

উপন্যাসের অপরাংশ পরিবেশিত হয় মুকুন্দের 'ব্যাধখণ্ড' অবলম্বনে গড়ে তোলা কাহিনী পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের একজন কবির একান্তই প্রান্তিকায়িত জনসমাজ উপজীব্য করার ও সেই সমাজের কোনো ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করার কাহিনী পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা মুকুন্দের অপার সাহস ও যথার্থ আধুনিক মনটিকেই দেখতে পান। আজীবন প্রান্তিকায়িত জনসমাজের জন্য দায়বদ্ধ ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ করেছেন এই কাহিনী পরিবেশনের সময়। একালের সাহসী ও প্রতিবাদী লেখিকা মহাশ্বেতা আদিবাসী গোষ্ঠী তথা আরণ্যক জীবনযাত্রাকে এই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। আবার সেই জীবনযাত্রার মধ্যে যে সারল্য অথচ টানাপোড়েন রয়েছে, মূল জনস্রোতের সঙ্গে তাদের যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তারা কেন যে প্রান্তিকায়িত ও অন্তেবাসী, মূল সমাজের প্রতি বিশেষত ব্রাহ্মণদের প্রতি তাদের কেন যে প্রবল ঘৃণা— সেই বিষয়টিও যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। ইতিহাস সচেতন লেখক মহাশ্বেতা শবর ব্যাধ-সমাজের শ্রুতি পরম্পরায় রক্ষিত কথাবার্তাকে অবলম্বন করে তাদের হারিয়ে যাওয়ার কাহিনীকে যেমন পরিবেশন করেছেন; তেমনি আধুনিক সমাজেও যে অন্যায়-অবিচার আজও প্রচলিত রয়েছে আর এই কারণেই তাদের বয়ে বেড়াতে হয় কলঙ্কের প্রবলতম ভার সেই দিকটিকেও দেখাতে ভোলেন নি। অথচ আপাতভাবে ব্যাধখণ্ড লিখতে গিয়ে মুকুন্দ কেমন করে কতটা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন তাই-ই যেন দেখাতে চান। কিন্তু এই ইতিহাস সচেতন লেখক জানেন, বর্ণহিন্দু-সমাজের তুলনায় ব্যাধসমাজের আধুনিকতার দিকটি। সংকীর্ণতা, জাতিবিচার প্রভৃতি মধ্যযুগের বর্ণহিন্দু-সমাজে পরিলক্ষিত, সেদিনের উচ্চবর্ণের সমাজে নারীর সম্মান ছিল না, তারা পুরুষদের সঙ্গে সদরের জগতে সমান মর্যাদার কাজ করতে পারত না, নারী ও পুরুষের মধ্যেও ছিল না সিভিল বিবাহের প্রচলন। মহাশ্বেতা কাল্যা ও ফুলি চরিত্রকে কেন্দ্র করে ব্যাধ-সমাজের সাম্য, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দিকটিকেই দেখান। তারা নিজেরাই নিজেদের পছন্দমতো বিবাহ করে, নিজেরাই নিজেদের বিচার করতে পারে। অপরাধ করলে নারীর মতোই পুরুষের বিচার হয় এবং তারও দণ্ড হয়। তাই দেখি, ডঙ্ক কাল্যার মা তেজটাকে বিদ্যা দেয়, অথচ তার বাবাকে দেয় না। ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় মহাশ্বেতা জেনেছেন যে, পুরীর জগন্নাথ আদিতে ছিল লোধাদের দেবতা, কিন্তু কোনো এক ব্রাহ্মণ সেই জগন্নাথ শিলা চুরি করে নেয় এবং সেই কারণেই ব্রাহ্মণরা লোধাদের কাছে পূজা পায় না। উপন্যাসে তেজটাকথিত ব্যাধেদের সেই পুরাকালের ইতিবৃত্তকে উপস্থাপন করে ঔপন্যাসিক দেখালেন ব্যাধেদের ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতি অনীহার দিকটিকে। আবার তাদের দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেও নিজস্ব লোকসংস্কার রয়েছে। সেই মিথ বা লোকবিশ্বাস উপন্যাসের চরিত্র কাল্যার শোণিতে যেন প্রবাহিত, তাই সে নগরের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করে, ব্রাহ্মণদের করে ঘৃণা। আখেটিয়া সমাজে প্রচলিত সংস্কারের বশবর্তিতায়, মা তেজটার কাছে বিদ্যা অর্জনের জন্য কাল্যা ঐরাবত বধ করতে

গেলে তার যেমন মৃত্যু হয়, তেমনি একটি গোটা সমাজও নগর থেকে দূরবর্তী হয়ে যায়, সে কাহিনীও থেকে যায় অলিখিত পরম্পরার মধ্যে। সুতরাং এ উপন্যাস কেবল মঙ্গলকাব্যের একজন কবির জীবনকথা পরিবেশনের কাহিনী নয়, মুকুন্দের ব্যাধখণ্ড অনুসরণে রচিত গদ্যায়ত কোনো ভাষ্য রচনাও নয়, এ উপন্যাস যুগপৎ আমাদের ভুল স্বীকারের ইতিহাস এবং প্রান্তিকায়িত সমাজের নিজস্ব মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও বটে।

দশ

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' অবলম্বনে মহাশ্বেতা লিখেছেন 'বেনেবউ' (১৯৯৪) উপন্যাস। 'বেনেবউ' উপন্যাসে মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থা তথা বাতাবরণ বর্ণিত হলেও এবং মঙ্গলকাব্যের ধনপতির দুই স্ত্রী ফুল্লনা ও লহনার বিবাদের ঘটনাবলী অনুসরণে এ উপন্যাস রচিত হলেও আধুনিক যুগের বয়ানে ঔপন্যাসিক নারীর লাঞ্ছনার ইতিবৃত্তটিকেই উপস্থাপন করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে মুকুন্দ দেখিয়েছেন সওদাগর ধনপতি পুত্রসন্তান প্রত্যাশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করে লহনা নামের এক অপাপবিদ্ধা নারীকে। ধনপতি তার সওদাগরি চরিতার্থ করবার জন্য বহির্দেশ যায় আর গৃহের মধ্যে দেখা দেয় তাঁর দুই স্ত্রীর সংঘাত, সপত্নী লহনার প্রতি ফুল্লনার নির্মম অত্যাচার। মঙ্গলকাব্যের এই কাহিনীর ধারাটিকেই অনুসরণ করেছেন মহাশ্বেতা, যদিও আধুনিক উপন্যাসের প্রতিবেদন নির্মাণ করতে গিয়ে নানা রূপান্তরও ঘটিয়েছেন তিনি। 'বেনেবউ' উপন্যাসে কবি মুকুন্দ স্বয়ং চরিত্র। এ উপন্যাসে রয়েছে তাঁর পারিবারিক শান্ত শ্রীমণ্ডিত জীবনের কথা। গৃহে তাঁর শুচিস্মিত ও কল্যাণী স্ত্রী, সন্তান পরিবৃত সুখী সংসার তাঁর। কিন্তু সেই জীবনেও যে দুর্যোগের ঘনছায়া নেমে আসবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে উপন্যাসে। মুকুন্দের পূর্বপুরুষকে বীরদিগর দত্ত দামুন্যায় এনে বাস করিয়েছেন, মুকুন্দের পিতাকে গোপীনাথ নন্দীর পিতা তালুকদার ভূষণচন্দ্র নন্দী দিয়েছেন পাঁচ কুড়া জমি। দত্তরা দামিন্যায় নানা জাতির সহাবস্থান গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই দামিন্যার শান্তশ্রী পরিবেশটি শতচ্ছিন্ন হয়ে যায় শাসকবর্গের অত্যাচারের ফলে। অর্থাৎ 'বেনেবউ' উপন্যাসে মহাশ্বেতা তৎকালীন সামাজিক তথা রাজনৈতিক বাতাবরণটিকে উপস্থাপন করেছেন, আবার অন্য দিকে তিনি তৎকালীন বণিক-সমাজের বৃত্তান্তকেও হাজির করেছেন। তাই দেখি, বার বার বল্লালীচরিতে উল্লেখিত বল্লাল সেনের প্রসঙ্গটি এনে মহাশ্বেতা বণিক-সমাজের ক্রম অবনমিত রূপটির কারণ বিশদ করেছেন। অন্য দিকে, চণ্ডীমণ্ডপীয় আলোচনা, পঞ্চজন কর্তৃক অন্যায়ের বিচার, সংস্কার, ঝাড়ফুঁক, গুণীন, ওষুধ-বিষুদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সে যুগের কিংবদন্তীমণ্ডিত আবছায়া আঁধারের পটটিকে যথাসম্ভব বিশ্বস্ত করে একালের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক।

কিন্তু এ উপন্যাস মধ্যযুগীয় সমাজের বিবরণমাত্র নয়, কিংবা মঙ্গলকাব্যের কথা অনুসরণে রচিত মামুলি কাহিনী পরিবেশন মাত্র নয়। আমাদের সমকালে যে সঙ্কট নিয়ত তাড়িত করে আমাদের, একালে যে প্রশ্ন লেখককে অনবরত বিদ্ধ করে তাকেই যেন মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণে নবভাবে নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের পরিবেশিত কাহিনীতে ফুল্লনা ও লহনার বিবাদের কিংবা লহনার উপর ফুল্লনার অত্যাচারের সমস্ত কিছুই দৈবীকৃপায় সমাধা হয়ে গেছে। সে যুগ এক অর্থে স্বপ্নের যুগ, সে যুগে দেবতার উপর মানুষের বিশ্বাস ছিল, সুতরাং কাব্যকাহিনীতেও পরিবেশিত হত অলৌকিকতা অতিলৌকিকতা মণ্ডিত রহস্যময়তার সাহায্যে মানুষের স্বপ্ন পূরিত হওয়ার প্রসঙ্গ। কিন্তু আধুনিক যুগ জটিলতার যুগ, স্বপ্নভঙ্গের যুগ। আজ আর তাই কোনো দৈবী কৃপায় অতিলৌকিক সমাধা ঘটে না, উপন্যাসেও তাই পরিবেশিত হয় বাস্তবসম্মত পরিণতি। এই কারণেই মহাশ্বেতার কাহিনীতে সংস্কারপীড়িত কনকা অহনার সঙ্গে সুমিষ্ট সম্পর্ককে বিনষ্ট করে, গুণীন তেগুনার পরামর্শে অহনার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করতে চায়, নৃশংস অত্যাচারে ক্রমাগত পীড়িত হয় অহনা। কিন্তু দেবতা নির্বাকই থাকেন। দেবী চণ্ডীর কোনো কৃপা দাক্ষিণ্য লাভ করে না নারী; কোমল-নিষ্পাপ নারী অকালে যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই একবিংশ

শতাব্দীতেও নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত নয়, আজও রাজত্ব করে চলেছে বিগত শতকের কুসংস্কার। মহাশ্বেতা নারীর অপমানিত-লাঞ্ছিত-অবনমিত সত্তাটিকেই এ কাহিনীর পরতে-পরতে অঙ্কন করেছেন। তাই দেখি, অহনাকে বিবাহ করার পর বিপর্যস্ত গণপতি পুরুষ বলে তাকে কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না, অথচ বারে বারে নারী অহনার রূপের পরীক্ষা নেয় সে। বন্ধ্যা নারী বলে এবং স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দেয় নি বলে শুধু পুরুষ সমাজে নয়, নারী সমাজেও কনকা কারো সমর্থন পায় নি। পুষ্পের মতো কোমল কন্যাকে সপত্নীর ঘরে বিবাহ দেবে না বলে কাতর ক্রন্দন করেছে অহনার মা। সে তার স্বামী শচীপতিকে বোঝাতে চেয়েছে নারীমাত্রেই বস্তু নয়। কিন্তু সেই সনির্বন্ধ অনুরোধে কান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি পুরুষ। কেবলমাত্র পুরুষ বলেই শচীপতি কন্যার বিবাহ বিষয়ে তার স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব বিবেচনা করে নি, নিজে যা মনে করেছে তা-ই করেছে। উদার ও শিক্ষিত মুকুন্দকেও তাঁর স্ত্রী কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করেছেন নারীর পুঁথিপড়ায় নিষেধ আছে কি না! মৃত্যুকালে অহনা নির্মমভাবে উপলব্ধি করে যে, নারীজীবনের যন্ত্রণা কত করুণ। বাল্যকাল থেকে সে শুনেছে কেবল পুরুষশাসিত সমাজের 'নেই'। ছুটে সাপ খেলা দেখতে পারে নি, এলোচুলে বেশিক্ষণ থাকতে পায় নি, জোরে হাসতে বা উচ্চস্বরে কথা বলতে পায় নি সে। সুতরাং, মহাশ্বেতার 'বেনেবউ' উপন্যাস মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসরণে রচিত কাহিনীমাত্র নয়, আমাদের 'রাংতার' যুগের আত্মমুখী প্রজন্মকে সজাগ করার ঔষধিও বটে।

এগারো

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) রয়েছে মনসামঙ্গলের উপাদানের নবপ্রয়োগ। এ উপন্যাসে উদয়তারা অনন্তকে মনসামঙ্গলের বেহুলার প্রসঙ্গটি শোনায়। বেহুলা নদী বেয়ে স্বর্গে পৌঁছেছিল, দেবতার সভাতে নৃত্য করেছিল, মহাদেব আর চণ্ডীকে খুশি করেছিল। তাই তাদের নির্দেশে মনসা লখাই পণ্ডিতের জীবনদান করেছিল। উদয়তাবা অনন্তকে জিজ্ঞাসা করে যে সে লখাই পণ্ডিত কি না। প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গলের বেহুলা প্রসঙ্গে রয়েছে পুনরুজ্জীবন তথা প্রত্যাবর্তনের মিথ, রয়েছে যাত্রা-মিথ। কিন্তু আধুনিক কালের বিপর্যস্ত পটভূমিতে মিথের পুনরাবৃত্তি হুবহু একইভাবে ঘটে না। অনন্তের জীবনেও বেহুলার গল্প সত্য হয়েও তাই শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি খাটে না। অনন্তর শহর যাত্রা এক অর্থে স্বপ্ন পূরণের জয়যাত্রা। কিন্তু এ লে বি এ পাশ করে কায়স্থ কন্যার প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে অনন্ত গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। আবার এই প্রত্যাবর্তন পুনরুজ্জীবিত হয়ে নয়, হতাশায় বিপর্যস্ত হয়ে। উপরন্তু চম্পকনগরীর সব ফিরে পাওয়া পরিবেশেও সে আসে না, আসে শুকিয়ে যাওয়া তিতাস তীরবর্তী মালো গ্রামে। তিতাসের জল হারানোর আগেই মালো ঐক্যে বাজাইয়া সংস্কৃতি ঢোকে আর মালোরাও হারায় বুদ্ধি। তাই দেখি, বর্ষার প্লাবন দেখা দিলেও মালোপাড়ায় আর জীবিত বলতে কেউ থাকে না। অর্থাৎ মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বেহুলা সুন্দরীর মতো অনন্ত নৃত্য দিয়ে দেবতার মনোরঞ্জন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, পারে না সর্পবিষে জর্জরিত প্রায় মৃত মালো সমাজকে বেহুলার মতোই জীবিত করে তুলতে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ইউটোপিয়া নির্মাণের স্বপ্ন একালের দীর্ণ কালপটভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। মনে পড়ে যায় লুকাচ তাঁর 'থিয়োরি অফ দি নভেল' গ্রন্থে এই যন্ত্রণাকাতর কালখণ্ডকেই উপন্যাস সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত সময় বলে অভিহিত করেছিলেন।

বারো

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে দেশভাগের উত্তাল পটভূমিকায় নানা চরিত্রের মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের বহমান ধারাটিকেই দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ

নিজেকে চাঁদ সওদাগর বলেই মনে করে। চাঁদ সওদাগরকে ধর্মান্ধতার ও নিজ সত্যে স্থিত থাকার কারণে একের পর এক বিপর্যয় সহ্য করতে হয়েছিল, পিতা হয়েও দেখতে হয়েছিল ছয় পুত্রের মৃত্যুকে, এমন-কি প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের বিয়োগকেও। মহেন্দ্রনাথের বিপন্নতাও চাঁদ সওদাগরের মতোই। মহেন্দ্রনাথ দেখেন যে, যে-মানুষগুলি একদা শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে বাস করছিল, ধর্মের জিগির কেমন করে তাদেরই মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলল। মহেন্দ্রনাথের ধর্মান্ধতার শিকার হতে হয়েছে পুত্র মণীন্দ্রনাথকে, তাঁর পুত্রবধূকে। মণীন্দ্রনাথ কিটসের কবিতাপ্রেমিক, খৃস্টান পলিনকে ভালোবেসে নিজের কাছে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পিতা মহেন্দ্রনাথের কারণেই তা সম্ভব হয় নি। পিতা তার বিয়ে দিয়েছেন এক নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণীর সঙ্গে। কিন্তু পলিনের জন্য মণীন্দ্রনাথের অন্তর ক্রমাগত ক্রন্দন করেছে, পলিনের জন্য তার অন্বেষণ জীবনব্যাপী চলেছে। মহেন্দ্রনাথকে মণীন্দ্রনাথের পরিণতি দেখতে হয়েছে, তার উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়াকে সহ্য করতে হয়েছে, পিতা হয়েও দেখতে হয়েছে পুত্রের তিলে তিলে অপমৃত্যুর যন্ত্রণাকাতরতাকে। আধুনিককালে চাঁদ সওদাগরের অন্তরের হাহাকার কেবল বেড়েই ওঠে, মধ্যযুগের মতো কোনো অলৌকিক উপায়ে যার সমাধা ঘটে না।

তেরো

খৃস্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে আত্মশক্তিতে অবিচল চাঁদ তাঁর উপাস্য শিবের পূজা করতে চান, কিন্তু দেবী মনসা আত্মপ্রতিষ্ঠার অসীম আগ্রহে শৈব চাঁদের উপর একের পর এক আঘাত হানেন। হিতার্থী-দৈবজ্ঞ-ভিষক ধন্বন্তরির প্রাণ কেড়ে নেওয়া, সর্পাঘাতে ছয় পুত্রের জীবন নেওয়ার পরও চন্দ্রধর নিজ প্রতিজ্ঞায় অটুট থাকেন। এরপরও দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত মধুকর-সপ্তডিঙা নিয়ে চাঁদ বাণিজ্যে বের হলে মনসা যুগপৎ ভয় ও লোভ দেখান, কিন্তু তাঁকে প্রাণে মারেন না। তবুও চন্দ্রধর মনসার পূজা দিতে অস্বীকার করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পুত্র লখীন্দরের বিবাহ দিলে তাঁরও মৃত্যু ঘটে। কিন্তু স্বর্গপুরে সতী বেহুলার সাধনায় চন্দ্রধর সমস্ত কিছু ফিরে পেলেন এবং মনসা পূজাতেও স্বীকৃত হলেন। কিন্তু আধুনিককালে অমিয়ভূষণ মজুমদার যখন 'চাঁদবেনে'-র (১৯৯৬) মতো উপন্যাস লেখেন তখন যুগসচেতন লেখক মনসামঙ্গলের কাহিনীকে অস্বীকার করেন, বরং যে জনশ্রুতি থেকে একদা সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য, সেই জনশ্রুতিরই একালের বয়ান নির্মাণ করেন। উপন্যাসের প্রারম্ভেই ঔপন্যাসিক জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদিও অষ্টবসুদের একজন বলেই সমতটের অধিবাসী চন্দ্রশেখর বসুর নামের শেষে বসু যোগ করা হয়, তবুও সে চাঁদবেনেই। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চাঁদের জীবদ্দশায় সংঘটিত কুম্ভকোনমের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, বলেছেন আনুমানিক আটশো ছ' শকাব্দে অর্থাৎ আটশো চুরাশি খৃস্টাব্দে ঘটে যাওয়া এই যুদ্ধে চোল-পাণ্ড্য, পল্লবের দু'পক্ষ ও মহীশূর অঞ্চলের পৃথ্বীপতি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। অর্থাৎ 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে যে সময়কে ধরা হয়েছে তা আনুমানিক খৃস্টিয় নবম শতক। মঙ্গলকাব্য তখনও রচিত হয় নি। সুতরাং, অমিয়ভূষণ সচেতনভাবে মঙ্গলপুরাণ অনুসরণ করেন নি, বরং নির্মাণ করেছেন চাঁদ বণিকের সংগ্রামী পুরাণ, যে পুরাণ চাঁদের বাণিজ্য বিজয়ের বীরগাথা কিংবা তাঁরই পরাজয়ের বিষাদগাথা।

খৃস্টিয় নবম শতকের সওদাগর চাঁদ অভূতপূর্ব পৌরুষশক্তির অধিকারী, তার স্বকীয় চিন্তাভাবনা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংগ্রামে অটুট থাকার মনোভঙ্গি তাকে যেন পুরাণকালের এক বীর চরিত্রের গৌরবে ভূষিত করেছে। বাংলার মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীর মতো চাঁদ তাই বঙ্গের চরিত্র নয়, ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখরের বাসস্থান সমতটের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন সুবর্ণমুখী নদী ও নাগরিপাহাড়ের নিকটবর্তী তথা পুলিকটের কাছাকাছি তার অবস্থান। সিংহল দ্বীপ থেকে একদল সিংহদেশীয় বাঙালি বাণিজ্যলাভের আনুকূল্যের কারণে মূল ভূখণ্ডের পূর্বদক্ষিণ উপকূলে চম্পক বা চম্পা নামে উপনিবেশের নগর তৈরি করে। অষ্টবসুর তথা বণিক

গোষ্ঠীর বাণিজ্যকেন্দ্র চম্পা প্রসিদ্ধতম বন্দর নগরীও বটে। অষ্টবসুদের-বাণিজ্যপথ পূর্ব ও পশ্চিমাভিমুখে সমানভাবেই বিস্তৃত ছিল, তা যেমন পূর্বদিকে কঙ্গোদ-কলিঙ্গ-বঙ্গ-সুবর্ণভূমি-স্বর্ণদ্বীপ-কম্বুজ-চীন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, তেমনি পশ্চিমদিকে সিংহল, কেরল, সৌরাষ্ট্র, ভৃগুকচ্ছ, দেবল, আরব, মিশর অভিমুখে ধাবিত ছিল।

অষ্টবসুদের একজন বণিক চাঁদ অকুতোভয়, তাঁর জীবন অভিধানে মৃত্যু বলে কোনো শব্দ নেই। চাঁদের মনে হয় মানুষ যখন জীবিত তখনই বলা হয় যে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে আর জীবিতাবস্থায় কখনো মৃত্যু স্পর্শ করে না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তও তাই মৃত্যু নয়, জীবনই। মৃত্যুকে বর্তমান দিয়ে, ভয়কে উদ্বেগহীনতা দিয়ে সে জয় করতে চেয়েছে। ভবিষ্যতের মিথ্যা আশঙ্কার কূপে সে নিজেকে নিমজ্জিত করে নি। দুঃখকে বা কুচিন্তাকে সে অনুসরণ করে নি। চাঁদ মনে করে তাঁর সঞ্চয় আছে, সুতরাং ব্যয় করতে তাঁর কোনো দ্বিধা বা ভয় নেই। সে জানে জীবনে ক্লেশ বা যন্ত্রণা আছে, রক্তস্রোতে বা সমুদ্রস্রোতে আছে বিপন্নতার বীজাণু। কিন্তু তাতে সে ভয় পায় না, কেন-না সে আরও জানে যে তাঁর পৃথিবী সর্বদা তাঁরই সঙ্গে বিচরণ করছে, সুতরাং তা তলিয়ে গেলে আশঙ্কার কিছু নেই। এই নির্ভীক জীবনবোধের অধিকারী চাঁদ তাই বারংবার অতিক্রম করতে পারে ভাগ্যবিপর্যয়কে। অষ্টবসুদের বয়ঃকনিষ্ঠ চাঁদ যেমন দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী ছিল, তেমনি দুর্দৈবেরও শিকার হয়েছে বারে বারে। একদা পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত বিত্তের, সুদর্শন স্বাস্থ্যের ও সুন্দরী স্ত্রীর অধিকারী ছিল সে। পারিবারিক বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়াতে যদিও নতুন চারখানি বাণিজ্যতরী নির্মাণ শুরু করেছিলেন চাঁদের বণিক পিতা, তথাপি সেই শোকেই তিনি প্রাণ হারান। শ্রাদ্ধাদি শেষে পারিবারিক তিনটি বাণিজ্যতরী ফিরে পায় চাঁদ। সুতরাং সে সাত-সাতখানি বাণিজ্যতরীর অধিকারী হয়। আবার জীবনের প্রারম্ভেই এই সাত বাণিজ্যতরীর উপর নেমে আসে যন্ত্রণাক্ষিপ্ত রাক্ষসীর ভয়াল আক্রমণ অর্থাৎ নেমে আসে ঝড়ের তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবে চাঁদ সমস্ত কিছু হারায়, এমন-কি হারায় রূপসী স্ত্রী সনকাকেও। তাতেও চাঁদ পিছু হটে নি, চারবছর পর কেবলমাত্র একটি জাহাজকে সম্বল করে বরুণ ও মাতরিশ্বার আক্রমণকে তোয়াক্কা না করে সমতটে ফিরে আসে সে। কিন্তু চাঁদ মনেপ্রাণে বণিক, বাণিজ্যস্বভাব তাঁর মজ্জাগত, তাই সে সপ্ত বাণিজ্যতরী নির্মাণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরপরও চাঁদ বাণিজ্যযাত্রায় পুত্র সাগরদত্তকে প্রেরণ করলে ধ্বংস হয় সে। চাঁদ তাতেও ক্ষান্ত হয় নি, এবার পাঠিয়েছে বিজয়কে। এমন-কি শেষ পর্যন্ত পুত্র লখাইও ওঠে বাণিজ্যতরীতে। আবার চাঁদ কখনো অর্ধোন্মাদ হয়, জীর্ণ পরিধানে ভাঙাচোরা বাণিজ্য জাহাজ মধুলিটে চড়ে বাণিজ্য করে, কখনো-বা বাণিজ্যপথে উল্কাপাতে অর্ধদগ্ধ হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও পিছু হটে না, বরং অট্টহাস্য করতে পারে। সুতরাং চাঁদ গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতোই সংগ্রাম করেছে প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে, যে প্রতিকূলশক্তি তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে আশ্চর্য দুর্দৈব রূপে। নিয়তির ক্রূর ছলনার বিরুদ্ধে বার বার চাঁদ তাঁর অপরাজেয় মনোভঙ্গি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

চাঁদের দুর্দৈবের আনুকূল্য কি সনকা করে নি? চাঁদের সংগ্রাম কি সনকার সঙ্গেও নয়? বাণিজ্যযাত্রায় আশ্বিনের এক ব্যাপক তাণ্ডবে কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচে চাঁদ, কিন্তু হারায় সনকাকে। তিমিঙ্গিল সাপের ছোবল মারার সঙ্গে সেই ঝড়কে তুলনা করেছেন ঔপন্যাসিক। ভাগ্যকে জয় করতে অভিলাষী ও সময়ে-সময়ে পারঙ্গম চাঁদ তাঁর চার বছর পর কোন্নগরে এক ভৈরবীর মধ্যে সনকাকে আবিষ্কার করে। পূর্বের সনকার সঙ্গে এই ভৈরবীর কেবল দুটি পরিবর্তন লক্ষ করে চাঁদ, যার প্রথমটি হল চিবুকের বামপার্শ্বে একটি জড়ুল চিহ্নের অবস্থান এবং দ্বিতীয়টি হল পুত্র সাগরদত্তের উপস্থিতি। সনকা যেমন ভৈরবীপুত্রকে চাঁদের পুত্র বলে মানুষ করতে চেয়েছে, তেমনি ভৈরবীও পুত্র সাগরদত্তের পিতাকে 'সমুদ্রশায়ী চাঁদ' বলেছে। বংক দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রাকালে কী যেন জলে পড়ে গেল এই আর্তধ্বনির মধ্যে এবং ভৈরবীর শাড়ির ওড়না বাতাসে ভেসে যাওয়ার মধ্যে চাঁদ ভৈরবীর কক্ষে সনকাকেই দেখে। অর্থাৎ ভৈরবী হয়ে যায় সনকা। অমিয়ভূষণ চাঁদ চরিত্রের মধ্যে সনকা ও ভৈরবীজনিত এক সুস্পষ্ট বিভ্রম তৈরি করেছেন। তাই দেখি, লীলা লতিকার গৃহে ভৈরবীর চিত্র দেখার পর সে যে সনকা তা চাঁদ বুঝতে না পারলেও একই চিত্র দেখে পুত্র বিজয় তার মাকে চিনতে

পারে। আবার চাঁদ নিশার গভীরতায় গোপন পরিদর্শনের সময় সনকার মধ্যে ভৈরবীকেও দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়। সমতটের বণিক চাঁদ যখন উল্কাঘাতে আহত ও দগ্ধ, সে যখন রিক্ত ও নিঃস্ব তখন দেখে সনকা চারুদত্তের সামনে বিনত ও বিনম্র। এই সময় সে সনকার মধ্যে সেই মূর্তিই দেখে যে মূর্তি দেখলে বরাবর তার বুক কেঁপে ওঠে। এই মূর্তি সনকার ভৈরবী মূর্তি, এই মূর্তি সনকার কৃশ মূর্তি, অতুলনীয় কেশরাশি-বিলুপ্ত গেরুয়াবেশের এক কঠোর মূর্তি, তবে কি এই নারীর মধ্যেও রয়েছে দ্বৈত সত্তা— দুই পুরুষের কাছে তার দুই মূর্তি? চাঁদের কাছে সে একান্তই প্রিয়তমা নারী সনকা আর শ্রমণ চারুদত্তের কাছে সে তন্ত্রসাধিকা ভৈরবী। মুহূর্তের মধ্যে চাঁদের মনে হয় তবে কি চাঁদ-শূরসেনের চেয়ে উৎকৃষ্ট নায়ক শ্রমণ চারুদত্ত, কিংবা চারুদত্তের কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করে ভৈরবীবেশী সনকা পেয়েছে শান্তি! হারিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ফিরে পেয়ে চাঁদ সনকার মধ্যে ভৈরবীর ছায়াই দেখেছে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ের মধ্যে যে অন্ধকার সমাধিগুহা কিংবা চিতাগ্নি রয়েছে তাকেই দেখেছে। অন্তিমে সর্বস্বান্ত চাঁদ সনকার মনে সাহস সঞ্চারিত করতে গিয়ে ক্রন্দনে ভেসে গেছে। ত্রয়োদশ শতকের বাংলা মনসামঙ্গলের পরিবেশিত কাহিনীতে চাঁদ সনকার গোপনে করা মনসা পূজাকে মেনে নেয় নি, সনকার পাতা মনসার মঙ্গলঘটকে ফেলে দিয়েছে এবং চাঁদ সমানে তাঁর দম্ভ ও অপরাজেয়তা বজায় রেখেছে। অন্তত সনকার কোনো কথা সে শোনে নি। অর্থাৎ সেখানে যেন সনকা চাঁদের স্ত্রী বলেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমস্ত কিছুকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অন্য দিকে, একালের উপন্যাসে অঙ্কিত খৃস্টিয় নবম শতকের চরিত্র অপরাজেয় চাঁদ বেনে সনকার দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তার কাছে বারে বারে পরাজিত হয়েছে। দুর্দৈবে-দুর্বিপাকে পড়া অপরিসীম মানসশক্তির অধিকারী অপরাজেয় মনোভঙ্গির ধারক চাঁদের কাছে সামুদ্রিক প্রতিকূলতার মতোই সনকাও যেন গ্রিক ট্রাজেডির সেই দুর্জ্ঞেয় নিয়তি।

যেহেতু চাঁদ নবম শতকের যুগপৎ বীর ও ট্রাজিক চরিত্র, জনশ্রুতিতে চাঁদ তাঁর জীবৎকালেই পায় পুরাণ চরিত্রের মহিমা আর সেই চরিত্রই ঔপন্যাসিকের উপজীব্য তাই এ কালের ঔপন্যাসিক ত্রয়োদশ শতক থেকে রচিত হতে শুরু হওয়া মনসামঙ্গল কাব্যের মতো এ উপন্যাসে মনসা-বেহুলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনেন নি। কেন-না কে না জানে মঙ্গলকাব্যগুলির আখ্যানের বিভিন্ন ঘটনাগুলি এক লহমায় উদ্ভূত হয় নি, যুগে যুগে তৈরি হওয়া লোকশ্রুতিতে বহমান ঘটনাগুলির সংকলিত ও সংমিশ্রিত রূপই সেখানে লক্ষ করা যায়। কিন্তু চাঁদবেনে উপন্যাসে আছে সর্প ও সর্পপূজার নানা প্রসঙ্গ। আসলে লোকসমাজে সর্পপূজার ঐতিহ্য সেই আদিমকাল থেকেই দেখা যায়। ঋগবেদে বৃত্রাসুরকে সর্প বলা হয়েছে, যজুর্বেদে সর্প বলতে সাপকেই বোঝানো হয়েছে আর অথর্ববেদে সাপপূজার কথা বলা হয়েছে। রুদ্রের ক্রোধ 'মনা', বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বসুন্ধরা, পুষ্টিদাত্রী ইলা-সরস্বতী-শ্রী, পরবৈদিক নাগলাঞ্ছন দেবী বা বিষনাশিনী ময়ূরী বিদ্যাধরী ও লৌকিক বাস্তুদেবতা ইত্যাদি থেকেই যেমন মনসাদেবীর উদ্ভব ঘটে, তেমনি তার নানা স্থানে ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং পরে সৃষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যে এই নাগদেবীর বন্দনাই করা হয়েছে আর পূর্বের সময়ের কাহিনীধারাকে উপজীব্য করেছেন বলেই সচেতন ঔপন্যাসিক এ প্রসঙ্গ আনেন নি। কিন্তু ঔপন্যাসিক নানা প্রসঙ্গে, চরিত্রদের কথাবার্তায়, তাদের চেতনে-অবচেতনে-স্বপ্নে-জাগরণে সর্প ও সর্পপূজার বিষয়টির উল্লেখ করেছেন এ উপন্যাসে। তাই দেখি, জালিক গোষ্ঠীরা সর্প পূজা করে আর তা দেখে সনকা বলেছিল চিরকালের জন্য পরাজিত ও বঞ্চিত কৃষ্ণকায় মানুষের বিনষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সর্প। ভামহসৃষ্ট শিবমন্দিরে শিবের গলায় চাঁদ ও সনকা সাপকে দেখে। এই সাপ দেখে দু'জনের মনে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সনকা জানায় শিবের গলায় সাপ দেখে পার্বতী হাসছে, পক্ষান্তরে চাঁদের সেই সাপ দেখে অপছন্দই হয়, তার মনে হয় পার্বতী ভয় পেয়েছে। চাঁদের কাছে সাপ ঘৃণা ও ভয়ের ব্যাপার। পক্ষধরকেও সে সেকথা জানায়। বিজয় স্মৃতিচারণ করেছে পিসী বসুশ্রীর কথা, যেখানে বসুশ্রী সর্পপূজা বিষয়ে জানিয়েছিল যে দেশজ দেবদেবীকে তুষ্ট করা দোষের নয়। চাঁদের স্বপ্নে এসেছে সাপ ও সাপ শত্রু পাখীর প্রসঙ্গ। চারুদত্ত চাঁদকে মহাকাশ সর্পিণীর উল্লেখ করে জানিয়েছিল যে সেই সর্প অন্ধ অথচ তাবত কর্মের শক্তি। চাঁদের স্বপ্নে যেমন পাখীরা চাঁদকে

ভয় পায় তেমনি আবার কপিস কালো ভুজঙ্গের বিপরীতে ময়ূরের স্বর্ণপ্রভ তীক্ষ্ণ চঞ্চুর প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়। এছাড়া মানবচরিত্র বর্ণনায়, তাণ্ডব মুখর সমুদ্রের বর্ণনায় সাপের প্রসঙ্গ বারে বারে নিয়ে আসেন অমিয়ভূষণ। যে জনশ্রুতিকে নির্ভর করে বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাদেবীর সৃষ্টি হয়েছে সেই জনশ্রুতিকে যথাযথ নৈপুণ্যে পরিবেশন করেছেন ঔপন্যাসিক।

অমিয়ভূষণ তাঁর চাঁদবেনে উপন্যাসে একজন বণিকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে অঙ্কন করেছেন। বাঙালি যখন বাণিজ্যক্ষেত্রে পিছিয়ে গেছে সেই সময় একজন বণিক চেয়েছে ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করতে, সর্বদা তার দৃষ্টি থেকে গেছে দূরতম বন্দরের দিকেই নিবদ্ধ। আরবীয়দের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে ক্রেতার বাজার সে চেয়েছে দখল করতে। অতীতের সুবর্ণযুগের এক বীর চরিত্রের বিজয়চিত্র অঙ্কনের মধ্যে লেখকের স্বাজাত্যবোধ ও স্বাভিমানই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে কেবল চাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বাণিজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকেই দেখানো হয় নি, এক উচ্চ সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার ধারাকেও রেখায়িত করা হয়েছে। চাঁদ ও তার সতীর্থদের আলোচনায় সাহিত্য-শাস্ত্র-ধর্ম ও দর্শনের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। চাঁদ, শূরসেন, দময়ন্তী, লীলালতিকা প্রমুখের আলোচনায় এসেছে রামায়ণের রামচন্দ্র-সীতার প্রসঙ্গ; মহাভারতের ব্যাস, সত্যবতী, ভীষ্ম, কুন্তী, দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ কিংবা বামদেবের সীতাবিসর্জন নাটকের কথা বা কাদম্বরীর প্রসঙ্গ। চাঁদকেও তার দেশের মানুষেরা রাবণ বা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছে। ধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গটি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। জিন, বুদ্ধ, বেদান্ত মতের পার্থক্য, ঈশার ধর্মের মূলতত্ত্ব, সাংখ্যমতে ধর্মের প্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন মতামত প্রকাশ করেছে নানা চরিত্র, তেমনি জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বরের অবস্থান, কিংবা দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী মায়াবাদ ও শূন্যবাদ, প্রকৃতি ও পুরুষ প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলিও অপরূপভাবে আলোড়িত হয়েছে। উপরন্তু সলোমন ও বিন উসমানের কথাবার্তায় ইসলাম ও ইহুদী ধর্মশাস্ত্র বিষয়টিও উঠে এসেছে। জনশ্রুতি, দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ, মিথ, জ্যোতিষ প্রকৃতির অনবদ্য সমন্বয়ে অতীত প্রজন্মের উচ্চ সাংস্কৃতিক পটভূমিটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এ উপন্যাসে। 'চাঁদবেনে'-তে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী চরিত্রের দৃঢ়তা, অপরাজেয়তা ও বীরত্বের কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। আবার প্রতিকূলতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এ কাহিনীও হয়ে উঠেছে আন্‌মেরিটেড মিসফরচুন্ (Unmerrited misfortune)-এর কাহিনী, গ্রিক ট্রাজেডির কাহিনী। সুতরাং, একাধারে চাঁদবেনে উপন্যাসের কাহিনীর যেখানে শেষ মনসামঙ্গল কাব্যের সেখানে শুরু; অন্যাধারে আধুনিক যুগের একজন বর্তমান ও অতীত যুগসচেতন ঔপন্যাসিকের অভিনব ধ্রুপদী মঙ্গল পুরাণ এ উপন্যাস যা যুগপৎ বিজয় কাব্য ও শোকগাথার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

চোদ্দো

'মনসামঙ্গল কাব্যে সওদাগর চন্দ্রধর অপরিসীম পৌরুষের প্রতিমূর্তি। মনসার পূজাপ্রচারে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল দুর্যোগের অমানিশা, তবুও সে পর্যুদস্ত হয় নি, বিহ্বল হয় নি কখনো। শৈব চাঁদ সওদাগর কন্যাসম বেহুলার স্নেহের কাছে পরাজিত হয়ে মনসার পূজা করেছিল, ভক্তিভরে মনসাকে নৈবেদ্য অর্পণ করে নি। মধ্যযুগের দেববাদনির্ভর পরিমণ্ডলে মানবচরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তার দৃঢ় মানসিকতাকে সাহিত্যিকরা চিহ্নিত করেছেন, আবার দেবতার বন্দনাও করেছেন তাঁরা। কিন্তু সে যুগ এক অর্থে স্বপ্নের যুগ, মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারত দেবতায়, তাঁর অলৌকিক কর্মকে কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার কথা ভাবতও না। আধুনিককাল স্বপ্নভঙ্গের যুগ, বিশ্বাসহীনতার কাল। এ যুগে কোনো আদর্শ নেই, অবলম্বন নেই; মানুষ বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো বেশি অসহায়। এ যুগের চাঁদ তাই ধনপতি নয়, অথচ ধনপতি হওয়ার স্বপ্ন সে জানে; এ যুগের চাঁদ তাই কৃষিজমিচ্যুত শ্রমিক, অথচ পরাজিত হতে সে চায় না। ১৯৮৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের আশা-হতাশা,

নিরুপায়তা অথচ পরাজিত না হওয়ার মানসিকতা যেমন পরিবেশিত, তেমনি শাসক-শাসিতের, প্রভুত্ব ও অধীনতার দ্বন্দ্বনির্ভর সম্পর্কটিও রূপায়িত। এই উপন্যাসে এক দিকে রয়েছে এক উষর-খরা তাড়িত পরিমণ্ডলে শাসিত কৃষকের জীবনযন্ত্রণার চিত্র, অন্য দিকে রয়েছে সর্বৈব অসহায়তা ও প্রতিকূলতা থেকে এক অত্যাচারিত শ্রমিক-কৃষকের উত্তরণের প্রচেষ্টা। সেই মুক্তির স্বপ্ন দেখে বলেই একালের অর্ধভুক্ত ও প্রায়-অভুক্ত অত্যাচারপীড়িত চাঁদের বার বার মনে পড়ে যায় স্বপ্নের যুগের, মধ্যযুগের অপরাজেয় নায়ক চাঁদবেনের প্রসঙ্গ।

সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের চাঁদ দেহে ও মনে, অন্তরে ও বাইরে একজন কৃষক, কৃষিজমির সঙ্গে তার যোগ রক্তের যোগ, আত্মার যোগ। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে চাঁদ সবুজ ফসল ফলাতে চায়, নিষ্ঠা-একাগ্রতা ও কায়াসাধনাকে সম্বল করে সে তার মতো গরীব কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে চায়। কিন্তু যে মাটির প্রতি টান সীমাহীন, যে মাটিতে কৃষিকাজ করে তার মনের জ্বালা জুড়িয়ে যায়, প্রচণ্ড দাবদাহে সেই মাটিকেই সে দেখে চড়চড় শব্দে ফেটে যেতে। চাঁদ পদ্মাকে দুকূল প্লাবনে ভরে যেতে দেখে না, বরং পদ্মার ধু-ধু বালি মাঠকে ঢেকে দেয়, ঢেকে দেয় তাঁর চোখ মুখ। মেঘহীন-জলহীন সময়ের নৃশংস নিষ্পেশনের বিরুদ্ধে চাঁদ রুখে দাঁড়াতে চায়, পদ্মার মরে-হেজে যাওয়া রূপ দেখে গালিগালাজ করে সে। খরায় আক্রান্ত চম্পাইগঞ্জে চাঁদ সবুজ ফসল ফলাতে চায়, চায় তাঁর ভুবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রতিকূলতায় চাঁদ তাঁর স্বপ্নকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে।

কিন্তু চাঁদের শত্রু কেবল প্রকৃতি নয়, মানুষও। জোতদার তথা মহাজন আজু মৃধা চাঁদের পিতার মৃত্যুর পূর্বে চাঁদের স্বপ্নের কৃষিজমিটুকু কেড়ে নিয়েছিল, আজও কেড়ে নেয় চাঁদের কষ্টের ফসলটুকু। খরায় আক্রান্ত চম্পাইগঞ্জের মানুষরা আজু মৃধার জমিতে ফসল ফলায়, অথচ দিনের শেষেও তারা ক্ষুধার অন্নটুকু যোগাড় করতে পারে না। চাঁদ দেখে জামিরের মতো যুবক মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে, মানুষের ভিড়ে রোদে গরমে ঠেলাঠেলি করে সপ্তাহে মাত্র তিন সের আটা পাওয়ার জন্য লাইন দিতে গিয়ে প্রাণ হারায়। হাফিজ মিয়া তার পরিবারের লোকজনদের খাবার সংস্থান না করতে পেরে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যন্ত্রণা অনুভব করে রোগগ্রস্ত স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য। কাশেম, হাসু, কালু আজু মৃধার জমিতে বুকের দরদ দিয়েই ফসল ফলায়, কিন্তু তাদের সম্বল বলতে কিছু নেই, আছে কেবল না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা ও সেই ক্ষুধার্ত শরীরের ঘোলাটে দৃষ্টি। কিন্তু চম্পাইগঞ্জের অসংখ্য ক্ষুধার্ত ও নিপীড়িত মানুষের রক্ত নিংড়ে নেওয়া শ্রমকে ক্রয় করে আজু মৃধা স্ফীত হয়; বিল বাড়ায়, জমি বাড়ায়, বাগান বাড়ায়, সম্পত্তি বাড়ায়। তার ঘরে প্রাচুর্যের স্ফীতি, গোলা ভঁরা ধান চাল। সুতরাং আজু মৃধার ক্ষেতমজুর চাঁদ তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়।

চাঁদের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে যায় তার অন্দরের জগতেও। চাঁদ সন্তান চায়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী উন্মাদ ছমিরণ একের পর এক সন্তান প্রসব করে, অথচ, চাঁদের উত্তরাধিকারী গড়ে তুলতে পারে না। চাঁদ বাইরের জগতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে স্ত্রীর ভালোবাসা চায়। কিন্তু স্ত্রী ছমিরণের উন্মাদনায় চাঁদ ছায়া পায় না, পদ্মার ধু-ধু বালিকেই দেখে। সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর চাঁদ যখন গৃহে এসে রাঁধা ভাতটুকুর প্রত্যাশা করে, তখন দেখে স্ত্রী ছমিরণ অসংলগ্ন আচরণ করছে। সুতরাং তাকে রান্না করে খেতে হয় অথবা না রান্না করলে অভুক্ত অবস্থাতেই দিন কাটাতে হয়।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে সওদাগর চন্দ্রধর যেমন সংগ্রামী, মনসার তাবত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের জেহাদ জায়মান রাখে, তেমনি উপন্যাসের চাঁদবেনেও তাঁর অপরাজেয় মনোভঙ্গিটিকে বিসর্জন দিতে চায় না। বণিক চন্দ্রধর যেমন দুহাতে হেন্তালের লাঠি দিয়ে শত্রুর কার্যকলাপকে রুখতে চেয়েছিল, তেমনি চাঁদ বেনেও প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। ছেলেবেলায় সে মনসার গান শুনেছে, এখনো সেই গান শুনতে ভালোবাসে। তাঁর পিতা পদ্মার বুকে মহাজনের নৌকা ভাসিয়ে দিতেন, বড়ো স্বপ্ন ছিল তাঁর একখানি নৌকা বানাবার। কিন্তু জীবনভর কেবল দীর্ঘশ্বাসই ফেলেছেন, স্বপ্ন তার সফল হয় নি। পুত্রকে লখীন্দররূপে

অভিহিত করে সপ্তডিঙা মধুকর বানাবার স্বপ্ন দেখাতেন। চাঁদ দেখেছে সর্বব্যাপী অসহায়তা সত্ত্বেও পিতা হো-হো করে হেসেছেন, পদ্মাকে দেখিয়েছেন বৃদ্ধাঙ্গুলি। কিন্তু আজকের চাঁদ জানে যে তার পিতা মহাজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়নি, মহাজন আজু মৃধার সঙ্গে চাঁদের পিতার সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের। কেন-না চাঁদের পিতার সম্মুখে ছিল অঢেল সবুজের বিস্তার, বুকে ছিল অফুরন্ত দরদ। তাই তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি মহাজন আজু মৃধার বঞ্চনার কৌশলকে বা শোষণের ফাঁদকে। কিন্তু চাঁদ প্রবঞ্চনাকে বোঝে আর বোঝে বলেই সে মধ্যযুগের চন্দ্রধরের মতোই বিদ্রোহী।

কিন্তু মধ্যযুগের চন্দ্রধরের সম্মুখে ছিল স্বপ্ন, ধনপতি সওদাগর হওয়ার চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা। আধুনিককাল স্বপ্নভঙ্গের কাল, একালের কুশীলবদের তাই বুকে থাকে হাহাকার, থাকে না কোনো স্বপ্ন। ভয়াবহ, ধূসর, ম্লান ও ধু-ধু মরুসদৃশ জীবনের অংশীদার চাঁদ চতুর্দিকে কেবল ব্যর্থতাকেই দেখে। চন্দ্রধরের মতো স্বপ্ন তার নেই, কিন্তু হতাশা তাঁর বহুগুণ। চম্পকনগরের চন্দ্রধরের সপ্তডিঙা ডুবে গেছে, মারা গেছে সাতপুত্র আর চম্পাইগঞ্জের চাঁদের স্ত্রী ছমিরণ প্রসব করে সাতটি মৃত সন্তান। চন্দ্রধরের স্ত্রী সনকা পতিপরায়ণা, মনসা পূজাতে চাঁদ বাধা দিলে সে আর তা করতে চায় না। চাঁদের স্ত্রী ছমিরণ বদ্ধ উন্মাদ, চাঁদ ছমিরণকে তার যৌবনের দিনে পৌঁছে দিতে পারে না। চাঁদ চম্পাইগঞ্জের সর্বত্র কেবল মনসার সর্পের দংশনকেই প্রত্যক্ষ করে, কেবলই তাকে বিষজর্জর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সে তাঁর পিতার আশ্চর্য ক্ষমতাকে দেখেছে, দেখেছে তাঁর অপরাজেয় মনোভঙ্গিটিকে; আবার সেই পিতাই সাপকে ভয় করেছেন, উপরন্তু চাঁদ প্রত্যক্ষ করেছে মায়ের শূন্যতার স্বপ্নকে। চাঁদ তাঁর সামনে কোনো অবলম্বন পায় না, যাকে আঁকড়ে ধরে সে বেঁচে থাকতে পারে। যে মনসার আর-এক নাম পদ্মা, সেই পদ্মাই আজ তাঁর শত্রু; খরা তাঁর প্রতিপক্ষ। যে স্ত্রী ছমিরণ যৌবনে ছিল কালীদহের মতোই উদ্দাম, সে আজ পদ্মার মতোই ধু-ধু বালিতে ভরা। ছমিরণের হাসির মধ্যে সে মনসাকেই দেখে। পেটের ক্ষুধা তাঁর কাছে কালনাগিনীর মতোই বেড়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে এ উপন্যাসে মনসা, সাপ, বিষ প্রসঙ্গ বারে বারে উচ্চারণ করে সেলিনা চাঁদের প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট করেন। চম্পাইগঞ্জের শরীরের ছিদ্র দিয়ে অভাবের সাপ ঢুকতে দেখে চাঁদ, সে আরও দেখে যে সেই সাপ আর বেরোতেই পারে না। আবার আজু মৃধাকে তাঁর চ্যাঙ মুড়ি কানি বলেই মনে হয়, যে কেবল ছোবলই মারে। অতীত বলতে চাঁদ বোঝে রাত জেগে মনসার পালা শোনা, তার আজও মনে পড়ে শৈশবের বর্ষাকালে শোনা আকন্দ-ঝোপের মাঝে সাপের শব্দ। কিন্তু চাঁদ উপলব্ধি করে আগের মতো প্যান্ডেল খাটিয়ে হ্যাজাক জ্বালিয়ে হাজার হাজার লোককে শুনিয়ে মনসার গান হয় না। মানুষের মনে আনন্দ নেই, মানুষের বুকে নেই তাই উৎসবের জোয়ার। শৈশবের ফণিমনসার গাছও আজ হারিয়ে গেছে। তবুও সে চাঁদ বণিকের ময়ূরপঙ্খির স্বপ্ন দেখে বুক বাঁধে। সে সন্তান চায়, সে চায় লখীন্দর, যে লখীন্দর মনসার সর্বব্যাপী বিষপ্রভাব থেকে মুক্ত হবে, সকলকে মুক্ত করবে। তাকে হাফেজ বলে পেটের বিষ-ক্ষুধার কথা, সাকিনা জানায় যে তার মায়ের পেটের বিষ বেড়েছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক তাঁর আখ্যানে মধ্যযুগের চাঁদের নবরূপায়ণ ঘটান। এ যুগে মনসা নয়, প্রকৃতি চাঁদকে বিরূপ করে, মানুষই তাঁর রক্ত শুষে নেয়।

কিন্তু এক স্বপ্নহীনতার যুগের অংশীদার হয়েও ধু-ধু মরুসদৃশ কালের শরিক হয়েও চাঁদ তাঁর লড়াইকে বজায় রাখে, সর্বব্যাপী অসহায়তার শিকার হয়েও সে তাই তাঁর পিতার মতো উচ্চস্বরে হাসতে পারে। তাই জামির, হাফেজ প্রভৃতি সাতজন জনমজুরকে নিয়ে সে আজু মৃধার গোলা লুণ্ঠন করে, আজু মৃধার স্তাবকদের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, আজু মৃধার রক্তচক্ষুকে সে তোয়াক্কা করে না। চম্পাইনগরের সাতটি পরিবারের মানুষজনকে কয়েকদিনের জন্য পেট ভরে ভাত দিতে পারে। বাস্তুভিটেটুকু বন্ধক দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে শহরে ছমিরণের চিকিৎসা করতে যায় লখীন্দরের প্রত্যাশায়। চম্পাইগঞ্জের মানুষজনের অভুক্তাবস্থা অসহনীয় হলে এবং আজু মৃধার শোষণ কৌশল মাত্রা ছাড়ালে সে তাকে খুনও করতে পারে। সাকিনার গর্ভে স্বপ্ন বপন করে চাঁদ, লখীন্দরের জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে সে ধনপতি চাঁদ বণিক হওয়ার স্বপ্নও দেখে।

মধ্যযুগের বণিক চন্দ্রধর হতে চাওয়া একালের চাঁদ শাসিত অত্যাচারিত-শোষিত সমাজের প্রতীক হয়ে শোষককে নির্মূল করতে সক্ষম হয়। সুতরাং এ উপন্যাস শোষিত কৃষকের জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসও বটে।

কৃষকজীবনকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্যে যেমন তুর্গেনিভ, তলস্তয়, বালজাক উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি বাংলায় লিখেছেন মীর মোশারফ হোসেন থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর, রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, গুণময় মান্নার মতো ঔপন্যাসিক। তুর্গেনিভের 'পিতা ও পুত্র' উপন্যাসে পিতা-পুত্রের সংঘাত-সম্পর্কই বড়ো হয়, কৃষক জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি তেমন পরিস্ফুট হয় না। আবার বালজাকের 'চাষীরা' উপন্যাসে কৃষি জমির প্রাণবন্ত উপস্থাপনা পাই, যেমনটা পাওয়া যায় তলস্তয়ের উপন্যাসেও। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বীরভূমের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, আবার তিনি প্রখর ইতিহাস সচেতন বলেই তাঁর উপন্যাসের কৃষকজীবনের পরিবর্তনের পরম্পরাটি যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয়। যদিও শ্রেণীগত সংঘাত, বাহ্যিক অভিঘাত ও চাঞ্চল্য এবং কৃষকজীবনের টানাপোড়েনের চিত্র অপরাপর ঔপন্যাসিকের রচনাতেও মেলে। এই পার্থক্যের কারণ অবশ্যই কনটেক্সটের বদল, সমাজ-অর্থনীতিগত রাজনীতিগত বদল আবার লেখকের বীক্ষাগত বদলও এর কারণ বটে। সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে শোষক-সমাজের শ্রেণীচরিত্র তেমনভাবে অঙ্কিত হল না, হল না তাদের শোষণের আধুনিক করণকৌশলের চিত্র। আবার, একজন স্বপ্নিল কৃষকের স্বপ্নের কথা বার বার বলা হলেও এবং সেই কৃষকের স্বপ্নকে শেষ পর্যন্ত জাগ্রত করে রাখা হলেও কৃষক শ্রেণীর সামগ্রিক জীবনচিত্র অনুপুঙ্খভাবে উঠে এল না, ধরা পড়ল না ইতিহাস ও যুগপৎ পরম্পরার চিত্র। তবুও মধ্যযুগের বণিক চন্দ্রধরের বর্তমানের অষ্টাবক্র জটিলতায় চাঁদবেনে হয়ে ওঠার চিত্রকে প্রেক্ষণবিন্দু নির্বাচনের নৈপুণ্যে প্রশংসনীয়ভাবে পরিবেশন করেছেন সেলিনা, এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

পনেরো

লাতিন আমেরিকার ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েলা গার্সিয়া মার্কেজ কলোম্বিয়ার তরুণ ঔপন্যাসিক প্লিমিও আপুলেইয়ো মেন্দোমার সঙ্গে কথোপকথনের সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, যা পেয়ারার গন্ধ (১৯৮২) গ্রন্থে সংকলিতও হয়েছে। মার্কেজ বলেছিলেন তাঁর লেখা উঠে আসে পুরোপুরি বাস্তবের মাটি থেকে, কেবল তিনি দেন আতস কাঁচ, যে কাঁচে চোখ রাখলে পাঠকেরা সেই বাস্তবকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আশি-নব্বইয়ের দশকের বাঙালি ঔপন্যাসিকরা লাতিন আমেরিকার কুহকী বাস্তবের ধাঁচে বাংলা উপন্যাসকেও পরিবেশন করছেন। ইয়োরোপের রূপকথা, ইয়োরোপের পুরাণ যদি সত্য হয়, তা নিয়ে যদি গর্ব করা যায়, তবে তাঁদের দেশেরও পুরাণ রূপকথা বা লোকপরম্পরায় বহিত কথাও সমান সত্য, সমান গুরুত্বপূর্ণ— এ কথা মনে করেছেন লাতিন আমেরিকার ঔপন্যাসিকরা। আশির দশকের বাংলার শহর মফস্বলেও লাতিন আমেরিকার উপন্যাস এসে পৌঁছেছে আর দীর্ঘকাল উপনিবেশের যন্ত্রণা ভোগ করা ও উপনিবেশের শাসন মুক্ত হওয়া একটি দেশের ঔপন্যাসিকের সঙ্গে একই যন্ত্রণার শিকার আর-একটি দেশের ঔপন্যাসিকরা মনোগত সাদৃশ্যকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই তাঁদের উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে ম্যাজিক রিয়েলিজম বা কুহকী বাস্তবতা, এদেশের মিথ-লোককথা হয়েছে উপন্যাসের উপাদান। যে দেশজ পরম্পরা বাংলা উপন্যাসের স্ট্রাকচারে তেমনভাবে দেখা যায় নি বলে সমালোচকগণ অভিযোগ করেন, সেই পরম্পরাকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা দেখা যায় আমাদের এ বাংলাতে। আমাদের কথা রচনার নিজস্ব পরম্পরা ছিল, যা প্রযুক্ত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য-কথকতা-পাঁচালীতে, তা আবার নবনির্মিত হচ্ছে একালের উপন্যাসে, এ বড়ো সুখের কথা, এ বড়ো আনন্দের কথা।

বাংলা উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবনচেতনা

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে উপন্যাস লেখার চল হয় নি। উপন্যাস আধুনিক কালের ফসল। কিন্তু সে যুগেও কাহিনী ছিল। সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছিল সে-সব আখ্যানে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখ্যান-নির্মিতিতে মুগ্ধ একালের সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে কাব্যকে উপন্যাসের তুল্য বলে মনে করেছিলেন। সে-সব আখ্যানের অনেকগুলিতেই অন্ত্যজ জীবনের পরিচয় মেলে।

বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জনজীবনের প্রসঙ্গ তার আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে অন্ত্যজ জনজীবন-গোষ্ঠীর সানুপুঙ্খ পরিচয় তাতে মেলে না। কারণ আদি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্মাশ্রয়ী। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতারই প্রলম্বিত ছায়াপাত ঘটেছে। দেবমাহাত্ম্য প্রচারই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্ত্যজ জীবনকে অস্বীকার করে কোনো মঙ্গলকাব্য রচিত হতে পারে নি, এও সত্য। পূজাপ্রচারের জন্য যেমন অর্থবান বণিক সম্প্রদায়ের সহায়তা আবশ্যক ছিল, তেমনি আবার অন্ত্যজ জীবনকে আশ্রয় করে তাদের মধ্যে পূজা প্রচারের আগ্রহ ছিল মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর। ধনপতি, চাঁদসদাগরের পাশাপাশি কালকেতুদেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মঙ্গলকাব্যের দেবীর। এর কারণ খুঁজতে গেলে বাংলাদেশের বাঙালিজাতির ইতিহাসের বহুচর্চিত সেই আর্য-অনার্য সম্মিলনের প্রসঙ্গই স্মরণে আসে। বাঙালি কবি কীভাবে অনার্যকে কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন সে আলোচনা স্বতন্ত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো বাস্তববাদী কবিও কখনোই যেন বিস্মৃত হতে পারেন নি কালকেতু আসলে স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর। কালকেতু-ফুল্লরার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মকেতু-নিদয়ার বারাণসীতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি উচ্চবর্ণের মানস আদলেই গড়া হয়েছিল অনার্য চরিত্রগুলি। কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহের সঙ্গে শিব-পার্বতীর বিবাহের স্ত্রী-আচার ও সংস্কারের তুলনা করলেই বোঝা যায় মুকুন্দ ব্যাধ জীবনের প্রথা ও রীতিনীতি নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবেন নি। শুধু ব্যাধ জীবনের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে চান বলে কালকেতুর বিবাহে 'তিনটা পাতন কাণ্ড'-এর পণ নির্ধারণ করে দেন মুকুন্দ। মহাশ্বেতা দেবী ব্যাধখণ্ড উপন্যাসে কার্যত মুকুন্দের ব্যাধখণ্ড-এর সমালোচনাই উপস্থাপিত করেছেন। তবে অন্ত্যজ জনজীবনের এরকম উপস্থাপনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে হতে পেরেছিল তা নিয়ে কোনো ধন্দ নেই। চর্যাপদের অন্ত্যজ জীবনচিত্র অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। চর্যাপদে অন্ত্যজ জীবনের প্রতিবেদন রচিত হয়েছে পরোক্ষে। অন্ত্যজ জীবনকে কীভাবে দেখা হবে, কীভাবে আর্যীকরণ ঘটবে তার, এ নিয়ে চর্যাকারদের কোনো ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ছিল বলে মনে হয় না। আর্য-অনার্য সমন্বয় পর্বের আগেই চর্যাপদগুলি রচিত হতে থাকে এবং তার রচনাকারেরা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের সাধনার গূঢ় তত্ত্বকে আড়াল করবার জন্য তাঁরা রূপকের আশ্রয় নিতেন। ফলে জীবন থেকে যে উপমা উঠে আসত তা তাঁদের গূঢ় তত্ত্বে পৌঁছানোর উপায় মাত্র, উপেয় নয়। সেই-সব রূপকের মধ্য দিয়ে আবার আভাসিত হত অন্ত্যজ জনজীবনের চালচিত্র। ১০ সংখ্যক চর্যাপদে (কাহ্নপা) যেমন জানা যায় নগরের বাইরের ডোম্বীর ঘর আর ব্রাহ্মণকুমারকে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে প্রেম নিবেদন করতে হয়। ডোম্বীর/ডোম্বীদের ঘর যে নগরের বাইরে বা প্রান্তেই থাকে, কেন্দ্রে নয়, এই তথ্য চর্যাপদই আমাদের দেয়। সমাজ যাদের প্রান্তবর্তী করে রাখে তাদেরকেই আবার প্রয়োজনে যৌন উপাদান হিসেবেও সমাজ অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্রহণও করা যায়; আরেকটি প্রকীর্ণ চর্যাপদে তারই সাক্ষ্য মেলে।

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি ব্রাহ্মণ / জগ বিটালান্তিতে দুই লাম্বল (ধ্রুঃ)॥
হলসহি কামঞ্চি অচাভুখ দিঁটঠা / ব্রাহ্মণ মনুস চণ্ডালিএঁ তুট্‌ঠা।

অইসি নিরাজক মান ণ দিশই / মাউগ চণ্ডালী বাম্ভাণে পইসই।
দেখু চণ্ডালীর বাম্ভণ জার / পাঞ্চ বান্ন ভইল একাকার।[১]

[গৃহিণী চণ্ডালী গৃহপতি ব্রাহ্মণ। তাহারা দুইজনে...জগৎ দূষিত করিতেছে। ওলো সখি, আমি কী অত্যদ্ভুত দেখিয়াছি; ব্রাহ্মণ মানুষ চণ্ডালীতে তুষ্ট। এই রকম নির্লজ্জ মানুষ দেখা যায় না; চণ্ডালী নারীতে ব্রাহ্মণ উপগত হয়! দেখা হউক (বা দেখ) চণ্ডালীর উপপতি ব্রাহ্মণ। পঞ্চবর্ণ একাকার হইল।][২]

কিন্তু কেমন থাকে সেই চণ্ডালীরা? টিলার উপর তার ঘর। কেউ তার প্রতিবেশী নেই। আর, নিত্যই তাকে উপবাসী থাকতে হয়; দারিদ্র্যের কারণে নিশ্চয়। এই চণ্ডালীদের তেমন কোনো সুস্পষ্ট সমূহ জীবনের পরিচয় নেই চর্যাপদে। কিন্তু মুকুন্দের কালকেতুদের একটা পাড়া ছিল। সে পাড়াও সমাজের একপ্রান্তে নিশ্চয়। সে পাড়ার পরিচয় তত স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই মুকুন্দের কাব্যে, কিন্তু সেখানে থাকলে যে ধার মেলে না মুকুন্দ তা উল্লেখ করেছেন।

কালকেতু বলে, 'কিরাত পাড়ায় থাকি না মেলে উধার।'
অন্যত্র বলে, 'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়
কেহো না পরশে জল লোকে বলে রাঢ়।'

কালকেতুদের সেই অবস্থিতি নিতান্তই অসম্মানের। কালকেতুরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাতে। আগের থেকেই ছদ্মবেশী চণ্ডীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বলে তাই : 'অতি নীচ জাতি আমি জাতিতে চোয়াড়।' সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে গুজরাট নগরী প্রতিষ্ঠিত হবার পর নানাজাতির পেশাসহ বিস্তৃত বিবরণ আছে মুকুন্দের কাব্যে। মুসলমান প্রজাদের সসম্মান উল্লেখ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু সেই গুজরাটের রাজা যে জাতির মানুষ তাদের স্থান কোথায় হল গুজরাটে তার উল্লেখ খুব বেশি নেই সেখানে। কিরাতদের প্রসঙ্গে অবশ্য বলা হয়েছে, 'নিবসে কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল।' তাতে কিরাতদের শিকারজীবী জীবনের যে-কোনো তথ্যই অনুল্লেখিত। কারণ এই বর্ণনা মুকুন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে পাচ্ছি আমরা। মুকুন্দ তাই, ধর্মকেতু-নিদয়াকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে বাণপ্রস্থে কাশীতীর্থে পাঠান। ফুল্লরা কথায় কথায় শাস্ত্রবচন আওড়ায়। আর, ব্যাধেরা গুজরাটে প্রান্তবর্তীই থেকে যায়। মনুতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় অবশ্য সেটাই হওয়ার কথা। মনুর বিধান মানলে চণ্ডাল-শ্বপচ জাতির বসবাস জনপদের বাইরেই হওয়ার কথা। মনুসংহিতায় আছে :

'চণ্ডালশ্বপচানাস্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশয়'[৩]

শিবায়ন কাব্যে শিব কৃষিজীবী। বর্ণের দিক থেকে যদিও তিনি ব্রাহ্মণ। বরং ধর্ম দেবতা অন্ত্যজদেরই দেবতা। অনেকেরই ধারণা ব্রাহ্মণ্য বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গেই ধর্মদেবতার প্রধান যোগ। যদিও পরবর্তীকালে ধর্ম নিরঞ্জন এবং শিব একাকার হয়ে গেছে স্থানবিশেষে এবং স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও দশাবতারের একজন করে নিয়ে আর্যীকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর স্ব-সম্প্রদায়ের অধিকরণ সুনিশ্চিত না হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাব্যে ইছাই ঘোষের রাজত্বে অন্ত্যজ মানুষের বসতির সসম্মান স্বীকৃতি মিলেছে।

অন্ত্যজ কোনো মানবগোষ্ঠীর অন্ত্যজ হয়ে পড়ার এক পুরাকল্পিক কূটাভাস লুকিয়ে আছে মনসামঙ্গল কাব্যের ঝালু-মালুর উপাখ্যানে। ঝালু আর মালুর উত্তরসূরিরাই ভবিষ্যতের ঝল্ল ও মল্ল বা ঝালমাল সম্প্রদায়।[৪]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে দেখা যাচ্ছে অন্ত্যজ জনজীবন প্রসঙ্গ থাকলেও সুস্পষ্ট গোষ্ঠীজীবনের পরিচয় সে-ভাবে মেলে না। এমন-কি উনিশ শতকে উপন্যাস লেখার সূচনা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও জনজাতিগোষ্ঠীকে কেন্দ্রে রেখে কোনো উপন্যাস নির্মিত হতে দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে কিংবা শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসে নিম্নবর্ণের মানুষের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তারা কেন্দ্রে নেই। উপন্যাসেও তারা কার্যত প্রান্তিক অবস্থানেই ছিল। বরং শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ-এর মতো গল্পে অভাগী-কাঙালির মতো কেউ কেউ কেন্দ্রে আসবার সুযোগ পেয়েছে।[৫] অন্য দিকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে উপযোগবাদে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক প্রবন্ধে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি বিশেষ আগ্রহের প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার অভিমুখ অন্য দিকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর উৎপত্তি প্রবন্ধে[৬] নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিপন্ন করেছেন একাধারে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনজাতির অনার্য উৎস এবং অন্যদিকে বাঙালির সঙ্গে জনজাতির মিশ্ররক্তের সম্পর্ক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূল চরিত্ররা সবাই প্রায় খুব অ-সাধারণ গোছের। সাধারণ মানুষ পরাণ মণ্ডল, রামা কৈবর্ত বা হাসিম সেখেদের কথা বলবার জন্য তিনি প্রবন্ধের প্রস্তাবনাই বেছে নিয়েছিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোন্ বর্ণের বা কোন্ বর্গের মানুষের অভিবাসন হবে তা নিয়ে হয়তো তাঁর মনে কোনো একটা আদল তৈরি হয়েছিল আগে থেকেই। প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখকের কিছু সংশয়, কিছু আদর্শ (Model) থাকতেই পারে। মননের মুক্তি হয় প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবন্ধেই অনুসন্ধান করলেন জনজাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস। মহাশ্বেতা দেবীর মতো একালের কোনো কোনো সাহিত্যিক যে অনুসন্ধানটা করতে চাইছেন কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

বিশ শতকের দুই বা তিনের দশকে কল্লোল-কালিকলম-এর যুগের কথা-সাহিত্যে, একালের ব্রাত্য, বঞ্চিত মানুষের কেন্দ্রে চলে আসা লক্ষণীয়ভাবে ঘটতে থাকল। তারও পিছনে আছে তাদের এতদিন বঞ্চিত করে রাখার কল্লোলীয় প্রতিবাদ। সামগ্রিকভাবেই কল্লোল বিদ্রোহী।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।'[৭] কল্লোল রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল। 'সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্ন মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।'[৮] তারা সাহিত্যে অভিজাত্য মানে না। 'মুটে মজুর কুলি খালাসী দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যে-সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি, বাত, স্থূলতা ইত্যাদির মতন আবশ্যক অথবা আপাতত অপরিহার্য বলে জীবনেই কোনোরকমে ক্ষমা করা যায়— এবং বড়োজোর কবিতায় একবার— 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু' ইত্যাদি বলে আলগোছে হা-হুতাশ করে ফেলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের স্বপ্নবিলাসের মধ্যে সে-সবও নাকি টেনে আনতে চায়।'[৯] সব মিলিয়ে একটা 'বলবান সাহিত্য গোষ্ঠী'-ই তৈরি করার সংকল্প অঙ্কুরিত হচ্ছিল কল্লোল পত্রিকা সূত্রে। কল্লোল স্পর্শ করতে চাইছিল সেই-সব সীমানাগুলি, বাংলা সাহিত্যে যা তখনো অ-স্পৃশ্য থেকে গিয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, কল্লোলে দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। এক দিকে রুক্ষ-শুষ্ক শহুরে কৃত্রিমতা, অন্য দিকে অনাঢ্য গ্রামজীবনের সারল্য। বস্তি বা ধাওড়া, কুঁড়েঘর বা কারখানা, ধানখেত বা ড্রয়িংরুম। সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ। যতটা শক্তিসাধ্য, শুধু ভবিষ্যতের ফটকের দিকে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া।

বস্তুত. নতুন ধারার সাহিত্যের জন্য একটা অপেক্ষা, একটা প্রত্যাশা জন্ম নিচ্ছিল বাঙালি পাঠ-সমাজে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুন্সিগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনীর ভাষণ থেকে তেমন অনুমান করা চলে। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,— পূর্বের মতো রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্য দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না।— রুশ সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরো সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।

তবে কল্লোলের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার একটা অভিযোগও জমে উঠেছিল। শনিবারের চিঠি পত্রিকা-সম্পাদকের মতো অনেকেরই অভিযোগ, পাশ্চাত্যের এক জাতের সাহিত্যের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের জন্যই কল্লোলের ঐ 'মিথুনাসক্তি'। শরৎচন্দ্র বিদেশি সাহিত্যের আবাহন করছেন যখন কল্লোলে তখনো সেই বিদেশি সাহিত্য তাদের 'অশ্লীল' করে তুলছে বলেও অনেকের মনে হতে থাকে। অন্য দিকে রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ-এর মতো উপন্যাস অনুবাদের মধ্য দিয়ে আসলে কল্লোল প্রসারিত করে দিতে চাইছিল সাহিত্যের ভুবন। মাঝ থেকে সেই সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার চিরকেলে তর্ক জমে উঠল। রবীন্দ্রনাথকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল সেই

তর্কে। সে অন্য প্রসঙ্গ। অশ্লীলতার তর্ক ছাড়াও সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে কল্লোলের ভাবনার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট মতামত জানা গেল। পটলডাঙ্গার পাঁচালী-র কুঠে বুড়ি, নফর, খেঁদি ঝিমিদের নিয়ে যে বস্তিজগৎ-- রবীন্দ্রনাথের তা খুব পছন্দের হয় নি। তিনি লিখলেন, 'মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে-কালে বিস্তৃত হতে থাকে। ...অতএব বিষয় বৈচিত্র্য কালে-কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েছে তার উপর ঝোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিই। ...কয়লার খনি বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসবে? এই রকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় এ মানতে পারব না। বিশেষ একটা চাপরাসপরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতে সেটা অবিশ্বাস করা উচিত। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাসের দেমাক বেশি হয়। ...আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, কালই তা আবর্জনা কুণ্ডে স্থান পায়। ...সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায়, যখন দেখি বিষয়টা বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ...বিষয় প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয়, তাহলে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।' [১০] সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথের মনে হল কল্লোলের মধ্যে 'দেখনদারি'-ই প্রধান। তান্ত্রিক অঘোরপন্থীদের উদাহরণ টেনে এনে বললেন, যা-কিছু অ-সুন্দর তার পক্ষপাতও একরকমের পক্ষপাতই। তেমনি কিছু অ-সুন্দরের বর্ণনা দিলেই সাহিত্য 'বাস্তববাদী' হয়ে যায় না। একটি কবিতায় নব্য আধুনিকদের পরিহাস করে বললেন :

> 'সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
> ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।' [১১]

নিজের কাব্যজীবনের অসম্পূর্ণতার ক্ষোভ এ কবিতার ছত্রে ছত্রে। কিন্তু তাঁর সাবধানবাণী ছিল, 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' তিনি বিশ্বাস করতেন, 'অন্তর মিশালে তবে অন্তরের পরিচয়' পাওয়া যায়।

শুধু রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষী-প্রতিম সাহিত্যিকই নয়, সমসাময়িক অনেক লেখকও এই নব্য আধুনিকতাকে খুব সাদরে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বা 'Belated Kollolean' বলে যাঁকে প্রকারান্তরে তাঁদের 'কাছের মানুষ' প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হয়েছিল, সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি-র মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকির সন্ধান পেলেন। অথচ কয়লাকুঠি-র লেখকের প্রতি কল্লোলের লেখকের কেমন ছিল প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা তার উল্লেখ আছে অচিন্ত্যকুমারের কল্লোলযুগ-এ। 'সানন্দে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রতিনিধি? বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু, নতুন ভাষা, নতুন ভঙ্গি এনেছেন? হাতির দাঁতের মিনারচূড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিক্লান্ত মৃত্তিকার সমতলে? ...যেন এই প্রথম আলাপ হল না, আমরা যেন কতকালের পরিচিত বন্ধু।' সেই শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বললেন, 'ওখানে বস্তি আছে কিন্তু বস্তির বাস্তবতা নেই।' [১২]

উত্তরকালের এক সাহিত্য-সমালোচক শৈলজা-মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'শৈলজানন্দের গল্পে গ্রামীণ পটভূমি থাকলেও তার সমস্যা বা সংকেতগুলো ছিল নাগরিক মন থেকে আরোপিত।' [১৩] বস্তুত বাংলা সাহিত্যের তিন-বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেউই কল্লোলের নন। বিভূতিভূষণের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারাশঙ্কর কল্লোল-এ গল্প লিখেছেন, কিন্তু কল্লোল থেকে অভ্যর্থিত হন নি। কল্লোল তাঁর সাহিত্যের ভাব-প্রেরণা হতে পারে নি। একদিনই মাত্র কল্লোলের অফিসে গিয়েছিলেন তিনি। 'তারাশঙ্কর যেন অনুভব করল তাকে উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে বরণ-বর্ধন করা হচ্ছে না। একটু যেন মনোভঙ্গ হল তারাশঙ্করের ...ঐ একদিনই শুধু তারপর আর যায় নি কোনো দিন ও দিকে। হয়তো অন্তরে বুঝেছে, মন মেলে তো মনে মানুষ মেলে না। কল্লোলে লেখা ছাপা হতে পারে কিন্তু কল্লোলের দলের সে কেউ নয়।' [১৪] তারাশঙ্কর বিষয়ে অচিন্ত্যকুমারের মূল্যায়ন, 'সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির সে স্থৈর্যের। উত্তাল ঊর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা, বলি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।' [১৫]

তারাশঙ্করের আত্মমূল্যায়নও এর থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না। তিনি লিখেছেন, 'আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙে চুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয় নি। ...আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।' [১৬]

নব্য আধুনিকদের প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "যখন আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম তখন ...নূতন পথ ও মত আবিষ্কারের সাড়া পড়ে গিয়েছে। তখন তরুণ সাহিত্যের প্রথম কাল। ...রসবোধের অভাবে অথবা অতিবিকৃত সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তির ফলে পঙ্কজ পুষ্পের জীবনেতিহাসের মধ্যে পঙ্কই প্রধান্য লাভ করেছে। পদ্ম গন্ধের মধ্যে পঙ্ক গন্ধকে আবিষ্কার করাই বা প্রমাণ করাই যেন রীতি বা 'আর্ট' হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদ্মমধুর পরিবর্তে পঙ্করসে নয়নাঞ্জন রচনার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হতে লাগল। ...এঁদের যুগ সবে আরম্ভ হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রচুর। সে অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহারুদ্রের যে ডমরু বেজে উঠল তারই ফলে দেখা দিল জগদ্ব্যাপী বিদ্রোহের সুর। পৃথিবীর সর্বত্র সমাজ শৃংখলায় শৃংখলিত প্রত্যেক মানুষটির জীবন অস্বাভাবিক নির্মম আলোড়নে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হয়ে উঠল।" [১৭] অবশ্য এঁদের যেটা বলিষ্ঠতার দিক তা স্বীকারেও অকুণ্ঠ ছিলেন তারাশঙ্কর। বললেন, 'এঁরাই কিন্তু প্রথম দৃষ্টিপাত করেছেন অনাদৃত অবজ্ঞাত মানব-সমাজের দিকে। দয়ার্দ্র হয়ে এঁদের দুঃখের কথা বলে এঁদের জন্য করুণা ভিক্ষা করেন নি তরুণ সাহিত্যিক। তাঁদের আত্মীয় হয়ে, মনোমন্দিরে তাঁদের স্থান দিয়ে, তাঁদের দাবির কথা জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। ...আধুনিক সাহিত্যিক আপন শক্তি বলে স্থান করে প্রতিষ্ঠিত করেছে— দুর্গন্ধময় জীর্ণকন্থা পরিহিতা অস্পৃশ্য জাতির মাতৃদেবতাকে। এমনি করে ঐ ঘৃণিত অবজ্ঞাত অস্পৃশ্য পারিয়ার মধ্যে নর-নারায়ণকে প্রতিষ্ঠিত করে সে পূজা করেছে। ...কয়লার খনির অন্ধকারের মধ্যে মানবাত্মার সন্ধানে জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে সে ছুটে চলেছে— নেশায় উন্মত্ত হাড়ি ডোম চণ্ডালের পল্লীর মধ্যে সে পূজোপকরণ বহন করে নিয়ে চলেছে— রোগ-জীর্ণ, অনাহার-শীর্ণ ভিক্ষুকের মধ্যে কাঁদেন যে আত্মনারায়ণ— তারও পূজক সে। ...আজ প্রাসাদবাসিনী মা— আর কুটিরবাসিনী মা— সর্বালঙ্কার ভূষিতা শিক্ষিতা সুন্দরী ধনী-পত্নী, রাজবধূ আর চীরধারিণী কুৎসিতা, নিরক্ষরা, চণ্ডাল-পত্নী সাহিত্য-মন্দিরের মণি-বেদীতে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।' [১৮]

তারাশঙ্করের এই মূল্যায়নে তাঁর নিজস্ব সাহিত্য-ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। 'অপ্রমত্ত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দিয়ে দরদী অন্তর নিয়ে' সাহিত্য রচনা করতে হবে সাহিত্যিককে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদারনাথ, প্রভাতকুমারের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেছেন সেই 'দরদী অন্তর'। আর সাহিত্যিকের থাকবে নিজ মত এবং পথের উপর বলিষ্ঠ আস্থা। কল্লোলের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই 'দরদ' আর বলিষ্ঠতারই অভাব লক্ষ করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে, তাঁদের অবলিষ্ঠ ভিত্তির জন্যই তাঁরা নতুন নতুন গ্রন্থ এবং তত্ত্বের দোহাই পেড়ে থাকেন। 'এই শাস্ত্র হল পাশ্চাত্যগ্রন্থ এবং শাস্ত্রকার হলেন গ্রন্থকার— পাশ্চাত্ত্য মনীষী।' [১৯]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে— বেশ চাঁচাছোলাভাবেই কল্লোল-কালিকলমের লেখকদের সমালোচনা শানিয়েছেন উত্তরকালে। তিনি লিখেছেন, সাহিত্যে এই 'আধুনিক' মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড সোরগোল তুলে, প্রায় একটা বিপ্লব মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। কিন্তু খ্যাতনামা এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকে এভাবে ঘায়েল করা যায় না। 'কাব্য-সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়েই এদের ভূমিসাৎ করতে হয়। ...সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল-কালিকলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।' [২০] প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠি উদ্ধৃত করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেন্দ্রবাবু মেলাবেন কি করে?' মানিকের দৃষ্টিতে একটি যদি হয় ভাবের আকাশের ঝড় তো অন্যটি মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা। তবু, তাঁরও ভালো লাগে আধুনিকদের ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানি, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা। তারই পাশাপাশি 'হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতার বোধে পীড়িত ছিলেন, তার সম্পূরণ হয়নি কল্লোলে। শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ— কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বাস্তব সংঘাত আসে নি। ...বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ।

কল্লোল যে রোমান্টিক, কল্লোল যে নাগরিক, কল্লোলীয়রা সে কথা অবশ্য নিজেরাও অস্বীকার করে নি। গ্রামীণ জীবন নিয়ে প্রত্যন্ত পটভূমিকায় যাঁরা সমসময়ে লিখছিলেন, তাঁদের প্রতি বরং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিই দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। ময়ূরাক্ষী-খ্যাত সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কল্লোলের যে দিকটা বিপ্লবের সে দিকে সে নেই বটে, কিন্তু যে দিকটা পরীক্ষা বা পরীষ্টির সে দিকের সে একজন। এককথায় বিদ্রোহী না হোক সন্ধানী সে। এবং যে সন্ধানী সেই সংগ্রামী। সেই দিক থেকে কল্লোলের সঙ্গে তার ঐকপদ্য। অচিন্ত্যকুমারের এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় নতুনের সন্ধান— বিষয়ে-আঙ্গিকে— নতুনের সন্ধানই কল্লোলের অভীষ্ট। মনোজ বসু প্রসঙ্গেও তিনি ঐ কল্লোলযুগ গ্রন্থেই বলেছেন, 'কল্লোল যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইঁট-কাঠ-লোহা-লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে-বাদায়, খালে-বিলে, পতিতে-আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় কল্লোল দেখেছে মানুষের ট্র্যাজেডি, প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা। এক দিকে নেতি, অন্য দিকে আপ্তি।' বলাবাহুল্য, এই নেতি-র দিক কল্লোলের। এরই বিপ্রতীপে বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল আরেক 'আপ্তি'-র দিক। সে দিক গ্রামের দিক, অবজ্ঞাত কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীর জীবনের দিক, শিকড়হীন কিছু মানুষের বিপরীতে শিকড়ের টানওয়ালা কিছু মানুষের দিক। শিকড় আর শিকড়হীনতার এই এক নতুন বিন্যাস দেখা দিল বাংলা উপন্যাসে। উপন্যাসের কথাই বলছি, কারণ যে বিপুল দ্বন্দ্ব, টান, ঐ শিকড় আর শিকড় উন্মূলনের, তার ধারণের যোগ্য আধার উপন্যাসই হতে পারে। উপন্যাসই বহুস্তরীয় সেই প্রতিনির্মাণ যাতে আলাদা-আলাদা করে নানা মাত্রাকে সানুপঙ্খ পর্যালোচনা করা যায়। উপন্যাসেই লেখক-কথক-চরিত্র সমূহ ব্যাপ্ততর পরিসরে নানা স্বরে বহুস্বরিক ও বহুরূপময় [২১] হয়ে উঠতে পারে। এক দিকে কল্লোলের ভিখারি, পকেটমার ইত্যাদি শিকড়ছেঁড়া কিছু মানুষের সমবায়, অন্য দিকে জাতপাত, ধর্ম, পেশা, সংস্কৃতিতে সমসত্ত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ এক-একটি গোষ্ঠী। তাদের অতীত আছে, বর্তমান আছে। ঐতিহ্য আর পরম্পরাকে তারা বিশেষ মূল্যবান মনে করে। উৎপাদনের সম্পর্কের কোনো একটি বিশেষ স্তরে তাদের অধিষ্ঠান। উৎপাদন সম্পর্ক-রহিত ভিখারি, পকেটমারের মতো তারা নয়। এমন গ্রামীণ বৃত্তিগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে উপন্যাস রচিত হল বেশ কিছু। আর, সে-সব উপন্যাসের পটভূমি কোনো গ্রাম বা প্রত্যন্ত কোনো প্রান্তর। শিকড় তো গ্রামেই থাকে। গ্রাম থেকে শিকড় উপড়ে এসে এক একটি করে জমা হয়ে যা নির্মিত হয়, তারই নাম নগর। শিকড়ের স্মৃতি এবং শিকড়ের উন্মূলনের ছবি যদি স্পষ্ট করে দেখতে হয় তাহলে তাকাতে হবে কোনো বিশেষ কৌম বা গোষ্ঠীর দিকে। কেন-না, গ্রাম স্বয়ং এক গ্রামীণ মানুষের গোষ্ঠী হলেও গ্রামেও তো আছে অসমসত্ত্ব নানা উপাদান। জমিদার, প্রজা, পুরোহিত, চণ্ডাল সব নিয়েই গ্রাম। তারাশঙ্কর বাঁশবাদি গ্রাম নিয়ে হাঁসুলীবাঁকের উপকথা লিখেছিলেন। বাঁশবাদির মধ্যে 'কাহার পাড়া'-ই তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পটভূমি। বাঁশবাদির আর-সব প্রসঙ্গ কিছুটা বিবৃতিতে, কিছুটা আলতো উল্লেখ মাত্রে আছে।

কিন্তু, কেন এই গোষ্ঠী নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রবণতা? একালের এক সমালোচকের মনে হয়েছে, 'অধিকার সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের ধারা নিয়ে লেখালেখি ট্রেড ইউনিয়নিজমের কারণে এক সময় আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। ফলে তরুণ লেখকেরা বিষয়কে বড়ো আধারে ধরে ব্যক্তি, পরিবার এবং অঞ্চলকে অতিক্রম করে দেশ-কালের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক প্রয়াস পান নি। বরং একটা বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী বা জীবিকা আঞ্চলিক কোনো গোষ্ঠীর জীবিকা ও পারস্পরিক চাপকে ফুটিয়ে তুলতেই আলোচিত কথা সাহিত্যিকরা বেশি আগ্রহী।' [২২] সমালোচকের মন্তব্যের শেষাংশ প্রসঙ্গে অবশ্য একটি সবিনয় বক্তব্য উত্থাপন করতে পারি। গোষ্ঠীজীবন আশ্রয়ী সাহিত্য কি যথেষ্ট 'বড়ো আধার' হতে পারে না? আঞ্চলিক পটভূমিতে লেখা হলেই

কোনো সাহিত্য সার্বজনীনতা হারায় না। বরং আমাদের মনে হয় ভিতরের একটা তাগিদ না কাজ করলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনের কাছে লেখকরা ফিরে যেতে চাইতেন না। সাহিত্য রচনার পটভূমি ও বিষয়গত সীমা সম্প্রসারণের একটা আকাঙ্ক্ষা তো থাকতেই পারে, কিন্তু শুধু সে কারণেই কোনো সাহিত্য রচিত হলে তা বিলাস মাত্র, অবসরযাপন মাত্র হয়ে পড়ত।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী, তিতাস একটি নদীর নাম, ঢোঁড়াইচরিতমানস, গঙ্গা, পূর্বপার্বতী, শতকিয়া— সবই চার, পাঁচ বা ছয়ের দশকের উপন্যাস। বলাবাহুল্য উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। একটি ধারার ক্লিষ্ট অনুবর্তন সবক্ষেত্রেই হতে পারে, কিন্তু তাতে প্রথম সার্থক রচনাগুলি অভিযুক্ত হতে পারে না। চারের দশক থেকে আটের দশকের সময়ের ফাঁক চার দশকের, কিন্তু ততদিনে জনজীবনগোষ্ঠীর প্রতি লেখকদের দৃষ্টিকোণ এবং মূল্যায়ন ও প্রতিরূপায়ণ বদলে যেতেই পারে। সে আলোচনাও স্বতন্ত্র। যাই হোক, আমাদের মনে হয় গ্রামীণ জনজীবনগোষ্ঠীভিত্তিক উপন্যাস রচনার একটা তাগিদ তৈরি হয়েছিল বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। খুব সরব কোনো ধারা নয়। ভারতবর্ষের না-জানা, না-চেনা, অবজ্ঞাত, অপরিচিত জীবন আর জগতের এক টুকরোকে আবিষ্কারের একটা উপায় হিসেবে এই ধারার বিকাশ হয়ে থাকতে পারে। আর, তারাশঙ্করকেই হয়তো বলা যায় সেই ধারার ভগীরথ। পৃথিবীর অনেক দেশেই মাটির পানে মুখ ফেরানোর একটা আয়োজন চলছিল বিশ শতকে। বাংলা উপন্যাসে দেশজ আঙ্গিকে প্রত্যন্ত মানুষের কথা বললেন তারাশঙ্কর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের দেখা মিলেছিল, হয়তো সেই প্রথম। কয়লাকুঠির শহরের শ্রমজীবী নয় বস্তুত জেলেরা। কয়লাকুঠির শ্রমিকরা শুধুই শ্রমিক, মার্কসের ভাষায় তারা একটি 'শ্রেণী'। কিন্তু জেলেরা শুধুই শ্রমিক বা ক্লাস নয়, তারা একটি সম্প্রদায়, একটি জাত (race)। এই জাত, সম্প্রদায়ের বিস্তর ইতিহাস। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় অন্তেবাসীদের বাস্তবতার অভিজ্ঞান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে সম্প্রদায় নিয়ে উপন্যাস রচনার সূচনা করলেন বটে, কিন্তু সে উপন্যাসে কুবেরদের যেটুকু সম্প্রদায়-পরিচয়, তা ঐ পেশার ভিত্তিতেই, তাদের জাতিসত্তার কোনো পরিচয় সেখানে নেই। সেই পরিচয় পেতে হলে মুখ্যত অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটা নদীর নাম এবং সমরেশ বসুর গঙ্গা-র জেলে জীবনের পরিচয় নিতে হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জিজ্ঞাসা আর অদ্বৈত-সমরেশ, সর্বোপরি তারাশঙ্করের তফাতটা বোঝা যায়।

পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) উপন্যাসে যে সম্প্রদায় চেতনার পরিচয় আছে তা আসলে শ্রমজীবী শ্রেণী-চেতনার। কুবেরের প্রথমবার ময়নাদ্বীপ যাত্রাকালের কিছুটা উদ্ধৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে : 'মধ্যাহ্নে নৌকা ভিড়াইয়া রান্নার আয়োজন করা হইল। নিজেদের জন্য রাঁধিবার ভারটা কুবেরের উপরেই পড়িয়াছিল, অদূরে রন্ধনরতা রসুলের বোন নছিবনকে দেখিতে দেখিতে কুবের মনে মনে একটু আপশোস করিল। ভাবিল, কি ক্ষতি মুসলমানের রান্না খাইলে? ডাঙার গ্রামে যাহারা মাটি ছানিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের ধর্মের পার্থক্য থাক, পদ্মানদীর মাঝিরা সকলে একধর্মী।' কুবের কথিত এই ধর্ম জলের ধর্ম এবং শ্রেণীধর্ম। ধর্মবুদ্ধি, গোষ্ঠীবুদ্ধির বিকাশের জন্য যে-শিকড়ের টান তার জন্য মাটি লাগে। পদ্মার প্রমত্ত জলের মধ্যে যারা জীবিকার টানে মাছ খোঁজে, তাদের মধ্যে কুবেরের পাশে যেমন গণেশ থাকে, তেমনি থাকতে পারে রসুল বা আমিনুদ্দি। আশ্বিনের ঝড়ের সমূহ বিপর্যয়ে ক্ষতি হয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কেতুপুরের দরিদ্র জেলের। এই সত্য উপলব্ধি হয়েছিল বলেই হোসেন মিঞার স্বপ্নের জনপদে হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই আলাদা ধর্মস্থান স্বীকৃতি পায় নি। পদ্মানদীর মাঝিদের পদ্মার বুকে মুক্তি। প্রতিটি জেলে নৌকাতেই তাদের আপন অধিকার। তাদের কথাবার্তায় প্রথমেই আসে মাছের কথা (অর্থাৎ পেশার কথা)। তাদের হাঁকডাক, কথাবলার ধরনেও পদ্মা-প্রকৃতির নিজস্বতার ছাপ দেখা যায়। এ-সব নিয়েই পদ্মানদীর মাঝির জেলেসম্প্রদায়ের সমূহ জীবনচর্যা।

পদ্মানদীর সঙ্গে তাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক। 'নদী ছাড়া সবই বাহুল্য।' 'পদ্মানদীর মাঝি' এই শব্দবন্ধ তখন হয়ে উঠতে পারে একটি বিশেষ্যপদ। জাতিসত্তা যখন অস্তিত্বের সমার্থক তখন তো তা বিশেষ্যই, কিন্তু

উপন্যাসের নামকরণ কি সেই বিশেষ্য ভাবে, না কি কুবেরের বিশেষণ তা? সমস্ত মাঝিসম্প্রদায়ের পরিচায়ক হয়ে উঠলে তাকে বিশেষ্যই বলা যেত নির্দ্বিধায়, উপন্যাসের সূচনায় সেই প্রত্যাশাই জেগেছিল আমাদের। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকেই তা যেন হয়ে উঠল কুবেরের বিশেষণ। একেবারে শুরুর অনুচ্ছেদের দিকে তাকানো যাক :

'পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্র কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদী বক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারের দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়।'

এই বর্ণনায় জেলেদের পেশাকর্মে রত থাকার ছবিটি যেন লঙ শটে ধরা হল। এর ঠিক পরেই লেখক তাঁর মনোযোগের আলো কেন্দ্রীভূত করলেন অনেক জেলের মধ্যে একজন মাত্র জেলেকে। 'কুবের মাঝি মাছ ধরিতেছিল দেবিগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরো দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।' এর পর উপন্যাস এগিয়েছে কুবেরের ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পর্কের টানাপোড়েনে। ধনঞ্জয় ও গণেশের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা কেতুপুরেরই মানুষ। কিন্তু তারা জেলে মাঝি হলেও উপন্যাসে তাদের অবস্থান একই পর্যায়ে নেই। মানিক উল্লেখ করতে ভোলেন না, 'নৌকা এবং জেলের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম।' মানুষে-মানুষে এই যে সম্পর্কের বিন্যাস, সে সম্পর্ক শ্রম-সম্পর্ক, জাতি বা জ্ঞাতি সম্পর্ক নয়। আয়েশ করে কল্‌কে ধরানোর অধিকার তাই আগে ধনঞ্জয়েরই। অন্য দিকে কুবেরের শরীর সেদিন ভালো ছিল না। কিন্তু 'শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই।' এ অবস্থা কুবেরের মতো শ্রমজীবী যে-কোনো মাঝির। কুবের সমগ্র জেলে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এখানে। কিন্তু কপিলার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, পদ্মার বুকে তার কপিলাকে অনুভব, স্থলের আর জলের কুবেরের যে স্বভাবগত তফাত তা একান্তই কুবেরের। জেলে জীবনের, জেলে সংস্কৃতির কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না সেখানে। কুবের কপিলার সম্পর্কই প্রাধান্য পেয়ে গেল। এজন্যই কি অদ্বৈত মল্লবর্মনের মনে হয়েছিল মানিকবাবু মাস্টার আর্টিস্ট কিন্তু রোমান্টিক। 'বাওনের পোলা'-র লেখায় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন কোন্ অসম্পূর্ণতা?[২৩]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও আরেক ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু তিনি কাহারদের চিনতেন না এমন অভিযোগ অবশ্য কেউ করে নি। অবশ্য হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র ঢের সমালোচনাও হয়েছিল পরবর্তীকালে। কিন্তু সে সমালোচনা কতটা শৈল্পিক দায় থেকে আর কতটা রাজনৈতিক দায় থেকে তা বলা দুষ্কর। প্রকাশের পর বিপুল অভিনন্দিতই হয় এই উপন্যাস। অথচ পরিচয় পত্রিকায় হিরণকুমার সান্যাল তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসে উপন্যাসটিকে 'অশ্লীল' এবং 'অং'-এর খেলা বলে অভিযুক্ত করেন।[২৪] অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে বিষ্ণু দে এই উপন্যাসের প্রতি পরিচয়-গোষ্ঠীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হয়ে পরিচয়-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বিষ্ণু দে তারাশঙ্করের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। যোগভ্রষ্ট উপন্যাস বিষয়ে এর আগে তিনি দরাজ প্রশংসা করেন নি।[২৫] কিন্তু, রাজনৈতিক কারণেই তারাশঙ্করের উপর অন্যায় সমালোচনা হচ্ছে বুঝে তিনি চুপ করে থাকতে পারেন নি। তারাশঙ্করও আমার সাহিত্য জীবন-এ এ নিয়ে জমে ওঠা কু-নাট্যরঙ্গের জন্য যন্ত্রণা প্রকাশ করেন। নাগরিক রুচির পাঠকের হয়তো গ্রামীণ জনজীবনগোষ্ঠীকে একেবারেই বুঝতে পারেন-না এমন একটা সংশয় জমে ওঠে তারাশঙ্করের মনে। এর আগে ডাইনীর বাঁশি গল্প লিখেও তাঁকে শুনতে হয়েছিল সে গল্প নাকি পাশ্চাত্যের 'উইচক্র্যাফটের' গল্প। এমনতরো কথা যে চারপাশে উঠছে তা তারাশঙ্কর জানতে পারেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ব্যাকুল তারাশঙ্কর তার প্রতিবাদ করে বলেন, 'আমাদের গ্রামের স্বর্ণ ডাইনীকে যে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন তারাশঙ্করের গ্রাম দেখার বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের ঐশ্বর্য। এর আগেও চিঠিতে কিংবা সাক্ষাতে তারাশঙ্করের দেশ দেখার অভিজ্ঞতার বিপুলত্ব এবং তার সাহিত্যিক প্রকাশের প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক হাঁসুলীবাঁক

লিখবার সময়ও হয়তো নাগরিক পাঠকের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল তারাশঙ্করের মন। উপন্যাসটি উৎসর্গ করে কবি কালিদাস রায়ের উদ্দেশে তাই লিখলেন, "রাঢ়ের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা— সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে।" 'পল্লীজীবনের ছবি ও গান' আঁকতে গিয়ে তিনি কখনো তাঁর রচনার বিষয় করেছেন চণ্ডীপুর গ্রাম আবার কখনো রাঢ়ের নিতান্ত প্রাকৃত কাহার বা বেদে সম্প্রদায়। কখনো বৈষ্ণব (রাধা উপন্যাসে) সম্প্রদায়। এ-সবই কোনো জনগোষ্ঠী বা ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। কবি উপন্যাসে ঝুমুরের গানের যে 'দল' তারও আছে নিজস্ব রীতিকরণ। তাদের সাংকেতিক ভাষা, সংস্কৃতি, তাদের লক্ষ্মীপুজো সব নিয়ে সমাজ থেকে দূরবর্তী তারা কয়েকজন মিলে একটি গোষ্ঠী। নৃ-তাত্ত্বিকভাবে তারা গোষ্ঠী নয়। তারা একটি পেশাগত গোষ্ঠী। তারা মূল সমাজ থেকে, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ শিকড়ের জন্য তাদের কাতরতা আছে। মৃত্যুর পর তাদের কীভাবে সৎকার হবে, কোজাগরীর দিন তাদের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলে কেমন করে শুদ্ধাচারী হতে হয়, কেমন করে বিবাহ ছাড়াই এক বিবাহ-কল্প সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে তাদের নিজস্ব 'সমাজ'— তা তাদের স্বাতন্ত্র্যের সূচক। নিজস্ব অনুশাসনে বাঁধা তাদের সমাজ-আদল। কিন্তু কবি গোষ্ঠীজীবন ভিত্তিক উপন্যাস নয়। কবি নিতাইয়ের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে 'হয়ে ওঠার' উপন্যাস। তবে ঐ উপন্যাসে বর্ণিত 'ঝুমুর দল' শুধুই পেশার টানে সংলগ্ন আলগা কিছু মানুষের যোগফল নয়। তেমন আলগা মানুষের যোগফল বরং যুবনাশ্বের পটলডাঙ্গার পাঁচালী-র গল্পে দেখা যায়। কালনেমি গল্পে ময়না তার অথর্ব, পঙ্গু স্বামী ডাকুকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়েই থাকতে চায় পটলডাঙ্গার ভিখারি আস্তানায়। কিন্তু খেঁদি মোড়লনি এবং তাদের অন্যান্য সদস্যরা ময়না-ডাকুর বিবাহিত সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না। এমন কোনো সামাজিক সম্পর্কের সেখানে কোনোই স্বীকৃতি নেই। খেঁদি ময়নাকে বলে, '...যেখানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে? পেট চালাবার জন্য পতেই বেরুতে হচ্ছে যকন, তখন কি আর সোয়ামী-ইস্তিরী ও-সব ভড়ং চলে?' এই হল পটলডাঙ্গার মানুষ। কোনো অনুষ্ঠান, আচার, ব্রত, কোনো শিকড়ের টানের উপলব্ধি সেখানে অনুপস্থিত। যে-কোনো অতীত টান ভুলে তারা শুধু বর্তমানে ভর করে থাকে। ময়নাকে তারা পাশবিক উল্লাসে ভোগ করে তাই। তারাশঙ্করের সঙ্গে যুবনাশ্বের এই যে তফাত, সেই তফাত কল্লোল-কালিকলমের সঙ্গেও তারাশঙ্করের শিল্পি মনের তফাত। তারাশঙ্কর যে মাটি-মানুষের কথা বলতে চান, ধরতে চান তার শিকড়সুদ্ধ। নাগিনীকন্যার কাহিনী-র 'চার আনা বাস্তবের সঙ্গে বারো আনা কল্পনা'-য় তারাশঙ্কর যোগ করেন তাদের মিথের শিকড়, তাদের সামাজিক রীতিকরণ। যে মিথ তৈরি করা মিথ হলেও তাতে এই শিকড় যোজনাটুকুর কাজ হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসেও দেখব সেই শিকড়েরই খোঁজ। ১৯৩৫-'৩৬-এ নবশক্তি পত্রিকায় কর্মরত থাকার সময়েই অদ্বৈত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত ও পালাগানের সন্ধান করতে থাকেন। আমাদের মনে হয় শুধু পত্রিকায় চাকরির দায় থেকেই নয়, গ্রামীণ সংস্কৃতির মূলের একটা খোঁজ তাঁর ছিল। তিতাস-এ সেই-সব গানের বেশ কিছু তিনি গ্রহণ করেছেন। এ-সবের মধ্যে লোকজীবনকে খুঁজে পেতেন তিনি। Good Earth-এর লেখিকা পার্ল বাককে উদ্দেশ্য করে অদ্বৈত লেখেন, 'যদি আসতে একবার আমাদের দেশে, তবে দেখতে পেতে, বই লেখার কি চমৎকার উপাদান— রাশি রাশি জমাটবাঁধা মালমশলা এখানে পড়ে আছে।' [২৬] তিতাসে অদ্বৈত সে-সব মালমশলা সমীকৃত করেছেন বলা যায়। পল্লীগান, পল্লী সংস্কৃতি নিয়ে যারা আলোচনা করে তাদের কাজের ধরনেও অদ্বৈত বিশেষ প্রীত ছিলেন না। তিনি চাইতেন যথার্থ সহানুভূতিশীল মন ও সংকল্প নিয়ে পরিশ্রমী কাজ করতে হবে। তিনি লিখেছেন, 'আজকাল যে-সকল পল্লী-কবি বা সাহিত্যিক পল্লী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন তাহাদের মধ্যে Originality মোটেই নাই, শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর শ্রমলব্ধ সংগ্রহগুলির ধুয়া ধরিয়াই তাঁহাদের কেহ কেহ সস্তায় নাম ছড়াইতেছেন। পল্লীর গানে

বা গাথাগুলি সংগ্রহপূর্বক উহাদের মধ্য হইতে পল্লীবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া কোনো কোনো নামকরা পল্লীকবি সাপ্তাহিক ও মাসিকের পৃষ্ঠায় সেগুলিকে বেমালুম নিজের নামে চালাইয়া দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না।' অদ্বৈতের মূলকথা সুদূর পল্লীতে গিয়ে নিরক্ষর পল্লীবাসীদের সঙ্গে থেকে তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে তবেই এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রাচীন চীনা চিত্রকলার রূপ ও রীতি প্রবন্ধে অদ্বৈত লিখেছেন, 'মানুষই হোক আর প্রকৃতিই হোক, একান্ত কাছে এসে না দেখলে তাকে ঠিক দেখা হয় না।' শান্তনু কায়সার মন্তব্য করেছেন, 'তিতাস রচনায় তাঁর ক্ষেত্রে ঐ মন্তব্য আক্ষরিক ও গভীরভাবে প্রযোজ্য।'[২৭] তাঁর অন্যান্য উপন্যাস প্রসঙ্গে এই কাছ থেকে না দেখার, বা সহানুভূতি সম্পন্ন হতে না-পারার অভিযোগে তাঁকে বরং অভিযুক্তই করা চলে। শুধু কাছ থেকে দেখার জন্যই নয়, নিম্নবর্গের জীবনালেখ্য লেখবার একটা মন তাঁর তৈরি হয়েছিল বলেই মনে হয়। তাঁর জীবন থেকেই যেন তিনি তার উপাদান সংগ্রহ করে নিয়েছেন। অদ্বৈতের মনে নিম্নবর্গের শরিক-চেতনা কীভাবে কাজ করছিল দুটি উপমা সূত্রে তা বুঝে নেওয়া যেতে পারে। স্পর্শদোষ একটি খেঁকিকুকুর এবং প্রায় কুকুরের তুল্য একটি মানুষের খাদ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মর্মান্তিক গল্প। যে মানুষ প্রায় মনুষ্যত্বের পর্যায়ে নেমে এসেছে (ভজা) তারই শেষ পর্যন্ত জয় হয় এবং 'নোংরা সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াইয়া খেঁকী হরিজনের মতো ব্যাকুল চোখে ভজার দিকে একবার তাকাইয়া চোখ নত করিল।' এই 'হরিজনের মতো' শব্দটা মরমে মার লাগানোর মতো। অদ্বৈতের ভাবনায় মানুষের স্তর থেকে নীচে নেমে গিয়েও যারা বঞ্চিত, তারাই হরিজন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের বর্জিত পাঠে এরকম আরেকটি উপমার সন্ধান পাই; 'ব্রাহ্মণের পাশে নমশূদ্রের মতো এই নৌকাগুলির পাশে তার ছোটখানি নড়াচড়া করিতেছে।' এই হচ্ছে অদ্বৈতের মন। যে-মন নিয়ে তিনি গ্রামীণ সংস্কৃতির মূলে যেতে চান, আবার চোখে দেখা গ্রামীণ নিম্নবর্গের কথা লিখতে চান। সব মিলে এক প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীর কথাই লেখেন তিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ মানুষের জীবনে সেই রাজনীতির প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছেন তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস ঢোঁড়াইচরিত মানস। তুলসীদাসের রামচরিত মানস উত্তর বিহারের অন্ত্যজ মানুষের কাছেও বিশেষ জনপ্রিয়। সেই রামচরিত মানস-এর আদলকেই বহিরঙ্গে গ্রহণ করলেন সতীনাথ। লোকজীবনের আখ্যান রচনা করতে গিয়ে ফর্ম সচেতন সতীনাথের মনে হয়েছিল, মহাকবির কাব্যের আড়ালে তিনি ঢোঁড়াইয়ের মতো প্রাকৃত জনের মানস-বিবর্তনের আলেখ্য রচনা করবেন। ঢোঁড়াই অবশ্য শুধু ঢোঁড়াই ব্যক্তিমাত্র নয়, ঢোঁড়াইদের কথাই বলতে চেয়েছেন সতীনাথ। ঢোঁড়াইদের কথা আজীবন লিখে যাওয়ারই সংকল্প ছিল সতীনাথের। সতীনাথ লিখেছেন, 'ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানস সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকেই চেয়েছিলাম এক গণ্ডূষ গল্পের মধ্যে ধরতে। ...একসময় ভেবেছিলাম, যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। মনে মনে এর পরের খণ্ডের নাম হবে ঠিক করেছিলাম উত্তর ঢোঁড়াই চরিত।'[২৮] যদিও সতীনাথ সে সংকল্প ত্যাগ করেছিলেন 'নিজের অপর্যাপ্ততা ভালোভাবে বোঝবার পর।' তাঁর অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ীর কথায় জানা যায়, '৩য় চরণে ঢোঁড়াই-এর স্বাধীনোত্তর রাজনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা ছিল। স্বাধীনতার পর দেশ শাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র...স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা— যা তাঁর পরবর্তীকালের ব্যঙ্গাত্মক ছোটোগল্পে প্রকাশ পেয়েছে— এই সবই লেখার ইচ্ছা ছিল— ঢোঁড়াই তৃতীয় চরণে।'[২৯] সতীনাথ জানিয়েছেন, ঢোঁড়াই তাঁর চেনা মানুষ। হিন্দি উচ্চারণে তার নাম ঢোঁড়হাই। এ নাম পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলে খুব চলে। বাংলা উচ্চারণে হয়েছে ঢোঁড়াই। সতীনাথ বাংলা উচ্চারণের 'ঢোঁড়াই' নামটাই নিয়েছেন 'ঐ নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্য।' উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যটিতে তাই লেখা হয়, 'ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরণে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়।' উচ্চবর্গের রাজনীতির দাবার বোর্ডে নিম্নবর্গ শুধুই সাধারণ ঘুঁটির মতো ব্যবহৃত হয়। তাদের নিষ্ক্রিয়তা, অপ্রতিরোধ, তাদের সমূহ ক্ষয় সূচিত করে। সতীনাথ ঢোঁড়াই চরিত মানস-এর মধ্যে সেই দিকটি উন্মোচিত করতে চাইলেন।

'আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু, তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর-গাড়ির চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাতমাটুলি থেকে সরাতে হল চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় ঐ শ্রেণীর লোকের চরিত্রে, যেখানে যা কিছু ভালো নজরে পড়েছিল, সেই-সব সদ্‌গুণগুলো দিয়ে তাতমাটুলির ঢোঁড়াইকে সাজাতে আরম্ভ করলাম।' যদিও ডায়েরিতে এক খসড়ায় ঢোঁড়াই সম্পর্কে সতীনাথ লিখেছেন 'Dhorai is the type, not average character'। উপন্যাসের ঢোঁড়াই অবশ্য ঠিক type চরিত্র নয়। তার রসবোধ, তার উপস্থিত বুদ্ধি, প্রতিবাদী চেতনা, সব নিয়ে ভালো-মন্দে ঢোঁড়াই প্রতিনিধিত্ব করে নিম্নবর্গের।

সতীনাথের এই উপন্যাসে একটি আঞ্চলিক আবহ তৈরি হয়েছে। 'প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু' দিতে চেয়েছেন সতীনাথ। এহেন ঢোঁড়াই বা ঢোঁড়াইদের কথা লিখতে সতীনাথ ভাদুড়ী সচেতনভাবে ফর্ম নিয়ে বিস্তর ভেবেছিলেন।

'একটি particular form— যা গরিব লোকদের নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (বামপন্থী) সাহিত্যে— সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার। আর উত্তর ভারতের এ যুগের (১৯৪৫-এ যা শেষ হয়েছে) তার পক্ষে অনুপযোগী হত আমার বিবেচনায়। ...রামায়ণের কাঠামো কৃত্রিম হলেও— এর tradition ভারতের লোকের মজ্জায় মজ্জায়। ...[কেন না] ঢোঁড়াইদের traditional values বিশেষ বদলায় নি। যতটা প্রত্যাশিত বা বইয়ে বলে ততটা বদলায় নি। জাত, সমাজ আর রামায়ণ। ...Ramayan, Mahabharat and Purans, present the psychology and character of our nation, as also its aspirations, blemishes and follies।' [৩০]

আমাদের মনে হয়, সতীনাথের এই চেতনা আসলে সাহিত্যে যে ভারতবর্ষের জনজীবনের স্পন্দন খোঁজার নতুন চেষ্টা চলছিল, তারই অনুসারী। উপন্যাসের এই নতুন প্রবণতার সঙ্গে প্রকরণও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। প্রকরণের দিকে তাকালে অনেক সময় তার বিষয় এবং প্রবণতা বিষয়েও কিছুটা ধারণা হতে পারে। প্রবণতার সঙ্গে প্রকরণকে তাই সমান গুরুত্ব দিয়ে এগোতে হবে। সতীনাথ নিম্নবর্গীয় জনজীবনকে ধরতে চেয়ে একটি ভারতীয় মহাকাব্যের আদলকে আশ্রয় করলেন, কেন না, তিনি জানেন, 'Form is nothing but the power to extract the fullest from the material।' [৩১]

সমরেশ বসুর উপন্যাসের বিষয়, পটভূমি বহুধাবিস্তৃত। লিখেছেনও প্রচুর— নগর ও গ্রামীণ পটভূমি নির্বিশেষে। তাঁর জীবনের মতোই তাঁর লেখাও বৈচিত্র্যময়। একসময় বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। পরে সরেও আসেন। প্রোলেতারিয়েতের জীবনের কথা কীভাবে আসবে সাহিত্যে, সে নিয়েও বামপন্থী সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর মনে একটা সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল। এক সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে সমরেশ বসুর তাত্ত্বিক বিসংবাদ ঘনিয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে সমরেশ বসু লিখেছেন, 'রাজধানী কলকাতায় দলগত সাহিত্যচিন্তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়, কিন্তু গঙ্গার এপার-ওপারের নরনারীদের বেঁচে থাকার বিভিন্ন চিন্তা ও ...যুদ্ধের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি, হচ্ছি, হব। ইত্যবসরে যেটুকু জেনেছি সেটুকু এক বিরাট সঞ্চয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' [৩২]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান এ চিঠি ১৯৫২-'৫৩-তে লেখা। তিনি তখন পরিচয়-এর সম্পাদক। বন্ধু ও কবি রাম বসু সমরেশের সাম্যবাদী চেতনা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'তার সাম্যবাদ প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। তার মূল আরো গভীরে। সহজ কথায় তাকে হয়তো বলা যায় ভারতীয় বাস্তবতায় সাম্যবাদের সন্ধান, কোনো মডেল নয়। ...পুঁথির সঙ্গে মিল খুব কম। সবচেয়ে বড়ো মিল আত্মার। "আদ্য অন্ত এই মানুষে তার বাইরে কোথাও নাই।" — এই ছিল তার মূল কথা।' [৩৩] রাম বসু যাকে বলছেন 'ভারতীয় বাস্তবতায় সাম্যবাদের সন্ধান' তাতে 'সাম্যবাদের সন্ধান' শব্দ দুটি নিয়ে মন্তব্য করা ঝুঁকিপূর্ণ; কিন্তু 'ভারতীয় বাস্তবতা'-র

খোঁজ সমরেশ বসুর ছিল, তা তো অনস্বীকার্যই। নিজের সাহিত্যজীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমরেশ লিখেছেন, 'আমার কাছে ব্রতকথার আকর্ষণ ছিল তীব্র, যা আমার মা বলতেন ঢাকা জেলার গ্রাম্য আটপৌরে ভাষায়, যে ভাষা ছিল স্নিগ্ধ, বলার ভঙ্গিতে থাকত বিশ্বাসযোগ্য অভিব্যক্তি। ...রোমাঞ্চকর, ব্রত অনুষ্ঠানের সেই পরিবেশ। পৌষের নিশাকালে অনুষ্ঠিত হত নাটাই চণ্ডীর ব্রত, বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে। ...কোনো এক অদেখা কোণ থেকে মায়ের স্বরে উচ্চারিত হত সেই কাহিনী, চলে যেতাম নতুন জগতে, ...সেই-সব ব্রতকথা ও কাহিনী শৈশবের হৃদয় ও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত, ...বন্ধুদের শোনাতে হবে সেই কাহিনী। আর, শোনাতে গেলেই কাহিনীর কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ রঙ বদলিয়ে যেত, গল্পের মুখের আদল কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে যেত। ...একে যদি প্রেরণা বলা যায়, তবে তার পদধ্বনি সেই শৈশবেই বেজেছিল, অবচেতনে; এবং সেই-সব ব্রতকথা ও কথকতার মধ্য দিয়ে।' [৩৪]

ঘনশ্যাম চৌধুরী ও পুষ্পল মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সমরেশ বসু বলেছিলেন, 'তার (ব্রতকথা) মধ্যেই আমরা কিন্তু নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ের একটা চেহারা পাই। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট আর অত্যাচারীর অত্যাচারের ছবি কিন্তু এই-সব প্রাচীন ব্রতকথায় এসেছে। এসেছে অবশ্য অন্যভাবে।' [৩৫] আমাদের মনে হয়, এইখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-র তুলনায় তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের উপকথা বা নাগিনীকন্যার কাহিনী-র সঙ্গে সমরেশ বসুর গঙ্গা-র অপেক্ষাকৃত নৈকট্য। বস্তুত, গঙ্গা আর হাঁসুলীবাঁক-নাগিনী কন্যা-য় বিস্তর তফাত। পটভূমি ও জনগোষ্ঠীও স্বতন্ত্র। তবু, গঙ্গা-র জলপটভূমির উপন্যাসেও আছে কিছু স্থলের জীবন পরিচয়, সংস্কার, মাছধরা মালোদের জাতিসত্তার পৌরাণিক প্রসঙ্গ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি-র স্থলজীবনের পরিচয়ে যা অনুপস্থিত। তারাশঙ্কর এবং সমরেশ বসুর উল্লিখিত উপন্যাসে দুটি বা তিনটিতে গোষ্ঠীমুখী আর গোষ্ঠীবিমুখী দুই রকম চরিত্রের দ্বন্দ্বই উপন্যাসের মুখ্যদ্বন্দ্ব। মনে হয় সমরেশের যে ভারতীয় বাস্তবতার খোঁজ তা তারাশঙ্করেরই উত্তরাধিকার বললে খুব ভুল হয় না। (প্রসঙ্গত, গঙ্গা উপন্যাসটি তারাশঙ্করকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল)। সমরেশ বসু : স্মরণ-সমীক্ষণ (পৃ. ২২৩)-এ দেবেশ রায় লিখেওছেন, "মালো সমাজের গ্রামের জীবনযাত্রার বর্ণনাতেও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র ছাঁচই সমরেশের অভিজ্ঞতাকে অবয়ব দেয়। প্রসঙ্গত, মনে পড়ছে গঙ্গা সম্পর্কে তারাশঙ্করের নিজের ধারণাটাও যে একইরকম ছিল, তা জানা গেল সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর একটি চিঠিতে।"

বলা যায় উপন্যাসে যে 'স্বাদেশিকতা'বোধের কথা বলেছেন সমরেশ, সে স্বাদেশিকতার মধ্যেই একাংশে নিহিত আছে দেশের প্রত্যন্ত কোনো কোনো জনজীবনের কথা। সমরেশ আগ্রহী ছিলেন সেই জীবনকে জানতে। মানুষকে জানতে চাওয়ার যে আবেগের কথা রাম বসু বলেছেন, জনজীবনগোষ্ঠীকে জানতে চাওয়া তারই অঙ্গ। [৩৬]

ক্ষেত্রসমীক্ষা কিংবা ব্যাপক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও সমরেশ তাঁর সেই স্বাদেশিকতা-র নান্দীপাঠ করেছিলেন। স্মৃতিচারণে লিখেছেন, "আমার কমিউনিস্ট মতবাদের মধ্যে কখনো স্বাদেশিকতাবোধ ছিল না। উত্তরঙ্গ উপন্যাসেই প্রথম জন্ম নিয়েছিল আমার স্বাদেশিকতাবোধ। তখন প্রথম চিঠি দিয়ে, আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, কবি বিষ্ণু দে। তাঁর দুটি কথা আমি এখনো মনে রেখেছি। এক : আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হল রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আপনার পরিচয় অতি ক্ষীণ। দ্বিতীয় : আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর সঙ্গমে।" [৩৭] বলাবাহুল্য গঙ্গা সেই সাগরসঙ্গম। তবে গঙ্গা তাঁর একটা 'অবশেসন'ও বটে। 'জগদ্দল-এ গঙ্গা-প্রসঙ্গ আছে। যুগ যুগ জীয়ে-তে 'গঙ্গার ধার ধরে বৈদূর্যকান্তি হাঁটে।' উত্তরঙ্গ-এ 'পলাতক সিপাহী হেঁটে এল আতপুরের ঘাটে। লোকে তাকে তুলে নিল মনসার বর পাওয়া ছেলে বলে। রাজপুত সিপাহী হল বাগদী লখাই...।'

গঙ্গা রচনার মালমশলা তিনি জোগাড় করেছিলেন এই আতপুর থেকেই। 'আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এঁদের সাহায্য ছাড়া গঙ্গা রচনা সম্ভব ছিল না।' [৩৮]

অন্যত্র বলেছেন, 'আমি যখন আতপুরে থাকতাম, তখন গঙ্গার ধারে, মালোপাড়া বলে একটি পাড়া আছে। আমি সে পাড়াতে প্রায়ই যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। ওদের নৌকা জাল এ-সবও ছিল।' [৩৯]

বন্ধু রাম বসুও লিখেছেন, 'আতপুরে থাকতে রোজ গঙ্গায় [সমরেশ] স্নান করতে যেত। গঙ্গাকে বুক দিয়ে ভালোবাসত। গঙ্গা তার কাছে মা। গঙ্গায় নামলে ছেলেমানুষের মতো উল্লাস।' বিশেষ করে সমুদ্রগামী গঙ্গা সমরেশের প্রিয় ইমেজ।

গঙ্গা তাঁর কাছে সত্যই একটা ইমেজের মতোও বটে। ভূমিকায় লিখেছেন, 'গঙ্গায় অনেক স্রোত বহে গিয়েছে। বহমানতা এখনো বর্তমান। আমিও সেই প্রবহমান স্রোতের যাত্রী এবং গঙ্গার নিরন্তরতায় বিশ্বাসী।' এইটুকু বলা যায়, গঙ্গা-র মধ্য দিয়ে একটি গভীরতর দার্শনিক জিজ্ঞাসাই আভাসিত হয়েছে। 'মানুষ কি নিরন্তর তার জীবনকে (বেঁচে থাকাকে) এক সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে? এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল গঙ্গার বুকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মাছ মারতে গিয়ে। মাছ 'ধরা' কথাটা তখনই অসত্য মনে হয়েছিল এবং মৎস্যজীবীদের আমি অভিহিত করেছিলাম 'মাছমারা' নামে। ...প্রকৃতই মানুষ জীবনকে সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে। ক্ষেত্র বিশেষে, চেহারা তার যত প্রিমিটিভ হোক, অনেক সমাজের উত্থানের শক্তি হয়তো সেখান থেকেই। অদ্ভুত ক্লান্ত মানুষ, কাঠফাটা রোদে, শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় গভীর রাত্রে, উজান ঠেলে চলেছে নদীর বুকে। ফাঁদ তার হাতে ধরা জলের নীচে; শিকার দৃষ্টির বাইরে, এমনই অনিশ্চিত, যে-সবই তার অনুভূতির অগম্য, ...প্রকৃতির নানা লক্ষণ, বংশগত অভিজ্ঞতা— যা তাঁর রক্তের মধ্যে মন্ত্রের মতো সঞ্চারিত! নিষ্ঠায় কঠিন সেই শিকার, অভুক্ত অসুস্থ নিরন্তর শিকারী জলের বুকেই মৃত্যুবরণ করে। ...সব পূর্ণতা সেইখানে।' [৪০]

সমরেশ-বন্ধু সোমনাথ ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণা থেকেও জানা যায় ১৯৫৪-তে নোবেল প্রাইজ পাওয়া হেমিংওয়ের The Oldman and the Sea সে-সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সমরেশকে। তখন তিনি প্রায় গানের ধুয়ার মতো অনুচ্চ আবৃত্তি করতেন, "You are killing me, fish, ...But you have a right to, ...brother come on and kill me. I don't care who kills who."— এরই প্রায় হুবহু প্রতিধ্বনি আছে বাংলা উপন্যাসটিতে।

অন্য দিকে 'বিষয়ান্তরের ভাবনা থেকেই তাঁর বাথান নিয়ে লেখার বাসনা হয়।' [৪১] বাথান নিয়ে লেখার কথা প্রথম উত্থাপন করেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। নদীয়া জেলার আঁটলে বাথানে সমরেশ গিয়েছিলেন অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত আর সোমনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বাথান-এর চলার পথের ম্যাপ এবং আনুষ্ঠানিক কিছু তথ্য সোমনাথ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ ছিল। কখনো এ বিষয়ে লিখবেন বলে তৈরি করেছিলেন। পরে সোমনাথবাবু ম্যাপ ও কাগজপত্র সমরেশ বসুকে দিয়ে দেন। যেগুলি সমরেশ বসুর কাজে লাগে। [৪২]

সুবোধ ঘোষের সাহিত্য প্রায় সর্বত্রগামী। উচ্চবর্গের রাজনীতির জটিল আবর্তে কীভাবে আদিবাসী শ্রমজীবীদের প্রাণান্তকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সুবোধ ঘোষ তাঁর শতকিয়া উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। এই আক্রমণ শুধুই অর্থনৈতিক আক্রমণ নয়। উচ্চবর্গের ধর্মপ্রচারের কৌশলে আদিবাসী জনজীবনের জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি কীভাবে পর্যুদস্ত হয় তাও তাঁর আলোচনার বিষয়। শুধু কথাসাহিত্যে নয়, মননশীল প্রবন্ধের মধ্য দিয়েও আদিবাসীদের এই সংকটের কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রবন্ধগুলিতে নৃ-তত্ত্বের উপর তাঁর গভীর চর্চার সাক্ষ্য রয়েছে। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন, "উপজাতীয় সমাজ ভেঙে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিজে ভেঙে গিয়ে বাইরের থেকে চাপানো একটা ব্যবস্থাকে তারা সহ্য করে চলেছে। আদিবাসীগোষ্ঠীর পঞ্চায়েত শক্তিহীন হয়ে গেল, গোষ্ঠীসর্দার তুচ্ছ হয়ে গেল। শ্রদ্ধাস্পদ গোষ্ঠীসর্দারের চেয়ে উর্দিপরা পাঁচ টাকা মাইনের চৌকিদার আদিবাসীর উপর ঢের বেশি প্রভুত্বের অধিকারী হল। এল দারোগা ও তহশীলদার, আদিবাসী-সমাজের ওপর অগাধ প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে। পঞ্চায়েতের অধিকার লুপ্ত হয়ে গেল, সামান্য একটা মুর্গী নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করতে আদিবাসী বাদী ও বিবাদীকে শহরে এসে উকীলবাবুর আর আদালতের শরণ নিতে হল। এর

মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার যোগ্য। বৃটিশ শাসনে উপজাতীয়দের গোষ্ঠী পঞ্চায়েত যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম পঞ্চায়েতও নষ্ট হয়েছে। বৃটিশের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক উগ্রতার ফলে সাধারণ ভারতবাসী এবং আদিবাসী উভয়েরই স্বয়ংচালিত আত্মশাসনের 'সাধারণতন্ত্র' নষ্ট হয়েছে। উপজাতীয় সমাজের সংহতি বিনষ্ট হওয়া, উপজাতীয়েরই বিশেষ দুঃখ নয়। এটা সাধারণ গ্রামীণ ভারতের দুঃখ।" অর্থাৎ, সুবোধ ঘোষ আদিবাসী সমাজের ভাঙনের মূলে দেখতে পেয়েছেন বৃটিশ শাসনতন্ত্রের কূট অভিসন্ধি, ধর্মান্তকরণ সে গোষ্ঠী ভেঙে যাওয়ার আরেক বড়ো কারণ। এই সমস্যাকে তিনি 'নিখিল ভারতীয় সমস্যা' বলে মনে করেছেন এবং তাঁর প্রস্তাব 'সারা ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষের পঞ্চায়েত প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে, আদিবাসী সমাজের সমস্যারও সেইসঙ্গে সমাধান হবে।'[৪৩]

আদিবাসী সমাজের সমস্যাকে কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা বলে তিনি মনে করেন নি।

আমাদের প্রবন্ধেও আমরা প্রথমাবধি বলবার চেষ্টা করছি নানা কারণেই ভারতবর্ষের গ্রামীণ কৌমজীবন ভেঙে পড়ারই আর-একটা দিক আদিবাসীদের অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট গোষ্ঠীজীবনেরও ভেঙে পড়া। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও সুবোধ ঘোষ তাঁর আলোচনায় নিয়ে এসেছেন।

প্রবন্ধে যে সুবোধ ঘোষকে তাত্ত্বিক অবস্থানে দেখি, শতকিয়া উপন্যাসে দেখি তারই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। আদিবাসী কৃষক চৈতন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ কেন হয়ে উঠল না এই উপন্যাসে— কোনো কোনো সমালোচক এমন প্রশ্ন তুলেছেন।[৪৪] আমাদের মনে হয়, সমূহের প্রতিবাদী চেতনায় উদ্‌ভাসিত করে তোলাটা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। গোষ্ঠীর অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়ার সত্যটা দেখাতে চান বলেই দাশু ঘরামির মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে শতকিয়া-র উপসংহার। দাশু ঘরামি তো শুধু ব্যক্তি নয়, তার মধ্য দিয়েই আদিবাসী কৃষক-সমাজের চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

প্রফুল্ল রায়ের ভাষ্য থেকে জানা যায়, পাঁচের দশকে আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাস রচনার আগ্রহ তৎকালীন বড়ো সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের মনেও উদয় হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস তখন সুতারকিন স্ট্রীটের নতুন ঠিকানায় উঠে এসেছে— সাগরদা [দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ] হঠাৎ একদিন বললেন, 'নাগা হিল্‌স যাবে? ...সাগরদা যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। বাংলা সাহিত্যে ট্রাইবাল পিপলদের নিয়ে ভালো উপন্যাস নেই বললেই হয়। আমি যদি [প্রফুল্ল রায়] যত্ন করে খেটেখুটে লিখতে পারি একটা কাজের কাজ হবে।"[৪৫] সাগরময়ের নামপ্রদত্ত সেই উপন্যাসই হল প্রফুল্ল রায়ের পূর্বপার্বতী। সাগরময়ের ঐ নির্দেশ থেকে সে-সময়ে আদিবাসী নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রবণতাব একটি দিক উজ্জ্বল হয়। কিন্তু শুধুই যে সম্পাদকের ইচ্ছা তা নয়, লেখকেরও অন্তর্নিহিত একটা তাগিদ ছিল ভারতবর্ষকে দেখার এবং চেনার। "মনে পড়ছে, পূর্বপার্বতী লেখার জন্য সেই যে নাগা হিলসে গিয়েছিলাম, তখন থেকেই আমাদের বিশাল দেশ— এই ভারতবর্ষকে দেখার এবং জানার একটা দারুণ ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ল্যান্ড অ্যান্ড পিপল চিরদিনই আমার কাছে দুর্দান্ত আকর্ষণের বস্তু। আসলে মানুষের টানেই নানা পটভূমিতে মানুষকে আবিষ্কার করতে বার বার আমি বেরিয়ে পড়েছি। ...গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে নানা ভাষার বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্র তাদের সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস; আশ্চর্যজনক তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি। এরা সবাই মিলে নানা রঙের সুতোর মতো জীবনেও এক রমণীয় টেক্সচার বুনে রেখেছে। এটা আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি।"[৪৬] অথচ প্রফুল্ল রায় তাঁর সারাজীবনে এমন আদিবাসী জীবন সন্নিধানে ক-বারই বা পৌঁছতে পেরেছেন? অন্তত তাঁর বিপুল সাহিত্য আয়তনের বিচারে? তার উত্তর সম্ভবত এটাই, 'একদিকে ভারতবর্ষ নামে এই বিশাল দেশ নিশির ডাকের মতো আমাকে বার বার দূরদূরান্তে নিয়ে গেছে। আরেক দিকে কলকাতা অসীম ক্ষমতায় আমাকে তার কাছে ধরে রেখেচে। কি আশ্চর্য শক্তি আর দৃঢ়তা এই শহরের।'[৪৭] একে কী বলব? লেখকের লেখক সত্তার উপর এও কি কোনো কেন্দ্র-প্রান্তের দ্বন্দ্ব? অস্বীকার করা চলে না এই দ্বন্দ্ব। এই ঔপন্যাসিক বয়ানের মধ্যেও রয়ে গেছে লেখকদের অবস্থানগত ঐ দ্বন্দ্ব। নিজেই নিজের লেখার মূল্যায়ন

করে প্রফুল্ল রায় লিখেছেন, 'আমি আমার দেখা এবং জানার উপর নির্ভর করেছি। সেখানে আমার দৃষ্টি অনেকটাই অবজেক্টিভ, বলতে দ্বিধা নেই আমার এই-সব লেখায় চিত্র বেশি, ঘটনা বেশি, আবেগ বেশি কিন্তু বিশ্লেষণ কম। ...আমার লেখায় প্রথম এবং শেষ কথা হল মানুষ। মানুষের দুঃখ সংগ্রাম, তীব্র প্যাশান আর আনন্দ, তাদের অস্তিত্বের সংকট বা আত্মানুসন্ধান— এ-সবই আমাকে লেখক হবার প্রেরণা দেয়। আজীবন মানুষ নামে এক মহাদেশকে আমি বার বার আবিষ্কার করে যাব।'[৪৮] পূর্বপার্বতী উপন্যাসের ভূমিকাতেও লেখক লিখেছেন, 'শ্বাপদসংকুল এই দেশটিতে মানুষের জীবনযাত্রা কি রকম। তাদের সমাজ কোন্ নীতিতে চলে, মৌলিক ও সামাজিক আচার-আচরণ কেমন— এ-সব সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই।' পূর্বপার্বতী সেই কৌতূহলের ফসল।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখালেখির ক্ষেত্রে আদিবাসী জনজাতি প্রসঙ্গ অন্যতম একটি দিক। কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোচবিহার শহরে আজীবন লেখালেখি করেছেন অমিয়ভূষণ। নানা লেখায় এবং সাক্ষাৎকারে কলকাতা থেকে এবং প্রাতিষ্ঠানিক লেখালেখির জগৎ থেকে আভিজাত্যপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখার ঘোষণা শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। সচেতনভাবেই তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র পথের যাত্রী। সে পথ-স্বাতন্ত্র্যে তিনি ডুবুরির মতো খুঁজেছেন ভারতীয় লোকপুরাণ। চাঁদবেনে উপন্যাসে পুরাণের যে বিনির্মাণ তার পিছনে ক্রিয়াশীল লেখক মনটির হদিশ পাওয়া যাবে পদ্মপুরাণ কথা প্রাচীন সাহিত্যের মর্ম প্রবন্ধে।[৪৯] লেখকের মনের যে আবেগ, লেখবার যে মন তা কীভাবে কাজ করে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, '[আবাল্য সঞ্চিত ঐ আবেগ] প্রকাশ করতে গেলেই গোষ্ঠী এবং কৌমের ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত ইমেজ এবং সিম্বলগুলির সাহায্য অপরিহার্য।'[৫০] অনেক উপন্যাসেই গোষ্ঠী বা কৌমের প্রসঙ্গ এনেছেন অমিয়ভূষণ। গড় শ্রীখণ্ড উপন্যাসে যেমন সান্দার উপজাতির প্রসঙ্গ আছে। তারাশঙ্কর যেমন নাগিনীকন্যার কাহিনী-তে বেদে সমাজের পরিচয় অনেকটাই তৈরি করে নিয়েছিলেন, অমিয়ভূষণও সান্দার উপজাতি-পরিচয়ে অন্যান্য উপজাতীয় চরিত্রের উপাদানে একটা মিশ্র আদল তৈরি করেছিলেন। যেমন, 'অপরাধপ্রবণ' বলে সান্দার উপজাতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে উপন্যাসে। কিন্তু সান্দাররা 'অপরাধপ্রবণ' বলে আদৌ চিহ্নিত ছিল কিনা বলা দুষ্কর। কেন-না, ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো জায়গায় সান্দার উপজাতির উল্লেখ থাকলেও সেখানে তাদের 'অপরাধপ্রবণ' বলে উল্লেখ করা হয় নি। আর ১৯১১-র সেন্সাস রিপোর্টে সান্দার জাতির কোনো উল্লেখ নেই। সান্দাররা ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এদের এমন একটি প্রবণতা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছিল। যাই হোক, কোনো উপজাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' হিসেবে দেগে দেওয়া তখন খুব বিস্ময়ের ছিল না। ফলে, মনে করা যেতে পারে সান্দারের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নয়, উপজাতীয় সমাজের একটা আদল হিসেবেই এই আদিবাসী জীবনকে উপন্যাসে গ্রহণ করেছিলেন অমিয়ভূষণ।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বিনদনি ও মাকচক হরিণ উপন্যাস দুটিতেও রাভা জনজাতির নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের থেকেও অনেক স্বতন্ত্র নির্মাণ ঘটেছে অমিয়ভূষণের কলমে।[৫১] তাহলে কি লিখিত ইতিহাসের চেয়ে অন্য কোনো মৌখিক-পরম্পরার উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন তিনি? মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে সে-কথা হলফ করেই বলা যায়, কিন্তু অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। একরকম আপাত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমা লগ্ন হয়ে থাকে তাঁর উপন্যাসে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রশ্নে।

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী কোনো কোনো জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত। এটি তাঁর ব্রত বলা চলে। তাঁর লেখালেখিও সেই সমাজ-বীক্ষণের আরেক মাত্রা। নিম্নবর্ণের তথা নিম্নবর্গের জীবনের উপর আধিপত্যকামী উচ্চবর্ণ ও বর্গের শোষণ-নিপীড়নের প্রতিবাদে লেখালেখি তাঁর অন্যতম আয়ুধ। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আমার লেখাগুলির বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়েই আমার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসকে তুলে ধরতে পেরেছি বলেই আমি মনে করব। প্রতিবাদের জন্য চীৎকৃত প্রতিবাদে আমার আস্থা নেই। আমার প্রতিটি লেখাতেই আমি তখনি প্রতিবাদকে বক্তব্য করে তুলি, যখন প্রতিবাদের প্রেমিস থেকে শুদ্ধতর, আরো

প্রয়োজনীয় কোনো প্রেমিসে, উত্তরণ সূচিত করতে পারি।'[৫২] ব্যাধখণ্ড উপন্যাস প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'এই উপন্যাসে আমি শবরদের জাতি পরিচিতি অনুসন্ধানের কাজে প্রথম ব্রতী হলাম।'[৫৩]

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে আদিবাসী জনচেতনা সম্পর্কে যেটা সবচেয়ে বেশি মনে হয়, তিনি এতদিনের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে কার্যত তার স্থানচ্যুত করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের এই বিনির্মাণ ও নবনির্মাণই নিম্নবর্গের ইতিহাসের আঁতের কথা। উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী তাই করে থাকেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে ইতিহাসের প্রসঙ্গ বারে বারে আসে। বস্তুত সে ইতিহাস আদিবাসী মানুষের কথ্যপরম্পরা বাহিত। সেই ১৩৮৩-তেই মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন, 'লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেন-না, একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোনো আকাশে। আমি বিশ্বাস করি, গণ ও সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাস-চর্চায়, ইতিহাস-চর্চা, আমার মতে, সাহিত্য স্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূলশিক্ষা।'[৫৪] আজীবনই এই সাহিত্য-প্রত্যয়ে অবিচল আছেন তিনি। সম্প্রতিকালেও বলেছেন, 'এই দুরাকাঙ্ক্ষ লেখক শুধুই অন্বেষণ করেছেন ইতিহাস, অলিখিত ইতিহাস, যা বইয়ে মেলে না। আমি সেই কবে এই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত যে জনবৃত্তের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। যে ইতিহাস লেখা হয় নি কখনো।'[৫৫]

কেন বার বার ইতিহাসের পটভূমির আবাহন থাকে তাঁর উপন্যাসে? কারণ ইতিহাসের পরম্পরার মধ্যেই তিনি জাতিটির পুনর্বাসন চান। ব্যাধখণ্ড-এর ভূমিকায় যেমন লিখেছেন, 'জাতিটিকে ইতিহাসে পুনর্বাসনের জন্য এই কথ্য পরম্পরার সন্ধান প্রয়োজন; যা একদা ছিল, আজ সন্ধান মেলে না।'[৫৬]

ব্যাধখণ্ড উপন্যাসে একটি প্রায় পুরাকল্পিক স্তর (মেঘবাহন-মেঘাবতী) ঐতিহাসিক স্তর (ষোড়শ শতক) এবং তার সঙ্গে রচনাকালের সময়স্তর (১৯৯৪)-কে একবিন্দুতে বেঁধে নেয় মহাশ্বেতার ইতিহাস বোধ। ব্যাধখণ্ড প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এক অর্থে এটি ১৯৯৪-এর ইতিহাস। নগর ও অন্ আদিবাসীর অগ্রসরণ, আদিবাসীর জমি ছেড়ে চলে যাওয়া, নিষ্ঠুর বনোৎসাদন, অরণ্যসন্তানদের অরণ্য অনুসন্ধান, মূলস্রোতের মানুষদের আদিবাসী সমাজ বিষয়ে মর্মান্তিক অজ্ঞতা, এ তো এই সময়ের সত্য।'

অন্যত্র লিখেছেন, 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা বইতে যা লিখেছিলাম, তা বিশ্বাসও করি। আদিবাসী জগৎ যেন এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ, যাকে আমরা জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে দিয়েছি।'[৫৭]

বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু উপন্যাসে তিনি চৈতন্য-ভাবান্দোলন পুষ্ট বাংলাদেশে একজন ব্রাত্য শিল্পীর চূড়ান্ত ট্র্যাজিক পরিণতির মর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন। জাতপাত ও বর্ণচেতনা কত প্রখর ছিল সেই 'আদ্বিজচণ্ডালে' প্রেমের যুগেও; এ উপন্যাসে তা দেখা গেল। অরণ্যের অধিকার এবং চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসেও ইতিহাসেরই পটভূমি। এই উপন্যাস দুটিতে আদিবাসী বিদ্রোহের প্রকাশ। বিদ্রোহে জনজাতিগোষ্ঠীর সংহত ভাবের প্রকাশ এই উপন্যাস দুটিতে। ব্যাধখণ্ড উপন্যাসে কেন্দ্রীয় কাহিনীতে কাল্যা-ফুলির শবরজীবনের পরিচয় আছে, তাদের গোষ্ঠীজীবনের কিছু পরিচয় আছে। অবশ্য তার থেকে বেশি আছে তাদের অস্তিত্ব-সংকটের কথা। বন্দ্যঘটী...তেও এই সংকটের পরিচয়। কাল্যার মতো কলহনও আগে থেকে বোঝে নি আনজাতকে বিশ্বাস করলে তা অস্তিত্বের পক্ষেও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

সাতের-আটের দশক থেকে যাঁরা জনজাতিগোষ্ঠী নিয়ে কিছু লেখালেখি করেছেন তাঁরা বোধ হয় ভিন্নতর একটি লেখক-সংজ্ঞান বহন করছিলেন। বয়সের দিক থেকে এঁরা প্রায় স্বাধীনতার সমবয়সী। লেখালেখি যখন থেকে করছেন ততদিনে দেশ অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এঁরা বাল্য বা কৈশোরে দেশভাগ-উদ্বাস্তুপ্রবাহ দেখেছেন। মরিচঝাঁপি-দণ্ডকারণ্য শুনেছেন বা দেখেছেন। খাদ্যসংকট দেখেছেন। বেকারি দেখেছেন বা উপলব্ধি করেছেন। সবচেয়ে বেশি নিশ্চয় তাঁদের নাড়া দিয়েছে নকশাল-আন্দোলন। বামপন্থী আন্দোলনের প্রচার, প্রসার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার হতাশা, পার্টিভাগ সব-কিছুরই সাক্ষী এঁরা। নির্বাচন নামক আধুনিক যজ্ঞে কীভাবে জনজাতিরাও 'মূল্যবান' হয়ে ওঠে কিছু সময়ের জন্য, তার পরও অবস্থা বৈগুণ্য

কেমনভাবে বজায় থাকে, গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতি কেমন করে ভেঙেচুরে দেয় তার প্রাচীন চেতনা, তার জায়গা নেয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী— এও তাঁদের স্বচক্ষে দেখা। একালের এমন কিছু লেখকই জনজাতিগোষ্ঠীর কথা লিখলেন। তথাকথিত মূলস্রোতের বাইরে গিয়েই লিখলেন।

এই উত্তরকালের লেখকদের একটা বড়ো অংশ গ্রামজীবনের পটভূমিতে উপন্যাস, ছোটোগল্প লিখেছেন। অবজ্ঞাত মানুষদের সাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত শাসিত সাহিত্য ধারাকে গ্রহণ না করে গ্রামীণ অন্ত্যজ সাহিত্যধারা তৈরি হয়েছে সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, কানাই কুণ্ডু, শচীন দাশ প্রমুখের লেখায়। তারাশঙ্করকে তাঁদের পূর্বসূরি বলে উল্লেখ করেছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং ভগীরথ মিশ্র। কী অর্থে তারাশঙ্কর তাঁদের পূর্বসূরী? সাধন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তারাশঙ্করের ক্রণটোপ বদলে গেলেও মূল দ্বন্দ্বগুলো আমাদের তৃতীয় বিশ্বের সমাজ থেকে মুছে যায় নি বলে, তারাশঙ্করের সাহিত্য আজও ভীষণ জরুরী; বা আজই ভীষণ জরুরী বলা হয়। আজ যারা ছোটোগল্প উপন্যাস চর্চা করছেন এই মহৎ লেখকের কাছে কীভাবে ঋণী? আপনকালের ব্যক্তিজীবনের ও সমাজজীবনের দ্বন্দ্বগুলো কীভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে দেখা দরকার, যা তারাশঙ্কর পাঠে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। অবশ্যই ভাষা, উপস্থাপনা এবং কাহিনী রেখা স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির পর, মিডিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে আধুনিক ও উত্তর আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর যেভাবে Folk motiveগুলো কাজে লাগিয়েছেন, তা উত্তর সাধকদের কাছে অবশ্য শিক্ষণীয়। পাঁচ হাজার বছরের উন্নত সভ্যতার লেখকদের ঐতিহাসিক পরম্পরা কী বহন করতে হয়, কালোপযোগী করে, তা বোধ হয় তারাশঙ্করের Text পুনঃ পুনঃ পাঠে উঠে আসে।' [৫৮]

বাংলাদেশের নিসর্গপত্র পত্রিকার তরফে অভিজিৎ সেনের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, 'কৃষি কেন্দ্রিক জনজীবন (আসলে গ্রামীণ জনজীবন কেন্দ্রিক অর্থে) বাংলা উপন্যাসে এত উপেক্ষিত কেন?' এর উত্তরে অভিজিৎ সেন বলেছিলেন, 'যুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশভাগ প্রবল নগরায়ণ, লেখকদের শ্রেণীহিসেবে আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রকাশের সুযোগ সুবিধার জন্য লেখকদের গ্রামত্যাগ, রাজনীতির মেরুবিন্যাসে নানা বিপর্যয়, পাঠকদের রুচির পরিবর্তন, সাহিত্যের বাজারে একচেটিয়া পুঁজির দাপট এবং রুচি নির্ধারণে বাজার অর্থনীতির ভূমিকা ইত্যাদি অসংখ্য কারণকেই এর জন্য দায়ী করা হয়।' ঐ সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ সেন আরো বলেছিলেন, 'বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে আমরা কেউ কেউ সত্যিই একটা বিকল্প ধরন খুঁজছি।' [৫৯]

সাধন-অভিজিৎ প্রমুখ যাঁরা এই বিকল্প ধরন খুঁজছেন তাঁরা বিভিন্ন লেখা এবং সাক্ষাৎকারে স্মরণ করেছেন তারাশঙ্কর-অমিয়ভূষণ-মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখকদের। এই তিন পূর্বজ কি একইভাবে অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারেন? মনে হয় তা নয়। তারাশঙ্করকে কী অর্থে নবীনদের প্রয়োজন তা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যে রয়েছে। অমিয়ভূষণ আপোসহীন লিটল্ ম্যাগাজিনের লেখক। যিনি সাহিত্যে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বলে স্বয়ং এক প্রতিষ্ঠান! অন্য দিকে মহাশ্বেতা দেবী সেই লেখক যাঁর লেখা তাঁর সামাগ্রিক সামাজিক কৃত্যেরই আরেক প্রকাশ। সাহিত্যে যাঁরা শিল্প-কৌশল নিয়ে ভাবিত, মহাশ্বেতা দেবী তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেন। অভিজিৎ সেনও বালুরঘাটের বিবর্ণ মুখোশ পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন সোচ্চারভাবে মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে পাঠক মনে করলে, তাঁর পরামর্শ, পাঠক যেন সেই অংশগুলি বাদ দিয়ে পড়েন।

আমরা লক্ষ করেছি সমরেশের মধ্যে তারাশঙ্কর কীভাবে ভরে থাকেন। উত্তরঙ্গ পাঠে হাঁসুলীবাঁকের স্মৃতি উঠে আসতেও পারে। সেও বাহ্য কথা। বলতে চাইছি, তারাশঙ্কর থেকে সমরেশ হয়ে সাধন-অভিজিৎ পর্যন্ত একটা পরম্পরাই তৈরি হয়। অথচ প্রত্যেক লেখকই স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র তাঁদের লেখার দর্শন। তবু যে এই পরম্পরার মিল, হয়তো সেই মিল উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যধারায় গ্রামীণ মানুষের অস্তিত্বের মূলে যেতে চাওয়ার আকুলতার।

দিবারাত্রির কাব্য পত্রিকার সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় [৬০] নিজেদের উপন্যাস-ভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে একালের লেখকদের একাংশ যে-কথা বলেছেন, তাতে তাঁদের লেখক-প্রবণতার দিকটি স্পষ্ট হয়। তাঁরা সবাই যে গোষ্ঠী-জীবনভিত্তিক বাংলা উপন্যাস লিখেছেন এমন নয়, তাঁদের লক্ষ্যে আছে গ্রামজীবন আর অন্তেবাসী মানুষ। গ্রামজীবনের সাদামাটা আখ্যান নয়, কৌমস্মৃতি এবং লোকচর্যার কেন্দ্রভূমি থেকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তাপ নিয়ে জেগে ওঠা এক-একটা গ্রাম-পরিচয় পাই একালের বেশ কিছু উপন্যাসে। আটের দশকের এক বিশেষ লেখকগোষ্ঠীর উপন্যাস ভাবনাতেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ঐ পত্রিকায় অভিব্যক্ত কয়েকজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসভাবনা নীচে উদ্ধার করা হল।

ভগীরথ মিশ্র লিখেছেন, 'জটিল বিষয়কে, তার যাবতীয় গভীরতা অক্ষুণ্ণ রেখে, সোজা সরলভাবে প্রকাশ করবার কৃৎকৌশল ...সেটাই আমাদের ভারতীয় প্রকাশ শৈলী; আমাদের নিজস্ব আঙ্গিক। ...আমার উপন্যাস-ভাবনায় আরো একটি ব্যাপার কাজ করে। সেটা হল, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ আদ্যন্ত একটি গ্রাম। একটি মাত্র গ্রাম। এমন-কি তার শহর নগরগুলোও ওই গ্রামেরই বর্ধিত রূপ। কাজেই, একজন লেখক হিসেবে গ্রামভিত্তিক অন্তত একটি লেখা না লিখলে কোনো লেখকেরই কলম শুদ্ধ হয় না। ...এ দেশের বারো আনা পাঠক এবং সমালোচক ঔপনিবেশিকতার ফ্লেভারধন্য আধা-শিক্ষিত, উচ্ছিষ্টবিলাসী নাগরিক মানুষ।...'

ভগীরথ মিশ্রের অঙ্গীকার, 'প্যাচপেচে প্রেমের উপন্যাস লিখে গরিবদেশের কাগজ-কালির অপচয় ঘটাব না।'

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব গল্প আছে, প্রতি জনগোষ্ঠীও তাদের জীবন-যাপিত গল্পের ডালপালা ছড়িয়ে বৃক্ষের সমগ্রতায় ... কোনো কাহিনীর গড়ন পেতে চায়। সে বৃক্ষ কাণ্ডের ছাল বাকলে ... সামাজিক ইতিহাস দাগ কেটে যায়।'

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরিই বলেছেন, 'লাতিন আমেরিকার কার্পেন্তিয়ার, বোর্হেস, হুয়ান রুলফো, মার্কেজ পড়ার পর উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা গিয়েছে আমূল বদলে।' তাঁর 'কখনো কখনো মনে হয় বিশ্বজগতের হাজারো জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি নিয়েই তো লেখা যেতে পারে এক বা একাধিক উপন্যাস। তাদের জীবনযাপন আলাদা, মুখের ভাষা, কথন ভঙ্গি, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসন সবই অন্যরকম। সেই জীবনযাপন লেখা সম্ভব শুধু সেখানে বসবাসকারী কোনো লেখকের পক্ষে। কিন্তু লেখক তো ভূরি ভূরি জন্মায় না। প্রতি জনগোষ্ঠীতেই এক বা একাধিক লেখক জন্মাবে তা ভাবা বাতুলতা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ হয়তো একজনই জন্মায়। তাহলে কে লিখবে এত জনগোষ্ঠীর কথা! ...কোনো জনগোষ্ঠী নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে তার এক বা একাধিক চরিত্রের মনোজগৎ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে এক নতুন ধরনের উপন্যাস। ...নেশা ও পেশার সূত্রে আমাকে এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে। ...আমার মনে হয়েছিল সুন্দরবন এলাকা এ রাজ্যের এক এবং অদ্বিতীয় জায়গা যেখানকার জীবনযাপন গোটা ভারতবর্ষের অন্য বহু জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জনগোষ্ঠীকে বাঙালি পাঠকের সমানে হাজির করা খুব জরুরী।'

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সাঁওতালদের ভাষার কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এও তাঁর অনুভব যে 'কোনো জনগোষ্ঠীকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুলে আনা খুবই কঠিন কাজ।' অবশ্য ষড়রং নামের একটি এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের উপাখ্যান রচনা করেন তিনি।

সাহিত্যিক নলিনী বেরার কাছে ফেলে আসা গ্রাম এক-একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সেই 'দ্বীপের' স্মৃতিচারণায় তিনি নস্টালজিক। লেখক লিখেছেন, "লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, দেখা হয়, একটু-আধটু কথাও বলি। সেই গন্ধ সেই 'নস্টালজিয়া'কে সম্বল করে সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, দ্বীপের আপামর অধিবাসী আত্মীয় পরিজন ভূগোল, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু নদ-নদী, পাহাড়-টিলা বন-ডুংরি গাছপালাসহ তাবৎ ভূখণ্ডকে যতটুকু পারি প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায়

খনন করে আবিষ্কার করতে চাই উপন্যাস রচনার অজুহাতে। উপন্যাসের আখ্যান ভাগকে বাঁধতে চাই মহাভারত কী বিষ্ণুপুরাণের ঠাস বুনোটে। ...চাইব সেই উপন্যাস লিখতে যার শুরুটা আমি করব কিন্তু কালে কালে রামায়ণ-মহাভারতের মতো 'ধরতাই' করবে পরবর্তী আখ্যানকারেরা, টীকাভাষ্যকারেরা।'

একটি দীর্ঘ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে [বর্ধমান, ৬ এপ্রিল, ২০০৫] নলিনী বেরা আমাকে বলেছিলেন, শবরচরিত উপন্যাস কোথায় শেষ হবে তিনি জানেন না। এ পর্যন্ত এর চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসের লোধা-শবররা তাঁর একান্ত পরিচিত। তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে চান শবরদের অনাবিষ্কৃত ভুবন। আবিষ্কারকের আনন্দ থেকেই লোধাদের নিয়ে তিনি উপন্যাস লেখেন। বাস্তবের দেশকালকে বাঁধেন উপন্যাসের ক্রণটোপে। নলিনী বেরার কাছে এই নির্মিত-বাস্তবই আসল বাস্তব। এই বাস্তব চেতনার পিছনে তিনি স্বীকার করেন আমাদের উপকথা লোককথা-র প্রেষণা এবং লাতিন আমেরিকার সাহিত্য-ভুবনের নতুন বাস্তবতার খোঁজকে।

এখানেই আমরা লক্ষ করি, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাবনার পিছনে ছিল ইউরোপীয় উপন্যাসের আদর্শ। কল্লোলযুগে সেই আদর্শ হল ন্যুট হামসুন, জোয়ান বয়ার বা জোলার সাহিত্য। আর সাতের-আটের দশকে যাঁরা গ্রামীণ জনজীবন নিয়ে উপন্যাস লিখলেন তাঁদের প্রেরণার অন্যতম স্থল হল লাতিন আমেরিকার সাহিত্য। উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য ধারার সঙ্গে বোধ হয় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সাহিত্য-ভাবনাগত মিল খুব স্বাভাবিক।

যাই হোক, সাতের-আটের আলোচিত লেখকদের উপন্যাস-ভাবনা থেকেই স্পষ্ট হয় তাঁদের উপন্যাস রচনার প্রবণতা ও প্রকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। নলিনী বেরার উক্তিতে স্পষ্ট প্রকরণের দিক থেকেও একটি দেশজ রীতিকে গ্রহণ করতেই তিনি উৎসাহী। তারাশঙ্কর থেকে গ্রামলগ্ন, দেশচিহ্নময় উপন্যাস রচনার যে সূচনা তারই আরেক রকম পরিণতি এই-সব কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে দেখতে পাই। নিসর্গ পত্রে বজলুল করিম বাহারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিজিৎ সেন জানিয়েছিলেন, 'শরৎচন্দ্র, মানিক কিংবা বিভূতি নয়, আমাকে সব থেকে আকৃষ্ট করেছিলেন তারাশঙ্কর।' [৬১]

সাত-আটের দশকের আমাদের উল্লিখিত লেখকরা সাহিত্যে বিকল্প ধরন খুঁজছেন বাংলা উপন্যাসে। কেমন সেই ধরন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিজিৎ সেন মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা প্রবন্ধে। 'ইউরোপীয় নয়, বরং তৃতীয় বিশ্বের গল্প উপন্যাস কবিতার সঙ্গেই এই নূতন বিষয় ও রীতির মিল।' [৬২] সে প্রেরণার মূল উৎসস্থল মনে করা যেতে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেই।

তথ্যসূত্র :

১. রাহুল সাংকৃত্যায়ন সংগৃহীত বিনয়শ্রী রচিত চর্যাগীতির প্রকীর্ণ পদ। চর্যাগীতি-পদাবলী চর্যাচর্য টীকা সমেত, সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ. ২১৭
২. সুকুমার সেন -কৃত টিপ্পনী, আগের সূত্র, পৃ. ২২৯
৩. মনুসংহিতা, ১০/৫১
৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলিত ও সম্পাদিত দলিতের আখ্যানবৃত্ত-এ উল্লেখ আছে, কৈবর্তদের মতো মালো-ঝালোও প্রাচীন মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী— মনুসংহিতায় মল্ল ও ঝল্ল— এই দুটি নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতো গবেষকরা মনে করেন মালোরা কৈবর্ত জনগোষ্ঠীরই শাখা। মনুসংহিতায় ঝালো-মালোদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণ আর ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সংসর্গজাত সন্তান বলে। দলিতের আখ্যানবৃত্ত, মৃত্তিকা, ১৪১১, পৃ. ৮৬
৫. শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা উপন্যাসে অন্ত্যজ নিম্নবর্গের প্রসঙ্গ অনেকখানি আছে।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৫শ মুদ্রণ, ১৪১১, পৃ. ২৯৭-৩১২
৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল-যুগ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৫৭, পৃ. ১৭
৮. তদেব, পৃ. ৪৭
৯. তদেব, পৃ. ১৫৫
১০. আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ পরে সাহিত্য রূপ ও সাহিত্য-সমালোচনা নামে প্রবাসী (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)-তে প্রকাশিত হয়।
১১. রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা।
১২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, সাহিত্য করার আগে, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭, পৃ. ৩০
১৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্প-বিচিত্রা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯২, পৃ. ৩৪৫
১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল-যুগ, পৃ. ১৮০
১৫. তদেব।
১৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৫৯
১৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রন্থিত তারাশঙ্কর রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৬, পৃ. ১৮৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৮৮
১৯. ঐ
২০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, সাহিত্য করার আগে, নিউ এজ প্রাঃ লিঃ, পৃ. ২৬-২৭
২১. বাখতিনের পরিভাষা Polyphonic ও Heteroglossia-র অনুবাদে বলা হয়েছে বহুস্বরিক ও বহুরূপময়।
২২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সম্পাদকের কথা, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তকবিপণি, ১৯৯৮। পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ নেই।
২৩. পদ্মানদীর মাঝি প্রসঙ্গে বন্ধু সুবোধ চৌধুরীকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছিলেন, মানিকবাবু বড়ো আর্টিস্ট, মাষ্টার আর্টিস্ট, কিন্তু বাওনের পোলা— বড়ো রোমান্টিক। শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮, পৃ. ১০৬
২৪. পরিচয় পত্রিকায় পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায় হিরণকুমার সান্যাল এই উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখেন, 'একেবারে ভানুমতীর ভেলকি। ...সবই অলীক-অবাস্তব। অসাধারণ মুন্সিয়ানার জোরে যে-উপকথা বিস্তৃত হয়েছে দীর্ঘ চারশো পাতা ধরে, শেষ পর্যন্ত তা উপকথাই থেকে গেল। জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি বহন করে তা উচ্চস্তরে কথাসাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পাবল না।' ঐ বছরই কয়েকমাস আগে পরিচয়, শারদীয় ১৩৫৪ সংখ্যায় গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা প্রবন্ধে বিষ্ণু দে তারাশঙ্করের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি, প্রাকৃত ভাষায় শিল্পায়ন প্রভৃতির প্রশংসা করে লেখেন, 'প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের প্রাকৃতিক জীবন আমাদের মশগুল করে। হয়তো শেষটা খুব স্বচ্ছ নয়, বিহ্বল। যে বিহ্বলতা আমাদের জীবনেরই যুগেরই।'
২৫. যোগভ্রষ্ট প্রথমে যবনিকা নামে প্রকাশিত হয় উল্টোরথ পত্রিকার ১৩৬৬ শারদসংখ্যায়। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষ্ণু দে শ্লেষার্থে বলেন, 'একি উল্টোরথারূঢ় তারাশঙ্কর!'— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। সত্তর দশক, ২৮ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৩। বুদ্ধদেব বসুর An Acre of Green Grass-এ তারাশঙ্করের উদ্দেশ্যে মন্তব্য 'বিভ্রান্তি' এবং পরিচয়-এ হিরণকুমার সান্যালের মন্তব্য 'বিভ্রম' দুই-ই বিষ্ণু দে-কে পীড়িত করেছিল।
২৬. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ভারতের চিঠি পার্ল বাককে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ৫৬৬
২৭. শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন সাহিত্য ও অন্যান্য, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮, পৃ. ৮৭
২৮. সম্পাদক শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ৪৯২
২৯. তদেব, পৃ. ৪৯১
৩০. তদেব, পৃ. ৪৯৮
৩১. ঐ

৩২. আতপুর থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির অংশ। ১ মে লেখা, কিন্তু সালের উল্লেখ নেই।
৩৩. রাম বসু, হে বন্ধু বিদায়, সমরেশ বসু : স্মরণ-সমীক্ষণ, চয়নিকা, ১৯৯৪, পৃ. ১২০
৩৪. সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্য, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ১৭১
৩৫. ঘনশ্যাম চৌধুরী ও পুষ্পল মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সমরেশ বসু কথাগুলি বলেছিলেন। উদিত গল্পসংকলন, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ১৯৪-১৯৫
৩৬. সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত যোগের কথা লেখক বলেছিলেন নিতাই বসুকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে। আমার আয়নার মুখ, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৯
৩৭. সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্য, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ১৭৭
৩৮. সমরেশ বসু, ভূমিকা, গঙ্গা।
৩৯. সমরেশ বসু, আমার আয়নার মুখ, মৌসুমী প্রকাশনী, পৃ. ৬৮
৪০. সমরেশ বসু বলেছিলেন, 'আমার চোখের সামনেই আমি মৃত্যু দেখেছি। কতকগুলো ব্যাপারে ওরা ভীষণ বিশ্বাসী যেমন, অলৌকিক, আধিভৌতিক ব্যাপারে ভীষণ বিশ্বাসী। কারুর সাধ্য নেই শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে এদের ফেরায়।' —আমার আয়নার মুখ, মৌসুমী প্রকাশনী, পৃ. ৬৯
৪১. অশোকরঞ্জন সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণা, সমরেশ বসু : স্মরণ-সমীক্ষণ, পৃ. ১৫২-১৫৩
৪২. সমরেশ বসু : স্মরণ-সমীক্ষণে সম্পাদকীয় পাদটীকায় বলা হয়েছে, 'বাথান-এর চলার পথের ম্যাপ এবং আনুষঙ্গিক কিছু তথ্য সোমনাথ ভট্টাচার্যের সংগ্রহে ছিল। কখনো এ বিষয়ে লিখবেন বলে তৈরি করেছিলেন। সমরেশ বসু সোমনাথ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন— তাঁর আর লেখার পরিকল্পনা আছে কি না। সোমনাথ এ বিষয়ে লেখার কথা আর ভাবছেন না বলে ম্যাপ এবং অন্য কাগজপত্র সমরেশ বসুকে দিয়ে দেন। এগুলি সমরেশ বসু কাজে লাগিয়েছিলেন।' পৃ. ১৫৩
৪৩. সুবোধ ঘোষের উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে সুবোধ ঘোষ প্রবন্ধাবলী, নাথ পাবলিশিং, পৃ. ২৮৪ থেকে।
৪৪. বারিদবরণ চক্রবর্তী, বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃ. ৩৯৯-৪০০
৪৫. প্রফুল্ল রায়, আয়নায় নিজের মুখ, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ. ১৭৭
৪৬. তদেব, পৃ. ১৭৯
৪৭-৪৮. ঐ
৪৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার, লিখনে কী ঘটে, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ. ১০৮-১১৯
৫০. তদেব।
৫১. বিনদনি ও মাকচক হরিণ উপন্যাসের প্রকাশ যথাক্রমে শারদীয়া সপ্তাহ (১৩৯২) ও শারদীয় দৈনিক বসুমতী (১৩৯৮) পত্রিকায়।
৫২. মহাশ্বেতা দেবী, আমি/আমার লেখা, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ. ৯১
৫৩. মহাশ্বেতা দেবী, ভূমিকা, ব্যাধখণ্ড।
৫৪. মহাশ্বেতা দেবী, আমি/আমার লেখা, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ. ৯০
৫৫. মহাশ্বেতা দেবী, আমি আর আমার দুরাকাঙ্ক্ষী ভ্রমণ, শারদীয় আজকাল, ১৪০৯, পৃ. ৫৬০
৫৬. বর্তিকা, ১৯৮২-র লোধা-শবর সংখ্যায় লোধারা নিজেরাই লিপিবদ্ধ করেছে তাদের পরম্পরাবাহিত ইতিহাস।
৫৭. মহাশ্বেতা দেবী, ভেরিয়ার এল্যুইন নির্বাচিত রচনার মুখবন্ধ, সাহিত্য আকাদেমি, ২০০১
৫৮. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : উত্তর সাধকের দৃষ্টিতে, কথাপট, শিল্পভাষা আকাদেমি, পৃ. ৪৮
৫৯. নিসর্গপত্র, ৯ বর্ষ সংখ্যা (জুলাই ১৯৯৪)-র জন্য সাক্ষাৎকারটি নেন অঞ্জন সেন।
৬০. দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা ৩, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৩২৩-৩৭৬
৬১. অভিজিৎ সেন, নিসর্গপত্র, জুলাই ১৯৯৪, পৃ. ১৭৫
৬২. অভিজিৎ সেন, মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা, নিসর্গপত্র, জুলাই ১৯৯৪, পৃ. ১৮৫

—

লীলা মজুমদার : টুকরো স্মৃতি

ভবতোষ দত্ত

আমি তখন কলকাতায় থাকি। আকাশবাণীতে মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম করতে যেতাম। এ রকম একটি প্রোগ্রাম উপলক্ষে লীলা মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। লীলাদি তখন আকাশবাণীতে প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিলেন।

তাঁকে দেখে একটুও মনে হয় নি, তিনি একজন অফিসার। একটু মোটাসোটা চশমা-পরা একজন সম্ভ্রান্ত গৃহিণী। আমাকে প্রথমেই তুমি বলে সম্বোধন করলেন। হাতে ছিল কলম, সামনে খোলা ছিল কাগজ— কিছু একটা লিখছিলেন। তাঁর ঐ হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে মনে হল আমি কোনো সরকারি কাজে নয়, এসেছি যেন মাসীমা-কাকীমার কাছে। তাঁকে দেখে ভেতরে ভেতরে একটু অবাকই হয়েছিলাম— সরকারি কাজে এরকম ঘরোয়া অভ্যর্থনা আশাই করি নি।

আমার সংকোচ কেটে গেল। কলকাতার আকাশবাণী গৃহ যে আমার নিজেরই বাড়ি হয়ে উঠল। বসে বসে গল্প করলেন কিছু পুরোনো স্মৃতি, কিছু মজার ঘটনা।

সেদিনের পরে তাঁর সঙ্গে আমার আরো যোগাযোগ হয়েছে। তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়িতেও গিয়েছি। সেদিন তো বেশ ভালো করেই খাইয়ে দিয়েছিলেন। দিদি যেমন করে ভাইকে খাওয়ায়।

সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে, আর মনে হয় লীলাদির স্নিগ্ধ ব্যবহারের সঙ্গে তাঁর লেখা গল্পের আবহাওয়ার কোথায় যেন মিল আছে।

আমরা ছেলেবেলায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গল্প পড়তাম। কৈশোরে সেই-সব গল্প নানা অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নে আমাদের নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। লীলাদির এক জ্যাঠামশায় কিংবা কাকা কুলদারঞ্জন রায়ের 'আশ্চর্য দ্বীপ' আমাদের কৈশোর-হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। কত অদ্ভুত বিচিত্র আকস্মিক ঘটনা ঘটত সেই সব গল্পে! সেই সব কিশোর-কাহিনী আর লীলাদির লেখা কাহিনীতে কোনো মিল ছিল না। লীলাদির গল্প আর-এক নতুন রসের স্বাদ এনে দিয়েছিল। তার ধরনধারণই আলাদা। হেমেন্দ্রকুমার-কুলদারঞ্জনের গল্পগুলি আমাদের বাঙালি জীবনের অভ্যস্ত রূপের গল্প নয়— বিদেশী ইংরেজি সাহিত্যের ছায়া ছিল তার মধ্যে।

ঐ সব অ্যাডভেঞ্চার, ভৌতিক ব্যাপার, গোয়েন্দা-কাহিনী আমাদের এই কাকা-জ্যাঠা দাদা-দিদিদের নিয়ে সাদামাঠা জীবনে অভিনব বলেই মনে হয়েছে। সেই অভিনবত্বের আকর্ষণেই আমরা সে-সব পড়তাম। তার স্বাদই ছিল অন্যরকমের।

লীলাদির লেখা ছোটোদের গল্পগুলি ছিল আমাদের অত্যন্ত চেনা জীবনের গল্প। আমাদের এই শহুরে জীবনের শুধু নয়, আমাদের রোজকার সংসারের অত্যন্ত চেনা জীবনযাত্রার মধ্যে যে কৌতুক বিস্ময় শিশুচিত্তকে দোলা দিয়ে যায়, লীলাদির গল্প তারই সৃষ্টি।

সেইজন্যেই তাঁর লেখা গল্প পড়লে মনে হয় সুকুমার রায়ের কথা। সুকুমার উদ্ভট রসের গল্প লিখতেন। 'উদ্ভট' অর্থে অপ্রাকৃত বা অলৌকিক নয়। সুকুমারের প্রসঙ্গে উদ্ভট অর্থ অপ্রত্যাশিত। পাগলা দাশুর মাথায় এমন-সব প্ল্যান আসত, যাতে সবাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত— পাঠকের মধ্যেও হাসির রোল উঠত।

লীলাদির গল্প উদ্ভট রসের গল্প নয়, কিন্তু পরিচিত পরিবেশের মধ্যে শিশু-কিশোরদের আচরণে কত স্নিগ্ধ মাধুর্য আমাদের মধ্যে প্রসন্নতার সৃষ্টি করে, লীলাদি সে দিকটাই দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর গল্পের পরিবেশ আমাদের সংসারের পিসিমা-জেঠিমা দাদা-দিদি ও ঝন্টু-পিন্টুদের নিয়ে। এই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শিশু-কিশোরের কত কৌতুক, কত স্নিগ্ধতার চপল সৌন্দর্যকে তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন— কোনোটাকেই মনে হয় না অবাস্তব অপরিচিত বা কষ্টকল্পিত।

তাঁর গল্পগুলি তাঁর চারিত্রিক স্নিগ্ধতারই সৃষ্টি যা দেখে লীলাদিকে আমার পরম আত্মীয় বলে মনে হয়েছিল সেই প্রথম দিনেই।

শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার

অপর্ণা ভট্টাচার্য

শতবর্ষে পৌঁছে চলে গেলেন শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার। ছোটোদের জন্য কেন লেখেন সে-কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন— 'ছোটোদের জন্য লিখি বলেই আমার ছোটোবেলাও ফুরিয়ে যায় না। তা ছাড়া না লিখে করিই বা কী? মজাগুলো যে নাক দিয়ে কান দিয়ে চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে উপচে পড়ে।' এই উপচে পড়া মজার আনন্দ কী সেটা আমরাও আমাদের শৈশবে তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে অনুভব করেছিলাম। আর একালেও তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে এখনো আমরা আমাদের সেই ছেলেবেলাটাকেই যেন ফিরে পাই।

শিশুদের মন ভরানোর জন্য চেনা জগতের চারপাশ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে আশ্চর্য স্বাদ মশলা মাখিয়ে অভূতপূর্ব রেসিপি তৈরি করার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় তাঁর বই-এর পাতায় পাতায়।

তাঁর গল্পে মানুষেরা তো বটেই এমন-কি বন-জঙ্গল পাহাড়-নদী পশু-পাখি সবাই এক-একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। বিষয়ের বাছবিচার নেই। চোর ডাকাত দারোগা পুলিশ, ভূতপ্রেত, রাক্ষস খোক্কস, সবাই বেশ ঘরের লোক। ডাকাত আছে ডাকাতি আছে কিন্তু কোনো মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি নেই। ভয়ঙ্করের আবির্ভাব ঘটিয়ে ছোটোদের মনে ভয় ধরাবার চেষ্টা তিনি করেন নি। তাহলে কি আর পদিপিসি এত কাণ্ডকারখানা করে উঠতে পারতেন!

মাঘী পূর্ণিমার রাতে গোরুর গাড়ি চড়ে ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে পিসি চলেছেন নিমাই খুড়োর বাড়ি। খুড়োর মেলা সাঙ্গোপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা। কথায় কথায় ভগবানের নাম আর কী দানধ্যান! কিন্তু এ-সবের জন্য তো টাকা চাই। কোথা থেকে পেলেন খুড়ো এত টাকা? পিসি সেই রহস্য উদ্ধারে চলেছেন। যেতে যেতে পড়লেন ডাকাতের হাতে। ডাকাতরা পদিপিসির সঙ্গী রমাকান্তকে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে সাড়ে সাত আনা পয়সা আর নস্যির কৌটো কেড়ে নিল। থান পরা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাঁক দিয়ে পদিপিসি বললেন— 'ওরে বাটপাড়েরা, গাড়োয়ান রমাকান্ত সবাইকেই তো আধমরা করে ফেললি, গোরুগুলোরও কিছু বাকি রেখেছিস কিনা জানি না এবার তোরাই আমাকে নিমাই খুড়োর বাড়ি কাঁধে করে পৌঁছে দে।' ব্যাস ডাকাতেরা জব্দ। নিমাই খুড়োর কুটুমকে তারা ধরেছে এটা জানতে পারলে খুড়ো তাদের ছাল ছাড়িয়ে নেবে বলে পায়ে পড়ে হাউমাউ কান্না। তারপর আর কী। নিজেরাই সব কিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে রমাকান্তের গায়ে হাত বুলিয়ে গাড়োয়ানকে নগদ চারটে পয়সা ঘুষ দিয়ে খুড়োর বাড়ির পথ দেখিয়ে দিল। গোলাগুলি, ছোরাছুরি, খুনোখুনি ছাড়াই পিসি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কার্যোদ্ধার করলেন। গোটা বই জুড়ে পিসির এই বুদ্ধির খেলা। খুড়োর কাছ থেকে গয়না ভরা বর্মি বাক্স বাগিয়ে নতুন লাল আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে পদিপিসি বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু সব জিনিস ঠিকঠাক নামিয়েও বগলে চেপে নিয়ে আসা বর্মি বাক্স বগল থেকেই হাওয়া। যেটা বেরিয়ে এল সেটা আসলে পানের ডিবে। হাওয়া বলে হাওয়া! সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গা মায় গোরুগুলোকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তা পাওয়া গেল না। বাক্সের ভেতর গয়না আছে জানার পর বাড়ির লোকেরা নাওয়া খাওয়া ভুলে খুঁজেছিল— যাদের মধ্যে বিষম ভালোবাসা ছিল তারাও পরস্পরকে সন্দেহ করতে লেগেছিল। বাক্স শেষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল ঠিকই, তবে একশো বছর পর। ওই যে স্বর্গে যাবার আগে পদিপিসি হঠাৎ ফিক করে হেসে বললেন— 'এই রে! বাক্সটা কী করেছিলাম এদ্দিন পর মনে পড়েছে।' বলেই চোখ বুঝলেন। এবার বোঝ ঠ্যালা। একশো বছর ধরে চলল বাক্স খোঁজার পালা।

হলদে পাখির ডানার ঝাপট একবার যার গায়ে লাগে তার আর ঘরে তিষ্ঠনো হয় না। ঝগড়ুও তাই দুমকার ঘর বাড়ি বন-জঙ্গল পাহাড় ছেড়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু দুমকার মতো আশ্চর্য জায়গা আর কোথাও নেই। ঝগড়ুদের দুমকায় হয় না, এমন আশ্চর্য জিনিস নেই। দুমকার পাহাড়ে ছাগল চরাতে গিয়েই তো ঝগড়ু জেনেছিল গাছেরা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলে বেড়ায়। বোগি অবশ্য এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় নি। কিন্তু এটা তো সত্যি গাছেরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের বংশ বিস্তার ঘটে নানাভাবে। ঝগড়ুর ভাই গাছের ডালটা ভেঙে ছুঁড়ে দিয়েছিল। কাঁটাগাছের সেই ডালই তো আবার মাটির রস পেলে একদিন ডালপালা মেলবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য হচ্ছে যে কাঁটাগাছ ঝমরুর পায়েই কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছিল। ও অন্যায়ভাবে ছাগলকে লাথি মেরেছিল। বড়ো পাথর সরিয়ে দিতেই তার তলাকার ছোটো বড়ো পোকারা তাদের সংসার ফেলে পালাতে লাগল। বাচ্চারা মরে গেল— ডিমগুলো ভেঙে গেল। সেইজন্যই কাঁটাগাছ ওকে শাস্তি দিয়েছিল। অরণ্যভূমিরও একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে বৈ কি। ব্যথা দিলে ব্যথা পেতে হয়। ঝমরুর পায়ের বড়ো বড়ো রক্তের ফোঁটায় আর গাছের ভাঙা ডালের গায়ে জমে থাকা জমাট রসের একই ব্যথা। ঝমরু সেটা বুঝতে পারে নি। তাই শাস্তি পেতে হল।

ঐ দুমকাতেই তো আছে সেই আশ্চর্য হলদে পাখি। কেউ তাকে দেখতে পায় না। তার পা নেই, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। কোনো শেয়াল বা কুকুর যদি হলদে পাখি খেয়ে ফেলে তাহলে মানুষ হয়ে যায়। এও তো বোগি, রুমু বিশ্বাস করতে চায় নি। জানোয়ার কখনো মানুষ হয়! কিন্তু ঝগড়ু বলে তাদের গাঁয়ে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের দেখলেই চেনা যায়। রুমুর তখন মনে পড়ে যায় ওরকম লোক তাদের এখানেও আছে। পণ্ডিতমশাই-এর গিন্নি রোজ সন্ধেবেলায় আমরুল পাতা তুলতে আসেন। ওপরে চোখ তুললে চোখে আলো পড়ে। চকমকি পাথরের মতো ঝকঝক করে। পাটকিলে রঙের চোখের মণি তার মধ্যে সোনালি রঙের সবুজ রঙের ডুরি ডুরি কাটা মনে হয়। ঝিনুকের মতন পাতলা কানের ওপর দিকটা গোল না হয়ে খোঁচা মতন।

রুমু বোগির অত আদরের নেড়ি কুকুর ভুলো তো সেই ভুলই করল। তিনদিন পর যখন ফিরে এল তখন ওর মুখের কোণে লেগে থাকা হলদে পালকটা রুমু দেখতে পেয়েছিল। তখনি একটু সন্দেহ হয়েছিল। তার পরেই তো ঝগড়ুর ঘরের দাওয়ায় বসানো কালো ছেলেটাকে দেখতে পেল— খালি গা, পাটকিলে রঙের চোখ আর বড়ো বড়ো দুটো কান মাথা থেকে পাখনার মতো আলগা হয়ে আছে, উপর দিকটা ছুঁচলো। ভুলোও আর ফিরে এল না। যা বোঝার তা তো বুঝতে বাকি রইল না। ঝগড়ুর কথা আর তো অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বোগি রুমুর মন যে মানে না। বুনো হাঁসেরা যখন ঝাঁক বেঁধে একসঙ্গে আকাশে উড়ে যায় ছেলেটা তখন আকাশের দিকে দু'হাত তুলে কাঁদে। রুমু তখন বলে— দাদা আগেই তো ভালো ছিল। বোগি ছেলেটার কাছে গিয়ে ঝাঁকি দিয়ে বলে,— 'কেন খেইছিলি হলদে পাখি, কে বলেছিল খেতে?' রুমুর বড়ো কষ্ট হয়। ভুলোকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। মানুষ হয়ে ও মোটেই খুশি হয় নি।

উপায়ও আছে জানা গেল। জানোয়ার থেকে যেমন মানুষ হয়, মানুষ থেকেও জানোয়ার হওয়া যায় নিদুলি মন্ত্রের জোরে। আর তার জন্য চাই পাঁচ ঠ্যাঙে মাকড়সা আর সোনা রুপোর মাদুলি। আদরের ভুলোর জন্য রুমু সব করতে পারে। ভুলোর কষ্ট সহ্য করা যায় না যে। মাদুলির গুণে ভুলো ফিরে এল। কিন্তু সুযোগ বুঝে প্রথমেই ঝগড়ুর পায়ে কামড়ে দিল। দেবেই তো। তার জন্যই তো ভুলোর এই দুর্দশা আর হেনস্তা। মানুষ জন্তুর চেহারা নিলেও জন্তু তো আর তাই বলে মানুষের চেহারা নিতে চায় না। এ কথাটা রুমু বোগি ছাড়া কে বুঝবে। আর হলদে পাখি? তার নাম তো ভালোবাসা। ভুলোর মুখের কোণে ছোট্ট একটি পালক হয়ে লেগে থাকে। আর রুমুর কান্নাভেজা চোখই তাকে দেখতে পায়।

মানুষ আর না-মানুষেরা অনায়াসে চলাফেরা করেছে লীলা মজুমদারের লেখার জগতে। ভূতের গল্পের অপদেবতারাও তাদের উপসর্গ সরিয়ে দিয়ে উপদ্রব উৎপাতের বদলে মানুষের উপকারই করেছে। ভূত বলে

যে কিছু নেই এটা তো সত্যি। অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করলেও এরা কিন্তু অন্ধকার জগতের অপরাধী নয় মোটেই। তাছাড়া বেচারা ভূতেরা এখন রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। নিরিবিলি বাগান ঘেরা পোড়ো বাড়ি আর পড়ে থাকতে দিচ্ছে না প্রোমোটার ভূতেরা। আসল ভূতেরা এখন যায় কোথায়!

নটে আর গুরু তেপান্তরের পারের বিশাল বাড়ির ভূতেদের তাড়াতে গিয়ে যাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল— সেই ছানা ভূতেদের মতো কৃতজ্ঞ আর উপকারী ক'জন মানুষ হয়। এক ঝুড়ি কচুরি, কাঁচকলার আচার, আলুর চাট, জিবেগজা— সব চেটেপুটে সাবাড় করে দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তার পরই কাছে এসে বলেছে— বলুন আপনাদের জন্য কী করতে পারি। ওই কটা সামান্য কচুরির বিনিময়ে যা করে দিল তা নটে-গুরুর সাধ্যেও ছিল না। অত বড়ো বাড়ির সমস্ত দেয়াল জুড়ে হরিনাম লিখে দেবার পর কোথায় যে অদৃশ্য হল। ভোরবেলা গোটা বাড়ির ত্রিসীমানাতেও তাদের দেখা মিলল না। উদ্বাস্তু কলোনির ছেলে বলে যাদের ভেবেছিল তারা যে আসলে ভূতের ছানা একথা একবারও নটেদের মনে হয় নি। আর মনে হবেই বা কী করে। ঐ রোগা রোগা হাড় জিরজিরে চোখ কোটরে ঢোকা ছেলেগুলোর সঙ্গে খেতে না-পাওয়া হাড়-হাভাতে উদ্বাস্তু কলোনির ছেলেদের কোনো পার্থক্য আছে নাকি।

বাড়ির বড়োদের আপত্তি উপেক্ষা করে নারকেল নাড়ু আর চন্দ্রপুলির লোভে ধিঙ্গিপিসির সঙ্গে উলুবেড়ের বাড়িতে না এলে তো সে বাড়ির এমন আশ্চর্য ভূতেদের সঙ্গে সমুর সাক্ষাতই ঘটত না। ও বাড়িতে নাকি ভূত আছে। এটা ওটা সব সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। তা যে বাড়িতে বারো শরিকের বাস আর সবার পেটে খিদে সেখানে তো এমনটা হতেই পারে। সমুর তো ভূতে বিশ্বাসই নেই। কিন্তু উলুবেড়ের পোড়ো বাড়িতে ভূত আছে এবং তারা গুপ্তধন রক্ষা করে। সমুর কৌতূহল সেখানেই— ভূতেরা কেন গুপ্তধন আগলায়। ধিঙ্গিপিসি কিন্তু ভূতের কথা মানতে রাজি নয়। যারাই সমুকে ভূতের কথা বলেছে,— পিসি তাদের বলেছে— 'ভূত কি গলায় সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে বেড়ায় যে দেখলেই চেনা যাবে। ভূতেতে মানুষেতে যদি কোনো তফাতই না থাকল, তবে আবার ভূত কিসের?'

তেরো শরিকের তেরো উঠোন নিয়ে উলুবেড়ের পোড়ো বাড়ি। একটি লম্বা গলিতে তেরোটি দরজা দিয়ে যে যার ঘরে ঢোকে। তা সে যাই হোক সমুর বাবার দেওয়া নারকেল পাটালি খোয়া ক্ষীর আরো কত কিছু সব পিসি সমুর সাহায্যে ভাঁড়ারে দুটো লোহার মিটসেফে তুলে ফেললেন।

সন্ধেবেলা সুজির মোহনভোগ তৈরি করে চারভাগের এক ভাগ তুলে রেখে ধিঙ্গিপিসি বললে— শরিকদের চটাতে নেই, একসঙ্গে উঠি-পড়ি। রেকাবিতে রাখা হালুয়ার দলা আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে বার করা একটি পয়সা সমুর হাতে দিয়ে বললে— 'পালোটের বউকে দিয়ে খিড়কি বন্ধ করে আয়। সূর্য ডোবার পর এ বাড়িতে আর কেউ আসে না।' মাথায় ঘোমটা বড়ো বড়ো দাঁতওয়ালা পালোটের বউ একগাল হেসে হাত পেতে পয়সাটা নিল। অসভ্য একপাল ছেলেমেয়ে নিমেষের মধ্যে রেকাবি খালি করে অদৃশ্য হয়ে গেল। পালোটের বউ প্রতিদিনই পিসির কাছ থেকে একটা করে পয়সা পায় আর সঙ্গে মুড়কি, বাতাসা যাই হোক। পালোটের বউ মানুষটা নাকি বড়ো ভালো। পিসিকে প্রায়ই ইলিশ মাছ, পায়রাচাঁদা এনে দেয়। পিসি তো বলেছে ওরা ভারী গরিব— দু' বেলা রান্না করা ভাত পর্যন্ত পায় না। তাহলে ইলিশ মাছ পায় কোথায়? তাছাড়া অন্য শরিকেরা তো কোনোদিন কোনো ভাগ পায় না। তবে পিসি বলে পালোটের বউকে পিসির ঠাকুমা একটি করে পয়সা দিত— তার শাশুড়িও দিত। এ বাড়িতে বাস করতে আসা ইস্তক পিসিও দেয়।

কিন্তু সে রাতে পিসি পালোটের বউকে বলল লক্ষ্মীর ঝাঁপি শেষ— খাজনার দায়ে এ বাড়ি নিলেম করে ভেঙে ফেলা হবে, পালোটের বউ চোখ মুছে বিদায় নিল। আর পরের রাতে ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনা। যথারীতি সন্ধেবেলা পয়সা দিতে গিয়ে হাঁ। অসভ্য ছেলেমেয়েগুলো রথ বানিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বক দেখাতে দেখাতে আসছে। দশটার কাঁধে আটটা, তার ওপর ছটা, চারটে, সবার ওপর দু'টো, তাদের

মাথায় বিশাল বস্তা। এগিয়ে এসে বস্তাটা সমুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ে সমু চোখ তোলার আগেই হাওয়া। গলি চুপচাপ। গেল কোথায়।

থলির মধ্যে পুরোনো টাকা পয়সা মোহর কত কী। সব ঋণ শোধ হল, ভাগ হল, বাড়ি সারানো হল। কিন্তু পালোটের বউ আর অসভ্য ছেলেমেয়েগুলোকে তো আর দেখা গেল না। গুদামের ঘরে নাকি তারা থাকত, তা গুদামের লোকেরা বলল— কোনোদিন তাদের চোখেই দেখে নি। বাবা যখন সমুকে নিতে এসেছিলেন তিনতলার বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তুলোট কাগজের হিসেবের খাতা পেয়েছিলেন। তাতে দেড়শো বছরের পুরোনো তারিখ দেওয়া। রোজকার হিসাবের শেষে লেখা কটি কথা— 'পালোটের বউ-এর প্রাপ্য ৫।" তার মানে পাঁচ গণ্ডা অর্থাৎ এক পয়সা। দু'বেলা পেট পুরে খেতে না পাওয়া গরীব ভূতেদের মানুষ বললে বোধ হয় ছোটো করা হয়। ধিঙ্গিপিসি এই শুভাকঙ্খী শরিককে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন।

সত্য যে কোথায় শেষ হয়, আর স্বপ্ন যে কোথায় শুরু হয় তা কি কেউ জানে? কিন্তু লীলা মজুমদারের গল্পের স্বপ্নগুলো স্বপ্নের রাজ্য ঘুরে ফিরে আবার মাটির সত্যে এসে মিশে গেছে। দুঃখভরা বেদনা নিয়ে তাঁর কোনো গল্প শেষ হয় নি। আশাভঙ্গের বেদনায় শিশুদের মন বিষণ্ণ করে তোলা নয়— স্বপ্নপূরণের আশার আনন্দোজ্জ্বল ছবি তিনি শিশুদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'বাতাসবাড়ি'তে তিনি সেই ছবিই লিখেছেন।

মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে কত কল তৈরি করে চলেছে। কিন্তু তার হৃদয় যদি যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করে শুধু যন্ত্রমাত্র হয়ে দাঁড়ায় তাহলে মানুষই মানুষের দুঃখের কারণ হবে। আবিষ্কারের নেশায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে। এই গল্পে তাই তিনি পাশাপাশি দুটি চরিত্র এনেছেন। পাদ্রী আর লামা। প্রকৃতি আর বিজ্ঞান। বড়ো লামা নরবু পম্পাদের বলে— 'বলি, কী খাবি, কী পরবি, কোথায় শুবি— এছাড়া কি তোদের মুখে কথা নেই? ও-সব কি আবার একটা দরকার নাকি?' পাদ্রী তখন নরম গলায় বলে— 'আহা পেটে খেলে পিঠে সয়। আগে ওসব দরকার মেটাও, তার পর না হয় কানের মধ্যে অচেনা গান শুনবে।' দুলেও তো পৃথিবীর দুঃখী মানুষদের দুঃখ দূর করবার জন্য সূয্যিকল তৈরি করেছেন। সূর্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করা শক্তিই একদিন পৃথিবীর দুঃখী মানুষের সব অভাব দূর করবে। বিজ্ঞান মানুষের কাছে আশীর্বাদ হবে অভিশাপ নয়। 'বাতাসবাড়ি'তে ঢোকার আগে পর্যন্ত কেউ তো বুঝতেই পারে নি কেমন সে বাড়ি। বাড়ি তো নয় সগ্‌গ। ছিমছাম তক্‌তক্ করছে, না-গরম না-ঠাণ্ডা, কেমন একটা ফুলের গন্ধ, পাখির গান।

কিন্তু শূন্যে ভেসে থেকে শুধু নিজেদের সুখভোগ নয়। নিচে দুঃখী মানুষদের জন্য ঘরে ফিরতে হবে। ঘরে ফিরে গ্রামের সব মানুষের অভাব ঘুচে যাবার পর দুলে তার নোটবইয়ের পাতায় পৃথিবীর সব মানুষকে সাহস দিয়ে রাখল। 'পৃথিবীতে যখন মানুষ থাকবার জায়গা কুলোবে না, কয়লা ফুরোবে, তেল ফুরোবে, তখন যেন কেউ ভয় না পায়। এই আমি রেখে গেলাম আরো ভালো বাতাসবাড়ির নকশা; সূর্যকলের নিয়মকানুন, খিদের বড়ির রন্ধনপ্রণালী' ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। পুনশ্চে আছে— গোপন তথ্য জানার পর পৃথিবীর সুখের দিন আসার আগে সমুদ্রের নিচে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে এবং বহু লোক ভেলা ভাসিয়ে জলের উপরে বাস করবে।

'বড়পানি' গল্পের কাণ্ড, হলদে পাখির পালকের রুমু, চিড়িয়াখানার বিশুদের সরল কোমল মনগুলির পেছনে রয়েছে স্রষ্টার মনে পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীর মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। শুধু কল্পনা দিয়ে তা তৈরি হয় না। 'কল্পনা যতই উদ্ভট হোক তার গোড়া খুঁড়লে একটা বাস্তব শিকড় পাওয়া যায়। যারা সরল গাছের পাতার সোঁ সোঁ শব্দ শোনে নি, পাহাড়ে নদীর উঁচু পাথরের ওপর থেকে ছোটো মাছসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে নি, ধনেশ পাখির কোটরে বাবা-মার যত্নে ছানাদের বড়ো হয়ে ওঠা দেখে নি, বাঘের গল্প, ভূতের গল্প ডাকুর গল্প, শোনে নি বা দেখলেও শুনলেও মনে রাখতে পারে নি বা সেই-সব দেখে শুনে তখন নিজের মনে কী হয়েছিল তাও ভুলে গেছে'— ছোটোদের গল্প লেখা তাদের কম্মো নয়। ছোটোদের

জন্য লিখতে গেলে ছবি লিখতে হয়। সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী লীলা মজুমদার।

কিন্তু কোথায় পেলেন এত খোলা আকাশ মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে যা আরো অনেক উঁচুতে উঠে আছে, পাহাড়ের উঁচু চূড়োও যার নাগাল পাচ্ছে না। রহস্য আর রোমাঞ্চে-ভরা এমন গহন অরণ্য? কিংবা নটে মামা, গুণুপণ্ডিত, ছোট্‌ঠাকুরদা, উন্‌গুরুর মতো এমন গুবগুবে মজা ভরা চরিত্রগুলো? এর সন্ধান পেতে হলে আমাদের যেতে হবে 'আর কোনোখানে' 'পাকদণ্ডী'র পথ বেয়ে। তাঁর কথায়— 'আমার ছোটোবেলাটা কেটেছিল শিলং পাহাড়ে। সে শহর তখন অন্যরকম ছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নিরিবিলি, পাখির ডাক আর সরলবনের পাতার মধ্য দিয়ে বাতাস বইবার সোঁ সোঁ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই। সারাদিন বাড়ির পেছনের পাহাড়ি নদীর কুলকুল আর তার পেছনে বনের মধ্যে কুকু পাখির কু কু ডাক। ...হাড় কাঁপানো শীত, মন ভোলানো বসন্ত আর গ্রীষ্ম, তার আশ্চর্য বর্ষা আর ফল-পাকানো শরৎ-হেমন্তের কুয়াশা, ফুলের বাহার, মেঘ, রামধনু, ছোটো ছোটো বন্যার সঙ্গে মৌমাছি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, পাখি, জোঁক, সাপ, শুঁয়োপোকা, চামচিকা, বাদুড়, শেয়াল, খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে আমাদের চারদিকের দৃশ্যমান আর অদৃশ্য জগতে এমন ভিড় করত যে, তার মধ্যে নিজেদের পা রাখারই জায়গা খুঁজে বের করাও মাঝে মাঝে মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কেবলই মনে হত এটা ওদেরই জায়গা, আমাদের একটু দেখেশুনে চলতে হবে।'

জীবনের সুন্দর মধুর বিধুর স্মৃতিগুলি পাকদণ্ডীর পাতায় পাতায় ধরে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে তিনি সেগুলিকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে অনবদ্য করে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মায়েরা তিনটি বোন মা-হারা হয়েছিলেন পাঁচ, তিন, দু'বছর বয়েসে। এরপরেই বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। ভিন্ন তিনটি পরিবারে তিনটি কন্যা স্থান পেয়েছিলেন।— মা বলতেন— 'নিজের মায়ের কথা মার মনে পড়ত না, খালি মনে হত একটা বন্ধ দরজা ওপর থেকে শিকলি তোলা। তার বাইরে মা আর বড়ো মাসিমা দাঁড়িয়ে আর বড়ো মাসিমা মাকে বলছেন, "ঐ ঘরে মা আছে। ওরা আমাদের মার কাছে যেতে দিচ্ছে না।" লাফিয়ে লাফিয়ে কেবলই শিকলি খোলার চেষ্টা করে কেঁদে মাকে বলছেন, "ওরে তুই কাঁদছিস না কেন? তুই ছোটো তুই কাঁদলে ওরা নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেবে আমি যে বড়ো হয়ে গেছি।" এখন ভাবি ওই মা-মাসীর মেয়ে হয়ে সারা জীবন ছোটোদের জন্য বই লেখা ছাড়া আমার অন্য উপায় কি ছিল?'

মজার কথাও আছে। 'পাড়ার বেড়ালদের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান ছিল হুলোটা। ওর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাছ ভেজে শিকেয় তুলে রাখত রান্নার ঠাকুর যামিনীদা। শিলং-এ তখন রোজ মাছ পাওয়া যেত না। হুলোও হন্যে হয়ে স্কাই লাইটে চড়ে সেখান থেকে লাফ দিয়ে মাছ নামিয়ে কতক খেত কতক নষ্ট করত। ভয়ানক রাগ হত। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমি বসে আছি, একেবারে আমার গা-ঘেঁষে হুলো যাচ্ছে। হাতে কোনো হাতিয়ার নেই। কিন্তু এমন সুযোগ তো ছাড়া যায় না, দিলাম কষে হুলোর গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। দিদি শুত আমার পাশে মস্ত বড়ো একই লেপের তলায়। চড়টা গিয়ে ওর গালে পড়তে ঠাণ্ডা মানুষটা রেগেমেগে উঠে বসল। ও কী হচ্ছে, আমাকে চড় মারছিস্ কেন? আমি বললাম— ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে তোকে মারছি রে, ও সত্যিকারের চড় নয়। দিদি বলল আমিও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে তোকে মারছি বলে আমাকে দু' ঘা দিয়ে পাশ ফিরে শুল।'

'ছোটোবেলায় আনন্দ করবার কিংবা দুঃখ করবার খুব বেশি উপকরণের দরকার হত না। যখন আমার বছর পাঁচেক বয়স হবে তখন একবার মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়ে দেখি একজন লোক হার্মোনিয়াম বাজাচ্ছে, একজন তবলা বাজাচ্ছে আর বাকিরা করতাল বাজিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে "প্রেম সলিলে স্নান করিলে পাপের জ্বালা দূরে যায়।" হঠাৎ কল্যাণ আমাদের দল ছেড়ে গাইয়েদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে গান ধরল, "প্রেম সলিলে স্নান করিলে পেটের জ্বালা দূরে যায়।" বড়োরা, ওকে বকবে কি নিজেরাই হেসে কুটোপাটি। সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য মাঘোৎসবের গাম্ভীর্য দূর হয়েছিল।'

জীবনের সব কিছুকেই ভালো লাগবার, ভালোবাসবার এবং সবার মধ্যে সেই ভালোবাসা সঞ্চালিত করে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর লেখনীতে। নিজের সংবেদনশীল মনটিকে তিনি হারিয়ে যেতে দেন নি, নষ্ট হতে দেন নি। সযত্নে বুকের ভেতর ধরে রেখেছেন ছোটোদের তা বিলিয়ে দেবার জন্য। শিশুদের বুকের ভেতর ভিড় করে আসা সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নাগুলি যদি ঝর্ণার মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝরে পড়তে না পারে তাহলে তা নদী হয়ে সাগরে মিলবে কী করে।

বড়োদের জন্যও তিনি লিখেছেন। কিন্তু নিজেই বলেছেন যে বড়োদের জন্য লিখে তিনি কম আনন্দ পান। 'বড়োরা বই পড়ে সময় কাটাবার জন্য, নয়তো প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করবার জন্য, নয়তো সবাই পড়ছে বলে কিংবা বই না পড়লে ঘুম আসে না বলে। আর ছোটোরা পড়ে মজা পাবার জন্য। মজা না পেলে হাজার ভালো বই হলেও পড়ে না।' ঈশ্বরের কৃপায় হাজার উপভোগের জিনিসে ভরা এক আশ্চর্য ছোটোবেলা তাঁর জীবনে এসেছিল। তার একটুও বাদ না দিয়ে গোটাটাই তিনি ছোটোদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ সব জিনিস ফেলে দেবার নয়— একলা ভোগ করবার জন্যও নয়। কিন্তু একলা বসে পড়তে পড়তে আজও কখনো নিজের মনেই ফিক করে হেসে উঠি, নয়তো বুকের ভেতরটায় একটা টনটনে ব্যথা অনুভব করি।

লীলা মজুমদার তাঁর যাদু-লেখনী নামিয়ে রেখেছিলেন অনেক দিনই। কিন্তু চারপাশের বাতাস দিন দিন যে বড়ো বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসের পাহাড়গুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ভালোবাসার নদীর জলে চড়া পড়েছে। দুলের নকশা করা আরো ভালো একটা বাতাসবাড়ির সন্ধান পেলে বড়ো ভালো হয়। নরু পম্পা পদমরা প্রাণ ভরে একটু নিশ্বাস নিতে পারে। ভিড় করে এসে ওরা দাঁড়িয়েছে। কোন্ বন্ধ দরজায় ঘা দিলে বড়ো লামা দরজা খুলে দেবে ওরা বুঝতে পারছে না। লীলা মজুমদার চলে গেলেন। কিন্তু তাঁকে আজও ওদের বড়ো প্রয়োজন ছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোকবিজয় রাহা

দু'বছর আগে আমরা কবি জীবনানন্দ দাশকে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে হারিয়েছি। আজ আবার কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকালে শোচনীয়ভাবে হারালাম। জীবনানন্দের মৃত্যু আমাদের স্তম্ভিত, বিমূঢ় করেছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এল একেবারে অন্যভাবে : জীবনের শেষ ক'বছর তিনি যেন নিজেই নিজেকে এই অনিবার্য পরিণামের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। অসহায় আত্মবন্ধুরা নীরব দর্শকের মতো তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কের করুণ দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এত বড়ো সচেতন শিল্পীর কেন এ আত্মদ্রোহ, এর উত্তর তিনি আমাদের দিয়ে যান নি, তবু এর জন্য একমাত্র তাঁকেই দায়ী করে আমরাও মনে এতটুকু সান্ত্বনা পাব না।

জীবনানন্দের চেয়ে বছর-দশেকের ছোটো ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তরধর্মে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও সাহিত্যের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে এঁদের দু'জনের প্রতিভাই ছিল অসাধারণ। আবার দু'জনের ভাগ্যেই ছিল আজীবন অর্থকষ্ট। জীবনানন্দের একটি অদৃশ্য রক্ষাকবচ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী মন, যা তাঁকে জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও শান্ত সমাহিত রেখেছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেজী মন ছিল একেবারে অন্য ধাঁচের, যার ফলে ভিতরে-বাহিরে প্রতিকূল শক্তির প্রবল সংঘাত তাঁর সত্তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের সাহিত্যের দুটি বিদ্রোহী প্রতিভাকে— মধুসূদন ও নজরুল। দুটি প্রতিভাই উল্কার মতো জ্বলে উঠেছিল। একটি উনিশ শতকের আকাশে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় চার দিক উদ্ভাসিত করে দেখতে-দেখতে নিজের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অন্যটি বিশ শতকের আকাশে এক মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার পর মাধ্যাকর্ষণের টানে ছিটকে এসে মাটিতে পড়ে আছে : অসাড়, নিস্পন্দ। নজরুল আজ টিকে আছেন মাত্র, তাঁর প্রতিভা বেঁচে নেই। সাধনার ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও স্বভাবের দিক থেকে এঁদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনটি জীবনের পরিণামই মর্মান্তিক।

অথচ কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী যে-কোনো দেশেরই গৌরব। তাঁর রচনার মৌলিকতা অসাধারণ, তা একেবারে ভিন্ন ধরনের— যে জন্য আমাদের সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকে অনেকটা আকস্মিক বলে মনে হয়। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাধনায় পুষ্ট কথাসাহিত্যের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই এক ব্যতিক্রম। তাঁর একক মানসিক গঠন তাঁর সৃষ্টিগুলিকে এক অসামান্যতা দান করেছে। উত্তর-রবীন্দ্র যুগের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যায় 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র তরুণ লেখকদের মনে সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন পথ সন্ধানের যে স্বাধীন আকাঙ্খা জেগেছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সেই দুঃসাহসী প্রেরণাই এক নতুন দিগ্‌বলয় আবিষ্কার করেছে। অথচ তাঁকে ঠিক 'কল্লোল'-গোত্রীয় বলা চলে না। 'কল্লোলীয়'দের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে তাঁর খানিকটা মিল থাকলেও মনোভঙ্গিতে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁকে 'কল্লোলোত্তর' বললে হয়তো ভুল হবে না, কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে 'কল্লোলীয়'দের রোমান্টিকতাবিরোধী আন্দোলনের পিছনেও ক্রিয়া করেছে তাঁদের অন্তরের একটি সূক্ষ্মতর রোমান্টিক প্রবৃত্তি, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন ছিল যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ, দৃষ্টি ছিল ঢের বেশি বাস্তবধর্মী।

এই বাস্তব দৃষ্টি নিয়েই চার দিকের জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সুদূর পদ্মাতীর থেকে শহরতলী এবং শহরতলী থেকে মহানগরী পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন হাজারো মানুষের ভিড়ে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন সর্বত্র সবকিছুকেই সজাগ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছে। নানা স্তরের নরনারীর মনের ভিতরে তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি, অতি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেছেন তাদের দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিমানস, এবং লক্ষ

করেছেন সমাজজীবনে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে আঞ্চলিক কাহিনী রচনায় শৈলজানন্দ এবং মনোবিকলনধর্মী কাহিনী রচনায় জগদীশ গুপ্ত পথিকৃৎ হলেও এই উভয় ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পকৌশলের স্বকীয়তা বিস্ময়কর। তা ছাড়া নিত্যনূতন পরিবেশে কত ভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর অন্তর্জীবনেই না তিনি প্রবেশ করেছেন, বিজ্ঞানীর মতো সন্ধানী আলোর রঞ্জনরশ্মি ফেলেছেন তাদের অচেতন মনের গহ্বরে, ভেদ করেছেন সেখানকার অন্তর্গূঢ় রহস্যপুঞ্জ। অবশ্য দৃষ্টিসাধনায় বিজ্ঞানী হলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ জীবনশিল্পী : মানুষের মগ্নচেতনায় তিনি যে-সব গোপন গুহামুখের সন্ধান পেয়েছেন সে-সব অজন্তাগুহার দেয়ালে-দেয়ালে যত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, যত জীবজন্তু, সরীসৃপ, যত রহস্যময় মুখ ও মুখোশ, যত মায়ামূর্তির ছায়ানৃত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের প্রত্যেকটিকে রঙে-রেখায় জীবন্ত করে তুলে তাঁর গল্প-উপন্যাসের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় অতি নিপুণভাবে সাজিয়েছেন তাঁর নূতন ধরনের চিত্রশালা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন আজকের মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার-হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাস— একই মানুষের মনের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে ভিন্ন স্বভাবের অনেকগুলি মানুষ। আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে যে বহুকালের বহুপুরুষের সংস্কারজাল গিঁঠ বেঁধে জট পাকিয়ে রয়েছে তা-ই আমাদের অন্তর্জীবনকে এত রহস্যময় ও বহির্জীবনকে এত জটিল করে তুলেছে, আর ব্যক্তিজীবনের এই জটিলতা সমাজজীবনকে করে তুলেছে জটিলতর। জীবনানন্দ যে-সত্যকে সূত্রাকারে বলেছেন— 'আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি— বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি তারই বহুবিচিত্র জীবনভাষ্য। তা ছাড়া এ যেন এক নতুন ধরনের মহাভারত, যেখানে ভীষ্ম ও শকুনি একই সঙ্গে একই দেহে জীবনধারণ করছে, দুঃশাসনই বাইরে সেজেছে যুধিষ্ঠির।

আবার আরো একটি মারাত্মক সংকট দেখা দেয় মানুষের : তার অন্তরের এই একাধিক সত্তার মধ্যে কোন্‌টি তার সত্যিকার সত্তা তা সে নিজেই জানে না। কথাবার্তা, কাজকর্ম, আচার-আচরণে সে এক-এক সময় সজ্ঞানেই এমন-সব কাণ্ড করে বসে যা তার নিজের কাছেই অসংগত ঠেকে। একটা ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই বিপরীত ইচ্ছা, একটা চিন্তার সূত্র ধরেই বিপরীত চিন্তা, একটা কাজ করতে গিয়েই তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ— এর চেয়ে বিড়ম্বনা মানুষের পক্ষে আর কী হতে পারে? অন্তত সজ্ঞান মনেও তার অনুভূতি, চিন্তা এবং চেষ্টার মধ্যে একটা পারস্পরিক ও পূর্বাপর সংগতি থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে তার সমগ্র সত্তার ভগ্নাংশমাত্র। একটি নিটোল বৃত্তের মণ্ডলায়িত পূর্ণতা সে নিজের মধ্যে কোনো কালেই খুঁজে পাবে না। আবার কেন্দ্রবিন্দুটিও চিরকাল অগোচরেই থাকবে। কাজেই সারাদিনের ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির মধ্যে যখন সে দৈবাৎ একটিবার নিজের ভিতরটাতে দৃষ্টিপাত করে তখন সেখানে তার সত্তার কয়েক টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাঙা বৃত্তচাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তবু এই ভাঙা টুকরোগুলিকেই কোনোরকমে জুড়ে নিয়ে তাকে খাড়া করতে হয় নিজের একটা কল্পিত রূপ, আর বিশ্বাস করতে হয় এইটেই তার সত্যিকার চেহারা— অবশ্য সে বিশ্বাসও বেশিক্ষণ তার নিজের কাছেই ধোপে টেকে না।

মানুষের মনোলোকের এই সমস্যাগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নানা দিক থেকে নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিল্পের কাজ তত্ত্বব্যাখ্যা বা তথ্যসংগ্রহ নয়, যদিও তত্ত্ব কিংবা তথ্যকে সে নিজের প্রয়োজনে সর্বদাই ব্যবহার করতে পারে। শিল্পের প্রধান্ লক্ষ্য জীবনসত্যের রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ, যা আমাদের মনে এনে দেবে শুধু প্রতীতি নয়, প্রত্যয়; অনুমান নয়, অনুভব।— যা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে আমাদের ভাবকল্পনায়। তাই মানুষের রক্তনাড়ির আদিম অন্ধ জীবনাবেগ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক ভয়াল শরীরী বিগ্রহ ধারণ করে। মানুষের মনের মধ্যে যে আদিম অরণ্যের অন্ধকার বাঁধা পড়ে আছে সেখানকার জটিল সুড়ঙ্গপথে আজও আনাগোনা করে বিকট হিংসার মূর্তি, ক্ষণে-ক্ষণে চমকে ওঠে শানিত চোখের দীপ্তি, বেরিয়ে আসে ধারালো দাঁত নখ। বিশ শতকের মহানগরীর রাত্রিতেও সেই আদিম

অরণ্যের অনুভূতি ছমছম করে, চার দিকে ঘিরে আসে রাশি-রাশি ছায়াভয়— জান্তব, ভৌতিক— প্রাকৃতকেও অতিপ্রাকৃত বলে ভ্রম হতে থাকে। ঠিক এমনি সময়ে মহানগরীর অলিগলিতে, শহরতলীর ঘিঞ্জি বস্তিগুলিতে, মানুষের মনের আদিম অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই 'প্রাগৈতিহাসিক' রাত, মফস্বলের মহকুমা শহরের এক প্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙায় সদ্যোনিহত বসিরের ভাঙা কুঁড়ে ঘরের ঝাঁপ ঠেলে খোঁড়া পাঁচীর হাত ধরে বেরিয়ে আসে বীভৎসমূর্তি ভিখু— ডাঙার ফাঁকা জায়গায় খানিকদূর একসঙ্গে হাঁটবার পর শ্রান্ত পাঁচীকে পিঠে ঝুলিয়ে নেয় সে— তার পর শুরু হয় নিরুদ্দেশ যাত্রা :

> ...দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।
>
> হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।

আবার 'সরীসৃপ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুটিল মধ্যবিত্ত মনের উপরকার ছদ্ম আবরণ খসিয়ে দিয়ে ভিতরের ভয়ংকর চেহারাটি অনাবৃত করেছেন। কপটতার আড়ালে মানুষের অবদমিত আদিম রিপুগুলি কী-ভাবে তাদের বীভৎস আহার সংগ্রহ করে, এই অদ্ভুত গল্পটি তারই জীবন্ত চিত্র। এ-শ্রেণীর মানুষ যে ভিতরে-ভিতরে জন্তুর চেয়েও হিংস্র, সাপের চেয়েও কুটিল আর বিষাক্ত হতে পারে, গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে তা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপসংহারের তীক্ষ্ণ বক্রোক্তিটি সভ্যতাভিমানী মানুষের উপর যেন বিদ্রূপের শানিত প্রহার :

> ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপবে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।

কিন্তু অবদমিত আদিম প্রবৃত্তির গোপন হিংস্রতাই আধুনিক সভ্যতার একমাত্র ব্যাধিলক্ষণ নয়। অন্য এক দিক দিয়ে এক জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে মানুষের দুর্জ্ঞেয় অন্তরপ্রকৃতি। অচেতন মনের অন্তস্তরে কোন্ সূচীমুখ কামনা অনুবিদ্ধ হয়ে আছে তা জানতে না পেরে সবচেয়ে অসহায় বোধ করে মানুষ। তার চেতন মনের কাছে এর মূল কারণটি কিছুতেই ধরা দেয় না বলে শত সজ্ঞান চেষ্টাতেও সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। ফলে নিজেরই মধ্যেকার এক অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ চলতে থাকে তার, আর সে-দ্বন্দ্বে তিলে-তিলে সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। শেষ অবস্থায়, চরম পরাজয়ের মুখে, আসে এক দুর্বার মুহূর্ত। এমনি এক মুহূর্তে 'দিবারাত্রির কাব্যে'র ট্র্যাজিক পরিণতি আসন্ন হয়। মালতীর মেয়ে আনন্দকে তার জীবনের শেষ রাত্রে এক বিরাট ধুনি জ্বেলে হেরম্বের সামনে নাচতে হয় অদ্ভুত পরীনৃত্য :

> ...অকস্মাৎ আনন্দের নৃত্য থেমে গেল। আগুনের আরো নিকটে সে থমকে দাঁড়াল। আগুন এখন তার মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে উঠেছে, আনন্দকেও মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। পরক্ষণে আনন্দ কাত হয়ে সেই বিপুল ব্যাপক যজ্ঞানলে ঢলে পড়ল।
>
> হেরম্ব নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু করার নেই। আনন্দ অনেক আগে মরে গেছে। শুধু চিতায় উঠবার শক্তিটুকুই তার বজায় ছিল।

জীবনানন্দের ভাষায় এও মানুষের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়ে'র-ই 'খেলা'। মানুষ এই অদৃশ্য শক্তির হাতে পুতুলমাত্র। মানুষের মগ্নচেতনায় এই শক্তির ক্রিয়া যতই সূক্ষ্ম তার বহির্জীবনের উপরে এর প্রতিক্রিয়া তেমনি অমোঘ, আবার নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে গড়া সমাজজীবনের উপরেও এর প্রভাব তেমনি অপ্রতিরোধ্য। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় এই সত্যটিই অন্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

...নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।

একে আমরা অনেক সময় নাম দিই 'নিয়তি'— এই অদৃশ্যকেই বলি 'অদৃষ্ট'। কিন্তু এর দুর্বার শক্তি ঠেলে আসছে আমাদেরই অন্তরপ্রকৃতির নিগূঢ় অন্ধকার থেকে, আর জীবনকে অন্ধভাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে— কোথায় কে জানে। তাই 'দিবারাত্রির কাব্যে'র নায়িকা আনন্দকে শেষ পর্যন্ত এমনি করেই আত্মাহুতি দিতে হয়; আর হেরম্ব?— কিছুদিন আগে আনন্দই তো তাকে প্রশ্ন করেছিল :

'প্রেম কদিন বাঁচে?'
হেরম্ব বলল, 'কি করে বলব আনন্দ, দিন গুনে বলা যায় না। তবে ...হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে ...প্রেম এত তেজী নেশা।'

অন্ধ প্রবৃত্তির তীব্র উন্মাদনার কাছে ধৃতিশক্তিহীন হেরম্বও এমনি দুর্বল, অসহায়।

সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হই . এক, মানবমনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা; দুই, ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রচিত্রায়নে তাঁর অসাধারণ কলানৈপুণ্য ও স্বকীয়তা; এবং তিন, সংস্কারমুক্ত মনের সুস্থির বস্তুনিষ্ঠা ও নির্লিপ্ততা। এ ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে ভাষার বিবর্তনও বিস্ময়কর। শুরু থেকেই এ যেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গদ্যরীতি। অদ্ভুত এর বলিষ্ঠতা, তাঁর বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকেই এর জন্ম। বাইরের চাকচিক্য এর পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নয়, অন্তরায়,— এমন-কি সাধারণ ব্যাকরণসম্মত বাক্যরীতিও সব সময় যথেষ্ট নয়।

কিন্তু ভাষারীতির কথা বাদ দিয়ে আপাতত তাঁর তৃতীয় গুণবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো খানিকটা আলোচনা করা প্রয়োজন। মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে সব সময় খুব কাছে থেকে অতি নিবিড়ভাবেই দেখেছেন তবু শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে যখনই তিনি জীবনকে রূপায়িত করতে গিয়েছেন তখনই নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে নিয়ে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সেইসঙ্গে যতটা সম্ভব সংস্কারমুক্ত হতে চেষ্টা করেছেন। মানুষ কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা ত্রুটিশূন্য নয়, এ-সত্যকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন, এবং দোষে-গুণে-জড়ানো দেহনিয়তি-তাড়িত মানুষের সুখদুঃখের জীবনকে এই চেতনা নিয়েই এঁকেছেন। তবে স্রষ্টার আসনে বসেও শিল্পীর একটি নৈর্ব্যক্তিক শিল্পীবিবেক জেগে থাকে, মহৎ শিল্পীকেও তার প্রভাব স্বীকার করতে হয়। সেই সূক্ষ্মতর বিবেকেরই ইঙ্গিতে তিনি একটি অনুচ্চারিত অভিনন্দন জানিয়েছেন বলিষ্ঠতা, ঋজুতা ও অকৃত্রিমতাকে— তা সে যার মধ্যেই প্রকাশ পাক, এবং সমাজের যে স্তরেই সে বাস করুক। দুর্বলতা, কুটিলতা ও কৃত্রিমতাকে তিনি পাপ বলেই জেনেছেন। তাঁর শিল্পীবিবেকের এইটিই মূলসূত্র বলে মনে হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণগুলি মোটামুটি বেশি দেখা যায় বলে এদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও বেশি প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর রচনায় তাই এমন অসাধারণ হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য বই 'পদ্মানদীর মাঝি'। পদ্মাতীরের জেলেদেরই কাহিনী এটা— একেবারে শুরু থেকেই পদ্মাতীরের প্রাকৃত জীবনের তাজা টাটকা ঘ্রাণে ভরপুর। ভরা বর্ষায় কাহিনীর সূচনা :

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরিবার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্র কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ-ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ও-গুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারের দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। শেষরাত্রে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

দৃষ্টি বলে একে। তা ছাড়া কয়েকটি মাত্র কথার আঁচড়ে— প্রায় একটানে— এমন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ পটভূমি রচনা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীরই চিরকালের কামনা। এই কাহিনীর নায়ক কুবের ও নায়িকা কপিলা বলতে কতটুকু বলা হয়? এর প্রধান নায়ক পদ্মাতীরের সুখদুঃখ-হাসিকান্নায় ভরা রহস্যময় প্রাকৃত জীবন, এর প্রধানা নায়িকা এই জীবনের একেশ্বরী ভাগ্যনিয়ন্ত্রী অঘটনঘটনপটীয়সী পদ্মা :

> ...ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙ্গন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ্ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনো দিন সাঙ্গ হয় না। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, অবিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

অদ্ভুত বর্ণনাভঙ্গি। শিল্পীর একাগ্র তন্ময়তায় এখানে সাধুভাষার গদ্যরীতিটিও যেন পদ্মাতীরের জলকাদায় ভূমিষ্ঠ হয়ে জন্মান্তর নিয়েছে। আর সংলাপ যেখানে খাঁটি পদ্মাতীরের, যেখানে ঘিঞ্জি জেলেপাড়ার বদ্ধ হাওয়া সব সময় 'মাছের আঁশটে গন্ধে ভরা', যেখানে মাঠের বুকে 'এক হাঁটু দগদগে দইয়ের মতো কাদা'— সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা যেমন অব্যর্থ তেমনি নিরঙ্কুশ। এই পরিবেশে একমাত্র হোসেন মিয়াকে কিছুটা হেঁয়ালি মনে হয়, তার ময়নাদ্বীপের উপনিবেশ গড়ার স্বপ্নটাও অদ্ভুত। তবু কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এখানকার সকলের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক পাতিয়ে সেও যেন কখন্ আমাদের অজান্তেই এই কাহিনীর অঙ্গ হয়ে গিয়েছে— কাহিনীর ধারার সঙ্গে তার একটা প্রাণধর্মী ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া তার ময়নাদ্বীপের স্বপ্নটাকে আমরাও তো গিয়ে এক ফাঁকে নিজেদের চোখেই দেখে আসি, সেখানকার আইনকানুনগুলো সেখানকার সমাজ-জীবনের উপযোগী করে কেটে-ছেঁটে বেশ মানানসই করে নেওয়া হয়েছে। শেষের দিকে কী অনিবার্যবেগে ঐ ময়নাদ্বীপের মুখেই ছুটে চলেছে কাহিনীর ভাঁটার টান।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কাহিনীর এই প্রবল ভাঁটার টানটি অনুপস্থিত। কুবেরের সঙ্গে কপিলা এক নৌকায় ভেসে যায়, কিন্তু কুসুমের নৌকায় শশী ডাক্তারের তো ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এখানে ময়নাদ্বীপের স্বপ্নও তো অবাস্তব। কোথায় পদ্মাতীরের কেতুপুরের জেলেপাড়া আর কোথায় বাজিতপুর মহকুমার খালপাড়ের গাওদিয়া গ্রাম। তা ছাড়া শশী যেমন কুবের নয়, কুসুমও তো কপিলা নয়। কপিলার সঙ্গে তার গোড়ার দিকে যদি-বা খানিকটা মিল ছিল, শেষ পর্যন্ত সেও কি একেবারেই বদলে যায় নি? শেষের দিকে একদিন তালবনে শশীকে কী বলেছিল কুসুম?—

> '...চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একভাবে থাকবে, বদলাবে না?'

আবার বলেছিল :

> '...লাল টকটকে করে তাতানো লোহাকে ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে, যায় না? ...কাকে ডাকছেন ছোটোবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে, সে মরে গেছে।'

অতি সত্য কথা। কিন্তু আরো সত্য শশী ডাক্তারের শতদীর্ণ মন। এই গাওদিয়া গ্রামে দিনের পর দিন বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশে, আত্মীয়ের মতো তাদের সেবাযত্ন করে, কতই তো দেখল শশী। সুখের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে জীবনের এও এক স্বাদ। শহরে শিক্ষিত হলেও 'হৃদয় ও মনের গড়ন' আসলে তার 'গ্রাম্য'। কুসুম এখানে থাকতে এই গাওদিয়া গ্রামই একদিন তার হৃদয়কে পূর্ণ করে রেখেছিল; আজ কুসুম নেই, তবু অন্তরে পরম রিক্ততা নিয়েও শেষ পর্যন্ত এই গ্রামটিকেই সে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে। কাহিনীর সমাপ্তিটি কী সুন্দর! দিন যায়, শশীর শূন্যমনে ধীরে-ধীরে নেমে আসে এক ক্লান্ত অবসাদ। দীর্ঘ ছায়া ফেলে এক-পা এক-পা করে তার দিকে এগিয়ে আসে জরা। গল্পাংশে মিল না থাকলেও এইখানে এসে কেন জানি নে মনে পড়ে যায় *Growth of the Soil*-এর শেষ ছবিটা। কানের কাছে কে যেন নিশ্বাস ফেলে বলে :. Isak is old :

...জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়ি-ঘর ডোবা পুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল। শ্রীনাথের দোকানের সামনে, বাঁধানো বকুলতলায়, কায়েতপাড়ার পথে। যাদবের বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে জঙ্গলে, পরানের বাড়িতেও এখনো লোক আসে নাই। তার ওপাশে তালবন। তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলারের উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।

একেবারে গোড়ার দিকে লেখা হলেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এক হিসাবে বলা চলে তাঁর প্রথম দিকের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসেই নানাভাবে এই পুতুলনাচেরই খেলা চলেছে, এমন-কি পরবর্তীকালের উপন্যাস 'চতুষ্কোণে'ও তাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে মোটামুটি দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি প্রধানত মনোবিকলনের পথেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনরহস্য উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'সরীসৃপ' ছাড়া এই পর্বের আরো কয়েকটি ছোটো গল্প উল্লেখযোগ্য : 'টিকটিকি' ও 'হলুদপোড়া' গল্পে মানুষের জীবনে লৌকিক কুসংস্কারের বিকৃত প্রভাব, 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পে নরনারীর অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনের এক ভয়াবহ রূপ, 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানুষের অসহায় আত্মবিলোপস্পৃহা, 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে জীবনের অশ্রুলবণাক্ত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত দুঃখবাদ, 'আপিম' গল্পে সূক্ষ্মতর অর্থে মানুষের স্বভাবজাত নেশাপ্রবণতা, এবং 'বিবেক' গল্পে স্বার্থপর সুবিধাবাদীর একপেশে বিবেকবোধকে নিপুণ চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এদের বেশির ভাগ গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়— বিশেষ করে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে। এই সময় থেকে তাঁর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বড়ো রকমের পরিবর্তন এল। শুধু বাইরের কারণেই নয়, সম্ভবত তাঁর শিল্পপ্রেরণার দিক থেকেও একটি নতুন ধারার অনুবর্তন এই সময়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এ-পর্যন্ত মনোবিকলনের পথ ধরে তিনি মানুষের মনোলোকের যতই গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততই জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এবং এমনও মনে হয় যে, শেষ দিকে এই শ্বাসরোধকারী অন্ধকার তাঁর শিল্পীসত্তাকেও যেন সূক্ষ্মভাবে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। এই সময়ে তাঁর মধ্যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে এক তিক্ততা ও বৈরাগ্যের ভাব এসে গিয়েছিল— অন্তত মধ্যবিত্ত জীবন সম্বন্ধে তো বটেই। এ-পথে আর বেশিদূর এগোলে কী হত বলা যায় না; তাঁর চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ ঐক্যসূত্রটুকু হারিয়ে কতকগুলি মানসিক সমস্যার প্রতীক হয়ে দাঁড়াত। এ-পর্বের শেষ দিকের কয়েকটি গল্পে তার কিছু-কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য এ-অবস্থায় এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যে এই সম্ভাবনার কথা এর আগে একেবারেই ভাবেন নি, তা নয়। সাহিত্যজীবনের একেবারে শুরুতে ১৯৩৫ সালে 'দিবারাত্রির কাব্যে'র ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন :

...দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,— তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection— মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

কাজেই মনোবিকলনের পথে কেবলই অগ্রসর হতে থাকলে এই টুকরো-টুকরো 'মানসিক অংশ'গুলি যে শেষ পর্যন্ত আরো 'খাপছাড়া', আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে, এ-কথা তাঁর মতো সচেতন শিল্পীর মোটেই অজানা ছিল না।

এই সময়ে তাঁর শিল্পচেতনাকে নতুন পথে মোড় ফেরাবার প্রেরণা দিয়েছিল মার্কসবাদ। এ-পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন মানুষের মধ্যেকার অন্ধ জীবনাবর্তকে, এবার লক্ষ করলেন কালধারায় প্রসারিত জীবনের বিরাট প্রবাহকে। তাঁর চোখের সামনে তখন মহাযুদ্ধের সময়কার বাংলাদেশ— এক দিকে নরনারীর অন্তহীন দুঃখদুর্দশা, অন্য দিকে তারই প্রতীকারের জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা। তিনি ক্রমে নিঃসন্দেহ হতে লাগলেন যে মানুষের অন্তরপ্রকৃতির গহনে যত জটিলতাই থাক, তাকে বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে চালিত করছে তার অর্থনৈতিক সমাজজীবন; যেখানেই এর সুস্থ স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে সেখানেই জেগেছে দ্বন্দ্বসংঘাত, জেগেছে বিপ্লব, যার মধ্যে দিয়ে পথ মোচন করে আবার বেরিয়ে এসেছে মহাজীবনের ধারা। তাঁর বিশ্বাস হল, সমাজজীবনের সামগ্রিক অগ্রগতিই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ, অবচেতনার প্রাগৈতিহাসিককে করে তুলছে সমাজসচেতন ঐতিহাসিক মানুষ।

এই নতুন দৃষ্টি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে পেলেন আজকের মানুষের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ তার দুস্তর অর্থনৈতিক বাধা, যা উত্তীর্ণ হতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের একটা বিরাট অংশের অবহেলিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। এই রোগ ও তার প্রতীকার-চিন্তাই তাঁর শেষ পর্বের লেখাগুলিকে এক নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অর্থনৈতিক পরিবেশ ও তার পরিবর্তন জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪০-৪১-এ লেখা তাঁর 'সহরতলী' উপন্যাসে, কিন্তু অর্থনৈতিক পরাধীনতায় মানুষের দুঃসহ দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে মন্বন্তরের পটভূমিতে 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা' প্রভৃতি গল্পে। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে বর্তমান অর্থনীতির আওতায় বর্ধিত মানুষের নৈতিক অধঃপতনের একটা দিক উন্মোচিত হয়েছে।

এ-সব গল্পে অর্থনৈতিক পরাধীনতায় মানুষের পরাজয়ের ছবি আঁকা হয়েছে, লেখক এখানে মুখ্যত সমাজের রোগ নির্ণয় করছেন। এর প্রতীকার চিন্তা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন, মানুষের একক চেষ্টায় তা হবার নয়, তার জন্যে চাই একতা; আর এই একতা তখনই গড়ে উঠবে যখন মানুষের সমাজচেতনা তাকে করে তুলবে সংবেদনশীল। অবশ্য এই বিশ্বাসটিতে নিশ্চিন্তভাবে পৌঁছবার আগে তাঁর মনে কিছুকাল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলেছে, এবং তাঁর এই সময়কার অনেকগুলি লেখাতেই তাঁর বিদ্রূপ চেতনার ছায়া পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত এই নাস্তিক্যধর্মী মনোভাবকে জয় করে তিনি মানুষের মুক্তিপথের সন্ধান করেছেন মানুষেরই সংঘচেতনার মধ্যে। 'মাটি-ঘেষা মানুষে'র দিকে এবার নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি, তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন প্রাকৃত জীবনের এক নতুন বিবর্তিত রূপ। 'বিচার', 'শিল্পী', 'কংক্রিট', 'হারাধনের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি গল্প এই নতুন আবিষ্কারেরই ফল। 'আজ কাল পরশুর গল্প' এবং 'পরিস্থিতি'ও এই পর্যায়ে আসে। সেইসঙ্গে তাঁর 'চিহ্ন', 'সোনার চেয়ে দামী' প্রভৃতি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য।

বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু উপরের প্রথম কয়টি গল্পের মূল বক্তব্যটুকু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে তাঁর আগেকার লেখার তুলনায় এগুলির কতটা জাত আলাদা। 'বিচার' গল্পে দেখানো হয়েছে শহরতলীর বস্তিবাসী মজুর-মজুরনীদের মধ্যেও কী করে গড়ে উঠেছে সমাজচেতনা। ভালো করে ভোর হবার আগেই জল নেবার জন্যে জলের কলের কাছে জড়ো হয়েছে তারা। হাইড্রান্টের কাছে স্নানার্থীরাও জুটছে এসে একে-একে। এদেরই একজন প্রবীণ মজুর মতিলালের জোয়ান ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে সরকার এবং জেলখানায় আটক করে রেখেছে বিনা বিচারে। কলতলায় এসে এই নিয়ে শুরু হয় জটলা, যার ফলে তাদের নিজেদের গড়া সার-বেঁধে-দাঁড়ানোর সর্বসম্মত আইনটা উত্তেজনার বশে লঙ্ঘিত হয়ে যায়। কিন্তু আইন তো দশজনের ইচ্ছায় সকলেরই সুবিধার জন্যে তৈরি। সেটা ভাঙলে চলবে কেন? তারা নিজেরাই নিজেদের চেষ্টায় আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়— যে আগে এসেছে সে আগে দাঁড়াল, আবার পিছনের বুড়োদের, কিংবা যে-সব মজুরনীর ঘরে অসুখ-বিসুখ আছে তাদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিল সামনের সমর্থ-কম-বয়েসীরা।

হৃদয়ে সহজ মানবতার ভাব নিয়ে, দশজনের স্বীকৃত অলিখিত আইনে এদের মধ্যে চলেছে এক সুন্দর সুশৃঙ্খল বিচার, অথচ দেশের সুসভ্য সরকারের আদালতে বাঁধা-ধরা সরকারি বিচারের সঙ্গে এর কতই তফাত।

'শিল্পী' গল্পের সঙ্গে 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পটি পাশাপাশি রাখলেই আর কিছু বলতে হয় না। মধ্যবিত্ত মনের অসংযত অর্থলালসায় দুর্নীতির পথে স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা মানুষকে কতখানি অমানুষ করে তোলে, আর দরিদ্র গ্রাম্য শিল্পীর আদর্শনিষ্ঠা, আত্মমর্যাদাবোধ ও দুঃখবরণের দৃঢ়তা তাকে সেই তুলনায় কতখানি নৈতিক সম্মানের অধিকারী করে, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সুতোর অভাবে সাত-সাতটা দিন তাঁত বন্ধ মদনের, ঘরে এক-সন্ধ্যা খাবার সংগতি নেই, তার উপর বৌটা তার ন' মাসের পোয়াতি। তবু সে ভুলতে পারে না সে জাত-শিল্পী, অবস্থার চাপে পড়ে নিজের ঐতিহ্যকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না সে। বাবুদের বাড়িতে এখন তার এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির আদর না থাকলেও জীবিকার লোভে ভুবন ঘোষালের বেগার-খাটা-মজুরি নিয়ে শাদা ধুতি শাড়ি গামছা বুনে দিতে রাজি হয় না মদন। বরং দারিদ্র্যকেই আঁকড়ে থাকবে সে— তার আরো ক' ঘর জাতভায়েরই মতো— তবু আত্মমর্যাদা খুইয়ে আত্মবিক্রয় করা চলবে না কিছুতেই।

'কংক্রিট' গল্পের উপসংহারের দিকে রঘুর চরিত্রটি কি বলিষ্ঠ। কারখানার পোঁছাবাবুর গোপন চক্রান্তে রঘুকে ভুলিয়ে আনা হয়েছে রানীর ঘরে। রানী যখন বলল, 'এবার কত কাজে লাগাবে তোমাকে পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি'— তখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায়, সে নিজের চোখে দেখেছে কেষ্ট বাতাপিকে কীভাবে রোলার মেসিনে পিষে থেঁতলে মারা হয়েছে। চুপ করে বসে থাকলে আর চলবে না। পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে বেন্দার মতো, ছিদামের মতো কাজে লাগাতে চায়? তা কিছুতেই হতে দেবে না সে। কারখানার শ্রমিকদের সকলকেই সে বলে দেবে কেষ্ট বাতাপির মৃত্যুর রহস্য :

> ...আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনিভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হন হন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। ...আর ধৈর্য ধরছিল না। কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে— রোলার মেসিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্তের বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

'হারানের নাতজামাই' গল্পে বিদ্রোহী কৃষাণ নেতা ভুবন মণ্ডলকে সালিগঞ্জ গ্রামে গ্রেপ্তার করতে এসে মাঝরাতে পুলিশকে কীভাবে হারানের বাড়ি থেকে বোকা ব'নে ফিরে যেতে হল তারই অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ময়নার মা'র উপস্থিতবুদ্ধিতে পরিস্থিতির সহজ সমাধান হয়ে ভালোই হল। অবশ্য তা নইলেও সমাধান হত। দু'দিন আগে এই ময়নার মা-ই গাঁয়ের মেয়ের দলকে সঙ্গে করে ঝাঁটা বঁটি হাতে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁ থেকে পুলিশকে তাড়িয়ে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমা। সেদিন রাত্রেও ব্যাপারটা সহজে না মিটলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। বাইরের তে-ভাগা চাঁদের আলোয় প্রায় দেড় শ' চাষী লাঠি-সড়কি দা-কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়েছিল দল বেঁধে,— তাদের নেতার জন্যে পুলিশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তারা লড়তই।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' মজুর-ধর্মঘটের পটভূমিতে রচিত একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্প। বিদ্রূপ-মেশানো একটি চাপা কৌতুক গল্পটিকে রসোজ্জ্বল করেছে। তিন জন ধর্মঘটী মজুর-নেতাকে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শ' মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল স্টেশনে, এবং এ নিয়ে রক্তারক্তির পরে 'ছোট বকুলপুরে' পড়েছে সেপাইয়ের ডেরা, যার ফলে সেখানকার লোকের উপর শুরু হয়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচার। এরই মধ্যে বৌ আন্না আর একফোঁটা শিশুকে নিয়ে রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে গোরুর গাড়িতে চেপে সেই ভয়ংকর স্থানে আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে দেখা করতে এল কি-না 'আধা-চাষী আধা-মজুর' দিবাকর! পাহারারত অতিবুদ্ধি

গুপ্তচরেরা কী করে বিশ্বাস করবে এ-কথা? এখানে এরা যে ছদ্মবেশে এসেছে এবং আসলে অতি 'ডেঞ্জারাস্' লোক তাতে আর সন্দেহ কী? বিশেষত যখন দিবাকরের পান-মোড়া ছাপানো কাগজটা লণ্ঠনের আলোয় পরীক্ষা করে দেখা গেল 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি' একখানা ইস্তাহার। অথচ এতটা আধিদৈবিক বিপর্যয়েও 'ভীরু মুখ্য ছোট লোক' দু'টোর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যে থেমে যায় নি, এটাই আশ্চর্য।

কিন্তু এ-আলোচনা আপাতত এইখানেই শেষ করা যাক। এক-একবার মনে হয় ঐ শহরতলীর বস্তিবাসী সুশৃঙ্খল মজুর-মজুরনী, গাঁয়ের জাত-শিল্পী মদন তাঁতি, কংক্রিটের কারখানার প্রতিরোধকামী শ্রমিকের দল, সালিগঞ্জের চাষীদের গাঁয়ের দুঃসাহসী স্ত্রী-পুরুষ, আর 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরে'র দল ও তাদের কুটুম্ব দিবাকর আর আন্না— এরা তো আমাদের সমাজের সেই স্তর থেকেই এসেছে, মুখ্যত কায়িক শ্রমেই যারা নির্ভরশীল; কেউ খাটে মাঠে, কেউ কারখানায়; কেউ ধান ভানে ঘরে, কেউ খোয়া ভাঙে রাস্তায়; এদের আপনজনেরাই তো কাজ করছে গঞ্জে হাটে বাটে, মাছ ধরছে পদ্মানদীর জলে; তবু এখানে কত দৃপ্ত, বলিষ্ঠ মনে হচ্ছে এদের; কী দৃঢ় পদক্ষেপে এরা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে পদ্মাতীরের কেতুপুর থেকে। এদের এই অগ্রগতি, এই নতুন জীবন-চেতনা, আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধের বিবর্তনকেই সূচিত করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের কোন্ পর্বের লেখা সকল দিক বিচারে সবচেয়ে সার্থক হয়েছে, এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রথম পর্বের কথাটাই বেশি করে মনে আসে। তার একটা প্রধান কারণ দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকের লেখাগুলিতে অনেক সময় তাঁর বিরূপ মনের ছায়া পড়েছে, আর শেষ দিকের লেখায় নতুন ধারার শুধু একটা সূচনাই হয়ে রইল, পরিণতি ঘটল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে পর্ব দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের বিপরীত হলেও গভীরতর অর্থে পরস্পরের পরিপূরক। তাঁর প্রতিভাকে সমগ্রভাবে জানতে হলে দুটি পর্বেরই পূর্ণ পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। একই জীবনসত্যকে তিনি দুটি ভিন্ন দিক থেকে জানবার সাধনা করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছ থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন, এ-কথা ভোলবার নয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স পঞ্চাশও পূর্ণ হয় নি। তবু এরই মধ্যে গত বাইশ বছরে তাঁর সবসুদ্ধ সাতান্ন খানি বই প্রকাশিত হয়েছে, আরো রচনা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এই অল্পকালের মধ্যে মানুষের জীবনকে তিনি কত রূপেই না দেখেছেন। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন কাটিয়েছেন, তবু তাঁর লেখা কখনো একেবারে বন্ধ হয় নি। আরো অবাক লাগে এই ভেবে যে সাহিত্যসাধনার শেষ পর্বে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কী আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। একে শুধু গোত্রান্তর বললে যথেষ্ট হয় না, তাঁর শিল্পীমানসের দিক থেকে এ একেবারে জন্মান্তর। এই জন্মান্তরের বেদনা হৃদয়ে বহন করে তাঁর শিল্পীসত্তাকে কত-যে দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুরূহ সংকট উত্তীর্ণ হতে হয়েছে তার ইতিহাস চিরকাল অলিখিত থাকবে। যে-বেদনাকে তিনি এতদিন বুকে চেপে রেখেছিলেন তাকে তিনি বুকে করেই নিয়ে গেছেন, পরবর্তীদের জন্যে রেখে গেছেন ঊনষাটখানি গ্রন্থে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার বিচিত্র ফসল— মানুষের মহাজীবনের অর্ঘ্যরূপে আমরা যাকে আহরণ করব আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ মাঘ-চৈত্র

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের অস্বাক্ষরিত রচনা

সূত্র

১৩ অগস্ট ২০০৬ দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'নকল রবীন্দ্রনাথের ভিড়' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধের লেখক বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের মূল বক্তব্য : বিশ্বভারতী-প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-র ২৯ (প্রকাশ ১৪০৪ শ্রাবণ) ও ৩০ (প্রকাশ ১৪০৪ ফাল্গুন) খণ্ডের অনেকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথের নয় এবং 'অস্বাক্ষরিত' লেখাগুলি *রচনাবলী* থেকে বর্জন করা উচিত। বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীরজতকান্ত রায় খণ্ডদুটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের কাছে এ-বিষয়ে অভিমত জানাতে অনুরোধ করে চিঠি দেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বিশ্বভারতীর তখনকার উপাচার্য শ্রীদিলীপকুমার সিংহ, কর্মসচিব শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় এবং ভূদেব চৌধুরী, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীঅনাথনাথ দাস ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। দুটি খণ্ডেরই গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করেছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস ও শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। ভূদেব চৌধুরী প্রয়াত; শ্রীদিলীপকুমার সিংহর কাছ থেকে উপাচার্য মহাশয়ের চিঠির উত্তর আসে নি। অন্যান্য সদস্যের চিঠিগুলি মাননীয় উপাচার্যের নির্দেশে *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-র এই সংখ্যায় অবিকল মুদ্রিত হল, *রচনাবলী*-তে প্রকাশিত সদস্যদের নামের তালিকা অনুসারে। সঙ্গে রাখা হল মূল নিবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের কাছে প্রেরিত শ্রীরজতকান্ত রায়ের চিঠি।

প্রকাশক

নকল রবীন্দ্রনাথের ভিড়

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৯ এবং ৩০ খণ্ডে (যথাক্রমে ১৪০৪ শ্রাবণে ও ফাল্গুনে প্রকাশিত) সংকলিত হয়েছে 'উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনাসমূহ।' পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও অগ্রন্থিত রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর ২৯ ও ৩০ খণ্ডকেই মূলত অনুসরণ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রচনাবলীর এই খণ্ডগুলিতে অগ্রন্থিত রবীন্দ্র-রচনা বলে যে-সব রচনা সংগৃহীত হয়েছে, তার বিপুল অংশই আদৌ রবীন্দ্রনাথের লেখা কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পুরাতন সাময়িকপত্রের পাতায় হাজারো অগ্রন্থিত রচনার মধ্যে কোন্ রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের? যে রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত, সেগুলি নিয়ে সাধারণভাবে কোনো সংশয় নেই। যদি অন্য কোনো সূত্র থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে, তবে অস্বাক্ষরিত কোনো লেখাকেও তাঁর রচনা বলে সিদ্ধান্ত করা যেতেই পারে। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি ব্যতিরেকে, কারও ব্যক্তিগত অনুমানের উপর নির্ভর করে কিংবা কোনো অনুমানেরও উল্লেখমাত্র না করে, পুরাতন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অস্বাক্ষরিত যে কোনো রচনা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে সংকলন করা কখনোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

যেমন, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ঊনত্রিশ খণ্ডে ঊনআশিটি গ্রন্থসমালোচনা সংকলিত হয়েছে ২৮৩ থেকে ৩২৬ পৃষ্ঠায়। 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮ থেকে ১২৯১ বঙ্গাব্দের মধ্যে ছাপা হয়েছিল সাঁইত্রিশটি গ্রন্থ সমালোচনা, সব ক'টিই স্বাক্ষরবিহীন। 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮ ফাল্গুন থেকে ১৩০২ কার্তিক সময়পর্বে মুদ্রিত চৌত্রিশটি গ্রন্থসমালোচনা রচনাবলীতে সংকলিত; এগুলিরও সব ক'টিই অস্বাক্ষরিত। ভারতী পত্রিকায় ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে অগ্রহায়ণ— এই পর্বে মুদ্রিত আটটি গ্রন্থসমালোচনা রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত। আর তাই দেখি, ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত সুনীল দাস প্রণীত 'ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী' গ্রন্থে ভারতীতে ১৩০৫-এ মুদ্রিত এই আটটি গ্রন্থসমালোচনাকে রবীন্দ্রনাথকৃত বলেই উল্লেখ করা হয়েছে; এবং ভারতীতে ১২৮৮ থেকে ১২৯১-এ মুদ্রিত সাঁইত্রিশটি গ্রন্থসমালোচনাকেই লেখকের নামহীন তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধনা পত্রিকায় মুদ্রিত চৌত্রিশটি সমালোচনাও অস্বাক্ষরিত।

সাধনা পত্রিকায় তিনটি বিভাগ ছিল; 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'— রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত, 'সাময়িক সার সংগ্রহ'— রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত, কিন্তু 'প্রাপ্ত গ্রন্থ', 'গ্রন্থসমালোচনা' বা 'সমালোচনা' বিভাগটি অস্বাক্ষরিত ছিল। মনে হয় এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট কোনো লেখক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে এই বিভাগে প্রকাশিত চৌত্রিশটি গ্রন্থসমালোচনার মধ্যে অন্তত দু'টি বইয়ের ('দেওয়ান গোবিন্দরাম' ও 'মনোরমা') সমালোচনা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা তৎকালীন চিঠি (ছিন্নপত্রাবলী ১৯০ সংখ্যক পত্র) থেকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বাকি বত্রিশটি? এই অস্বাক্ষরিত লেখার আরও দু'টি-একটি রবীন্দ্রনাথের হতেও পারে, নাও হতে পারে।

রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে একবারও বলা হল না, ঊনআশিটি গ্রন্থসমালোচনার মধ্যে একাত্তরটিই অস্বাক্ষরিত। শেষ আটটি সমালোচনা (ভারতী ১৩০৫-এ মুদ্রিত) যে স্বাক্ষরিত, সে কথাও বলা হয় নি। ফলে পাঠকের ধারণা হয় সংকলিত সব রচনাই স্বাক্ষরিত রচনা, আর তাই পাঠকের মনে রচনার প্রামাণিকতা নিয়ে সংশয় থাকে না। এই খণ্ডের প্রথম দিকে অগ্রন্থিত অনেকগুলি কবিতা সংকলিত। গ্রন্থপরিচয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন্‌টি 'স্বাক্ষরিত রচনা' কোন্‌টি 'অস্বাক্ষরিত'। কিন্তু 'গ্রন্থসমালোচনা'র ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত-অস্বাক্ষরিত প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হয় নি।

একাত্তরটি অস্বাক্ষরিত গ্রন্থসমালোচনার মধ্যে গ্রন্থপরিচয়ে মাত্র একটি ক্ষেত্রে (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের সমালোচনা) বলা হয়েছে সমালোচনাটি 'স্বাক্ষরহীন'। এতে পাঠকের স্বভাবতই ধারণা হয় অবশিষ্ট সব ক'টি লেখাই স্বাক্ষরিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডে কঙ্কাবতীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসটির (১২৯৯) এই সমালোচনা রবীন্দ্রনাথেরই কি না, এ নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে (১৩৬৭) রচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলে গৃহীত।" এই মন্তব্যের দ্বারা কিন্তু প্রমাণিত হয় না যে, এই স্বাক্ষরহীন সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথেরই লেখা।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (রেক্সিন বাঁধাই সংস্করণ) ত্রিংশ খণ্ডে বিবিধ পর্যায়ে চৌত্রিশটি অগ্রন্থিত রচনা সংকলিত। এর গ্রন্থপরিচয় অংশে এই চৌত্রিশটি রচনার কোন্‌টি স্বাক্ষরিত, কোন্‌টি স্বাক্ষরিত নয়, তার সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ নেই। ৩ থেকে ৮ সংখ্যক রচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে : "ভারতী-র প্রথম বর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এক ধরনের আত্মভাবনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূচনা করিয়াছিলেন— 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম-চোর', 'চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়', 'দারোয়ান', 'জীবন ও বর্ণমালা' এবং 'রেলগাড়ি' এই শ্রেণীর রচনা— পরিণত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় তাহা আরও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের তিনি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু অন্তত 'চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়' এবং 'জীবন ও বর্ণমালা' রচনা দু'টিকে তিনি যে গ্রন্থভুক্ত করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'ভারতী'-র একটি খণ্ডে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে, কিছু কিছু অংশ তিনি বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখানে পত্রিকার সম্পূর্ণ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।" পাঠক বিভ্রান্ত। তাঁর প্রশ্ন : ৩ থেকে ৮ অগ্রন্থিত এই রচনাগুলি কি স্বাক্ষরিত? প্রকৃত তথ্য, প্রথম তিনটি রচনা স্বাক্ষরিত, শেষ তিনটি অস্বাক্ষরিত।

১২৯০ আষাঢ়ে ভারতীতে 'গোঁফ এবং ডিম' নামে মুদ্রিত একটি অস্বাক্ষরিত রচনা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থপরিচয়ে মন্তব্য : " 'গোঁফ এবং ডিম' লঘুস্বাদের এই রচনাটি 'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহ রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া দাবি না করিলেও ভাষা ও অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিস্তার দেখিয়া ইহাকে সহজেই রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়।"

এতই সহজে চিনে নেওয়া যাচ্ছে? এ দিকে 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থ খুলে দেখি, তাতে প্রভাতকুমার লিখেছেন, "রচনাটি অত্যন্ত এলোমেলো, ব্যঙ্গ ও শ্লেষ উচ্চস্তরের নহে!" অন্য দিকে সম্পাদক কল্পনার স্বাচ্ছন্দ্য ও ভাষাগৌরব দেখে 'সহজেই' এই নিকৃষ্ট রচনাটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে চিনে নিচ্ছেন। অনেক ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীকে, এই নিকৃষ্ট রচনাটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে গ্রহণ না করার জন্য।

অস্বাক্ষরিত রচনাকে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে 'রবীন্দ্র-রচনা' বলে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা, কখনোই সমর্থন করা যায় না। এই রচনাগুলি অবিলম্বে রচনাবলী থেকে বর্জন করা উচিত বলে মনে করি।

আনন্দবাজার পত্রিকা । ১৩ অগস্ট ২০০৬

১ উপাচার্যের চিঠি

ভিসি/বি-১ (ভি) ২১ অগস্ট, ২০০৬

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অন্তর্গত কিছু রচনা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে এই চিঠি দিচ্ছি। সঙ্গে একটি বিবৃতির প্রতিলিপি পাঠালাম।

আপনার মূল্যবান মতামত পেলে বিশ্বভারতী বিশেষ উপকৃত হবে। ব্যাপারটি জরুরী। প্রয়োজনবোধে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের রিডার ড. অমলকুমার পাল আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন।

নমস্কারান্তে
রজতকান্ত রায়

২

পয়লা নভেম্বর / দু'হাজার ছয়

প্রসঙ্গ : ভিসি/বি-১ (ভি) তারিখ ২১ অগস্ট ২০০৬

সম্মানভাজনেষু,

আপনার উল্লিখিত পত্রটি বিলম্বে পেয়েছি, সম্ভবত ভুল ঠিকানা, এবং আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে। উত্তর দিতে দেরি হল। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ড. অমলকুমার পাল ইতোমধ্যেই আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের সাময়িক পত্রের লেখাটি আগেই আমার পড়া ছিল। তাঁর উত্থাপিত প্রসঙ্গ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা সমীচীন। মনে রাখা প্রয়োজন রচনাবলীর ২৯ ও ৩০ খণ্ডদুটি (বা পরে প্রকাশিতব্য অন্য খণ্ডের জন্যও সম্ভবত) সম্পাদনার জন্য একটি সম্পাদনা সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং তাঁরা কাজও করেছেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী ব্যতীত সেই সমিতির সকলেই এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁদের মতামত এবং প্রয়োজনে অন্যান্য রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া যায়।

তবে সমস্যাটি কেবল রচনাবলী ২৯-৩০ খণ্ডের নয়, রবীন্দ্রনাথের সমুদয় প্রকাশিত রচনার প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরির কাজে হাত দেওয়ার সময় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এই কাজ শুরু হলে ২৯-৩০ এর ভ্রান্তি/অযৌক্তিক/প্রমাণ নিরপেক্ষ লেখা সংকলনের ত্রুটিও সংশোধিত হতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল লেখাই গ্রন্থিত। অগ্রন্থিত লেখার জন্য যেমন কাজ করা দরকার, গ্রন্থিত রচনাবলী/চিঠিপত্র/গীতবিতান/স্বরবিতান প্রভৃতির প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরি তার থেকে অনেক জরুরি বলে মনে করি।

আপাতত এই পর্যন্ত। আপনার/বিশ্বভারতীর আহ্বানে আমার সম্ভবপর সময় ব্যয় করতে, এই কাজে, আমি অকুণ্ঠ থাকব।

নমস্কারান্তে
দিলীপ মুখোপাধ্যায়

৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি [সংখ্যা ভিসি বি-১ (ভি)], তারিখ ২১ আগস্ট, ২০০৬, যথাসময়ে পেয়েছি। এই চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাই। ওই চিঠি পাওয়ার পর কয়েক দিন কলকাতার বাইরে থাকতে হয়েছিল, আর এইজন্য উত্তর দিতে কয়েক দিন দেরি হল। এজন্য আমি দুঃখিত।

আপনার জানতে চাওয়া বিষয়টির যেটুকু জানা আছে তা নীচে লিখছি।

১. ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পরই জানতে পারি যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৮-তম খণ্ডের কিছু অংশের ফর্মা ছাপা হয়ে পড়ে আছে দশ বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে। পরের অংশে কী ছাপা হবে, তার কোনো পাণ্ডুলিপিই নেই। গ্রন্থপরিচয় ও অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের কাজও অসমাপ্ত। স্বভাবতই ঐ বইটি শেষ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয়। ১৪০২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ঐ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের কিছু পৃষ্ঠার লালচে অর্থাৎ আগে-ছাপা, আবার কোনো অংশ বেশ পরিষ্কার।

২. এর পর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ কিছু সিদ্ধান্ত নেন। সেটি এইরকম। রচনাবলীর ২৯-তম খণ্ডের প্রকাশকের নিবেদনে তার উল্লেখ আছে। "রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডের নিবেদন-এ বলা হইয়াছিল, 'পূর্বপ্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত এবং কিছু অগ্রন্থিত রচনা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংগ্রহের কাজ চলিতেছে এবং তাহা খণ্ডশ প্রকাশের আয়োজনও হইতেছে।' " সেই রচনাগুলিই প্রকাশিত হয়েছে রচনাবলীর ২৯-তম এবং ৩০-তম খণ্ডে।

৩. কিন্তু কারা করছেন এই 'সংগ্রহের' কাজ। এর উল্লেখ আছে রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৯তম খণ্ডের ৪৭৭ পৃষ্ঠায়, এবং ৩০-তম খণ্ডের ৫৫৪ পৃষ্ঠায়। ঐ দু-টি খণ্ডের, প্রকাশকাল যথাক্রমে শ্রাবণ ১৪০৪ এবং ফাল্গুন ১৪০৪। ২৯ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ের প্রারম্ভে ছিল, 'রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্রন্থিত থাকিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকীর্ণ হইয়া আছে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রানুরাগী গবেষকরা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত না হইলেও, সেই-সব তালিকা আমাদের বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বর্তমান খণ্ডের রচনাগুলি এবং ইহার গ্রন্থপরিচয় সংকলনের কাজে আমরা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন এবং কানাই সামন্তের বিভিন্ন গবেষণার কাছে ঋণী। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীমতী সাধনা মজুমদার এবং শ্রীঅনাথনাথ দাস। সেই-সব কাজের এবং আরও কোনো কোনো নূতন সন্ধানের সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থপরিচয় সংকলিত হইল। গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। ['] (রচনাবলী ২৯, পৃ. ৪৪৭)।

৪. রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৩০-তম খণ্ডের ৫৫৪ পৃষ্ঠার 'স্বীকৃতি' এইরকম। 'অগ্রন্থিত রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশ্বভারতী একটি সম্পাদনা-সমিতি গঠন করেন। উপাচার্য শ্রীদিলীপকুমার সিংহ, কর্মসচিব শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় -সহ, সমিতিতে আছেন শ্রীভূদেব চৌধুরী, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস (পৃ. ৫১৫-৫২৪) এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল (পৃ. ৫২৪-৫৫৩)। সংকলন ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীদিলীপকুমার হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীআশিসকুমার হাজরা এবং শ্রীঅমিত সেন।' এই

নামগুলির প্রথম তিন জন পদাধিকারী, অন্যেরা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক। রচনাবলী ২৯-তম এবং ৩০-তম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থপরিচয়ের প্রেসকপি শান্তিনিকেতন থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। এবং যেমন কপি ছিল তাই ছাপা হয়েছে।

৫. উল্লিখিত 'সম্পাদনা-সমিতি'র একাধিক বৈঠক হয়েছে, এবং কোন কোন রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হবে সে-বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমন-কী, গ্রন্থপরিচয় অংশও বিশেষজ্ঞরা পর্যালোচনা করেছেন এবং তার পর ছাপানোর জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে কোনো সংশয় থাকলে তার নিরসন বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই করবেন।

৬. চিঠির সঙ্গে-পাঠানো সংবাদপত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের ছোটো বিবৃতিটিতে একটা তথ্য চোখে পড়ল। তিনি 'গোঁফ এবং ডিম' রচনাটির বিষয়ে লিখেছেন, 'অনেক ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীকে, এই নিকৃষ্ট রচনাটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলে গ্রহণ না করার জন্য।' পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কিন্তু এই লেখাটি আছে, ঐ রচনাবলীর ১৫-খ খণ্ডের ৯৩৭ পৃষ্ঠায়। খণ্ডটির প্রকাশকাল বৈশাখ ১৪১১, মে ২০০৬ [২০০৪]।

আপনার চিঠির জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাই।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি।

অশোক মুখোপাধ্যায়
৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬

৪

বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক রজতকান্ত রায়ের
ভিসি/বি-১ (ভি) নং ২১ আগস্ট ২০০৬ তারিখের পত্র প্রসঙ্গে

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর ঊনত্রিশ খণ্ডে সংযোজিত অস্বাক্ষরিত রচনাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা কি না, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো কারণ না দেখিয়েই রচনাগুলিকে নির্বিচারে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে গ্রহণ করায় তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয় আমার মত জানতে চেয়েছেন। আমার অভিমত আমি জানাচ্ছি।

১. অস্বাক্ষরিত রচনাগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলন করার সময়ে কারণ উল্লেখ করা সংগত ছিল। সে-কারণ না দেখানোতে অমিত্রসূদনের মতো গবেষকরা সংশয়ান্বিত হয়ে পড়বেন, এটা স্বাভাবিক।

২. রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে রচনাবলী সংকলন আরম্ভ হয়। তখন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, পুলিনবিহারী সেন, কানাই সামন্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ। তাঁরা তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনা চিহ্নিত করতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁদের অনুসৃত প্রক্রিয়া সর্বজনমান্যতা লাভ করেছে। পরবর্তী কালেও সেই রীতি থেকে সম্পাদকমণ্ডলী স্খলিত হন নি।

৩. তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বশেষ পাঠই রচনাবলীতে গৃহীত হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণের পাঠ উল্লেখ করার নীতি তখনও নেওয়া হয় নি। সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্যতার কথা মনে রেখেই এই নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। গ্রন্থপরিচয়ে এভাবেই আনুষঙ্গিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কোনো রচনার পাঠপরিবর্তনের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া হত না।

৪. পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণ-প্রদর্শিত রীতিই এতাবৎ চলে এসেছে। কোনো রকম গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা রচনাবলী সম্পাদনার রীতি হিসাবে অনুসৃত হয় নি।

৫. মাঝে দীর্ঘকালের ব্যবধানে যখন রচনাবলীর কাজ আবার আরম্ভ হয়, তখন নতুন বিশেষজ্ঞগণের এক সমিতি গঠিত হয়। তাঁদের অনুমোদনক্রমে এতাবৎ অনুসৃত রীতি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনা সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের যে-সব রচনা প্রচলিত, সেগুলি ছাড়া অপ্রচলিত রচনা সংগ্রহের কাজও আরম্ভ হল। পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণের অনুমোদনক্রমে অপ্রচলিত রচনা গৃহীত হতে থাকে। বিশেষজ্ঞ কারা ছিলেন, তাঁদের নামোল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করেই এই বিশেষজ্ঞসমিতি গঠিত হয়েছিল তার দায়িত্বের কথা ভেবে। এ সম্বন্ধে পাঠকরা কোনো দিন প্রশ্ন তোলেন নি।

৬. অপ্রচলিত এবং স্বাক্ষরিত রচনা সংকলনের পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুরনো পত্র-পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে যুক্তিসংগতভাবে অনুমিত অস্বাক্ষরিত রচনাও সংকলন করতে উদ্যোগী হয়।

৭. আমি মনে করি, এই কাজ অবশ্যকর্তব্য ছিল। বিশ্বভারতী যে বিপুল পরিমাণ অস্বাক্ষরিত রচনা সংগ্রহ ও সংকলন করে দিল, এতে ভবিষ্যৎ গবেষকদের সুবিধা হল অপরিমেয়। হয়তো এর মধ্যে কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথের নয় বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু পুরনো বিলুপ্তপ্রায় রচনা পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়ে থাকল, এই কাজ আর কেউ করত কিনা সন্দেহ। অস্বাক্ষরিত বহু রচনাকে সম্পাদকমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথের বলে অনুমান করেছেন, ভবিষ্যৎ গবেষণায় তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। সে বিচারের ভার বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী নিজেদের হাতে না রেখে ভবিষ্যৎ পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলেন। এ যদি না করতেন, তবে সত্যসত্যই যেগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা, সেগুলি হারিয়ে যেত। এই সংগ্রহ না করলে রবীন্দ্রনাথের নয় এমন রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাও বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এতদিন পর অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের মতো গবেষক এ বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন, এই সংকলনের মূলে এই প্রত্যাশাই ছিল, মনে হয়। তবে গবেষণা সংবাদপত্রে না করে এবং বিশ্বভারতীর সাধু অভিপ্রায়কে ধিক্‌কৃত না করে যোগ্য পণ্ডিতমহলে হলেই ভালো হয়।

ভবতোষ দত্ত
শান্তিনিকেতন। ৩১.৮.২০০৬

৫

২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬

সবিনয় নিবেদন,

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের যে লেখাটি ছাপা হয়েছে, সে-প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য জানতে চেয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকাগুলিতে (এবং পরেও কখনো কখনো) অনেক লেখাই লেখকনামহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অস্বাক্ষরিত সেই লেখাগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি রবীন্দ্রনাথের হওয়া সম্ভব, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই অনেক বিচারবিবেচনার সূত্রপাত হয়েছিল, সেই বিচার বা অনুসন্ধান কবির মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। দীর্ঘকাল জুড়ে অনেক মাননীয় গবেষক এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে নানা তালিকা প্রণয়ন করেছেন। রচনাবলীর আলোচ্য খণ্ডদুটির (২৯ এবং ৩০) গ্রন্থপরিচয়-সূচনায় তাঁদের নামোল্লেখ আছে।

খণ্ডদুটি সংকলন করবার সময়ে (প্রকাশ ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮) সেই-সব পূর্বকৃত তালিকা ব্যবহার করা হয় এবং সেইসঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী নূতন কিছু বিচার-বিবেচনাও করেন। সে-সব বিবেচনার পর শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল এবং শ্রীঅনাথনাথ দাস যে-সূচি প্রস্তুত করেন, সম্পাদকমণ্ডলীর সকলেরই কাছে তা পাঠানো হয়। তাঁদের

অনুমোদন পাবার পর অনুলিপি করবার কাজ এবং মুদ্রণের কাজ চলতে থাকে। সেই একইসঙ্গে গ্রন্থপরিচয় অংশ প্রস্তুত করতে থাকেন শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল এবং শ্রীঅনাথনাথ দাস। রবিজীবনী-কার প্রশান্তকুমার অত্যন্ত যত্ন আর সর্তকতা নিয়েই লেখাগুলিকে পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে এ-সব প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। গ্রন্থপরিচয়ের পাণ্ডুলিপিও সম্পাদকমণ্ডলীর সকলের কাছে পাঠানো হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা মুদ্রিত হয়।

একথা অবশ্য ঠিক যে গ্রন্থপরিচয়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অস্বাক্ষরিত' কথাটা না থাকাকে একটা গুরুতর সম্পাদকীয় গলদ হিসেবেই গণ্য করতে হবে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কথাটির সংযোজন অবশ্যই দরকার হবে। প্রয়োজনবোধে চলতি সংস্করণেও একটি নির্দেশপৃষ্ঠা যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

আনন্দবাজারে মুদ্রিত লেখাটি থেকে অন্য দু-একটি ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে বলে মনে হয়। 'গোঁফ এবং ডিম' নামের লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে গৃহীত হয় নি বলে লেখক জানাচ্ছেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। উক্ত রচনাবলীর ১৫-খ খণ্ডে— প্রায় আড়াই বছর আগে যা প্রকাশিত হয়েছে— ৯৩৭ থেকে ৯৪১ পৃষ্ঠায় লেখাটি পাওয়া যাবে। এ ছাড়া, লেখকের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত বাক্যটি থেকে মনে হয় যেন প্রভাতবাবু ঐ লেখাটিকে রবীন্দ্ররচনা হিসেবে গণ্য করেন নি। লেখাটি যে প্রভাতবাবুর পছন্দ হয় নি তা ঠিক, কিন্তু তিনি তাঁর সে-মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এটিকে রবীন্দ্র-রচনা হিসেবে গ্রহণ করেই (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড, ১৯৭০, পৃ. ১৮১)।

এই চিঠি শেষ করবার আগে উল্লেখ করা দরকার যে আলোচ্য খণ্ডদুটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। আলোচনা-বৈঠকগুলিতে তিনি নিয়মিত অংশ নিয়েছেন, সূচি আর গ্রন্থপরিচয়ের পাণ্ডুলিপিও দেখেছেন মুদ্রণের আগে।

নমস্কারান্তে
শঙ্খ ঘোষ

৬

১০ নভেম্বর ২০০৬

ভিসি/ডি-১ (ভি) ২১ আগস্ট ২০০৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ও অন্যান্য নানা অশান্তিতে উত্তর দিতে পারি নি। সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে সমস্ত রচনা অস্বাক্ষরিত সে-সব রচনা গ্রহণ করা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে সে সম্পর্কে আপনার পাঠানো অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের [প্রবন্ধের] প্রতিলিপি পড়ে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৯-৩১ খণ্ডগুলির পরিশিষ্টগুলি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, অযথা বিতর্ক এড়াতে স্বাক্ষরহীন রচনাগুলি রচনাবলী থেকে বাদ দেওয়া উচিত। অবশ্য, পারিপার্শ্বিক প্রমাণে যদি সমর্থন পাওয়া যায় তাহলে তো রাখা যাবেই। কিন্তু তা না পাওয়া গেলে বিশ্বভারতী-র প্রকাশিত রচনাবলী থেকে সেগুলি বাদ দিলেই ভালো হয়। ইতি

নমস্কারান্তে
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

৭

তাং : ২০.৯.০৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২১ আগস্ট ২০০৬ তারিখে লেখা ভিসি/বি-১ (ভি) নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে জানাচ্ছি :

১। 'সাধনা' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগের কথা সুবিদিত। 'সাধনা'র প্রথম বর্ষ থেকেই তিনি সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যদিও প্রথম তিন বছর সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকত। শেষ বছরটিতে সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায়।

'সাধনা'য় তিনি নিজে যেমন প্রচুর লিখেছেন তেমনি অন্যের বহু লেখার আমূল সংস্কার করেছেন। এই পত্রিকার 'প্রাপ্তগ্রন্থ', 'গ্রন্থসমালোচনা' বা 'সমালোচনা' বিভাগটি রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতেই রেখেছিলেন। এই বিভাগে প্রকাশিত লেখাগুলি যে একই ব্যক্তির তা পূর্বাপর পাঠ করলেই বোঝা যায়। ঠাকুর পরিবারের দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয় লেখা সম্ভব ছিল না। লেখাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে সুস্পষ্ট অভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে।

২। 'সাধনা'র ষাণ্মাসিক সূচিতে ছোটো বড়ো সমস্ত লেখকের নাম মুদ্রিত হতে দেখা যায় কিন্তু পুস্তক পরিচয়ে লেখকের নাম থাকত না। আসলে রবীন্দ্রনাথ বার বার নিজের নাম মুদ্রিত করতে সংকোচ বোধ করতেন। যেমন 'দেওয়ান গোবিন্দরাম' ও 'মনোরমা' প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি স্বনাম প্রকাশ করেন নি। তাছাড়া অস্বাক্ষরিত রচনা সম্পাদকের বলে বিবেচনা করার রীতি সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বহুকাল প্রচলিত ছিল।

৩। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'গোঁফ এবং ডিম' পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গৃহীত হয় নি। তথ্যটি ভুল। ঐ রচনাবলীর ১৫-খ খণ্ডটিতে 'গোঁফ এবং ডিম' সংকলিত।

৪। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য যে লেখাগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন সেই লেখাগুলির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'রবিজীবনী'র তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে। 'রবিজীবনী'র এই দুটি খণ্ড প্রকাশের পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

নমস্কারান্তে
প্রশান্তকুমার পাল

সূত্র : ভিসি/বি-১ (ভি) তারিখ ২১/০৮/০৬

২৮ আগস্ট ২০০৬
শান্তিনিকেতন

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২১ আগস্ট ২০০৬ তারিখের পত্রটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিয়েও গবেষণার কাজে লিপ্ত আছি।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত অনাবিষ্কৃত রচনা উদ্ধার করার চেষ্টা করে এসেছি বিগত তিন দশক ব্যাপী।

১৩৮৩ (১৯৭৬) শারদীয় 'দেশ'-এ সংকলন করি 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য রচনা : রবীন্দ্রনাথ-কৃত একগুচ্ছ গ্রন্থসমালোচনা'।

১৩৮৪ (১৯৭৭) শারদীয় 'দেশ'-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বিলুপ্তির পথে রবীন্দ্রনাথের শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ'। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ১০১টি বিলুপ্তপ্রায় প্রবন্ধের তালিকা প্রস্তুত করি— যে রচনাগুলি

ছিল সেযাবৎ অগ্রন্থিত। এই-সব রচনাই যে রবীন্দ্ররচনা তার সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিবন্ধে প্রদত্ত হয়েছিল।

১৯৭৮ 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যায় 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-রচনাবলী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি।

১৯৭৯ নভেম্বর ২৪ 'দেশ' পত্রিকায় সংকলন করি অগ্রন্থিত রবীন্দ্ররচনা : 'মূল জর্মান থেকে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ কবিতা'।

১৩৮৭ (১৯৮০) শারদীয় 'দেশ'-এ আমার সম্পাদনায় মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ভৈরবের বলি'।

১৯৮১ জুলাই ২৬ রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সংকলন করি 'রবীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য লিখনমালা'।

১৯৮৪ 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যায় ছাপিয়েছিলাম 'রবীন্দ্র-রম্যরচনা : রমণীয় লুপ্ত লেখমালা'।

১৯৮৮তে দে'জ থেকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য' শীর্ষক আমার গবেষণাগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য 'সাধনা' পত্রিকায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের বিপুলসংখ্যক অজ্ঞাত লুপ্ত-রচনা উদ্ধার করি এবং আমার বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত-রচনা : সাধনা পত্রিকা থেকে উদ্ধার— ক. সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, খ. সাময়িক সারসংগ্রহ, গ. বৈজ্ঞানিক সংবাদ) সেগুলি সংগৃহীত হয় ৩০৪ থেকে ৩৭২ পৃষ্ঠায়। এই বিপুলসংখ্যক রচনা সবই অজ্ঞাত ও অগ্রন্থিত হলেও তার সব কয়টিই মূলত রবীন্দ্র-স্বাক্ষরিত রচনা। দুটি-একটি অস্বাক্ষরিত রচনা প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্র-রচনা বলে প্রমাণিত।

১৯৮৯ মে ৬-এ 'দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্র-রচনাবলী নিয়ে আবার একটি প্রবন্ধ লিখি।

১৯৯৮-এ 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় লিখি 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর সব রচনাই কি রবীন্দ্র-রচনা?' রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রসঙ্গে আমার লেখার একটা খসড়া তালিকা উল্লেখ করার কারণ— বিষয়টা আমার দীর্ঘকালের ভাবনা চিন্তা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। এ ধরনের গবেষণায় সাফল্য গভীর অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে কোনো একটি রচনাও— যা অগ্রন্থিত এবং অস্বাক্ষরিত— তা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে তাঁর রচনাবলীতে ছাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিনা প্রমাণে পুরাতন সাময়িকপত্র থেকে সংগৃহীত অস্বাক্ষরিত বহু লেখা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। বিনা প্রমাণে কোনো তথ্য ইতিহাস কখনো মান্য বা অনুমোদন করতে পারে না। আমার লেখাতেও আমি বলতে চেয়েছি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অথবা বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (আমার পূজনীয় পিতৃদেব) যিনিই যে-লেখাটি রবীন্দ্র-রচনা বলে অনুমান করুন, বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে তা রবীন্দ্রনাথের লিখিত বলে গ্রহণ করতে পারি না এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীতে তা ছাপিয়ে দিতেও পারি না। অনেক ক্ষেত্রে রচনাগুলি যে অস্বাক্ষরিত তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ে।

আমি কৃতজ্ঞ আপনার চিঠির জন্য। আপনার নেতৃত্বে বিশ্বভারতীর সেবায় ও রবীন্দ্রচর্চার সমৃদ্ধিতে আমার সর্বপ্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতি রইলো।

অনেক অনেক কাজ এখনো করার আছে।

একটি স্বপ্ন একটি বাসনা একটি ইচ্ছা : উপাচার্য হিসাবে আপনার নেতৃত্বে ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রস্তুত হোক সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর ইংরেজি সংস্করণ। আপনার মতো একজন কৃতী ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব এমন একটি প্রজেক্টের অধিনায়কত্ব করা। এই বড়ো মাপের পরিকল্পনাটি এখন বিশ্বভারতী থেকে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আপনার হাত দিয়ে বিশ্বকবি প্রকৃত অর্থে পৌছান বিশ্ববাসীর কাছে।

আমার স্বপ্ন একদিন সত্য হবেই— হয়তো তা এবারেই।

নমস্কারান্তে
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

৯

প্রসঙ্গ : শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখিত 'নকল রবীন্দ্রনাথের ভিড়'
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩. ৮. ২০০৬

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৯, ৩০ সংখ্যাক খণ্ডদুটিতে অস্বাক্ষরিত কিছু রচনাভুক্তি প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ-বিষয়ে আপনি আমাকে মতামত জানাতে অনুরোধ করে ২১ আগস্ট ২০০৬ তারিখে একটি চিঠি লিখেছেন।

লেখকের প্রধান প্রশ্ন, এই অস্বাক্ষরিত রচনাগুলি যে রবীন্দ্ররচনা তার প্রমাণ কী? 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ ও গ্রন্থসমালোচনা অস্বাক্ষরিত থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন করা হয়েছে কোন্ যুক্তিতে?

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে এবং সমকালীন অনেক সাময়িকপত্রে অনেক রবীন্দ্ররচনা প্রচ্ছন্ন বা স্বাক্ষরহীন অবস্থায় আছে। তার অনেকগুলি, পূর্বসূরী রবীন্দ্রগবেষকগণ তথ্যপ্রমাণযোগে রবীন্দ্ররচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ নিবন্ধ ও কবিতার সন্ধান স্বাভাবিকভাবেই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত অস্বাক্ষরিত ক্ষুদ্রায়তন রচনাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে একটু বিলম্বে। 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকার ইতিহাস, এই পত্রিকাদ্বয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের সম্পর্ক এবং প্রায় অলক্ষভাবে সম্পাদনার ইতিহাস বিশেষভাবে অনুধাবন করে পূর্বসূরী রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রশান্তকুমার পাল এই সন্ধানের দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'রবিজীবনী'-কার প্রশান্তকুমার পাল বিশেষভাবে পূর্বোক্ত রচনাগুলি তৎসহ অস্বাক্ষরিত গ্রন্থ-সমালোচনাগুলি যথাসম্ভব তথ্যপ্রমাণযোগে তাঁর লিখিত 'রবিজীবনী' তৃতীয়-চতুর্থ খণ্ডে আলোচনা করেছেন।

'রবিজীবনী'র এই খণ্ডসমূহের প্রকাশের পর সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে সেখানে এই স্বাক্ষরহীন রচনা চিহ্নিতকরণের বিরুদ্ধে কোনো মত আমার লক্ষগোচর হয় নি। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পূর্ব-উল্লিখিত রচনাবলীতে সম্পাদন সমিতির সদস্যগণ পুনশ্চ বিচার করে অস্বাক্ষরিত কিছু রচনা গ্রহণ করেছেন। 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্ষেপে যুক্তি দেখানো হয়েছে, সর্বোপরি বিচার করা হয়েছে রচনার বিশিষ্টতার— যা ঐসময় একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

'ভারতী' পত্রিকার উদ্ভব অনেকখানি রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী এই দুই 'কবি-বিহঙ্গ'-এর স্বচ্ছন্দ পক্ষ সঞ্চালনের দিকে লক্ষ রেখে। অবশ্য এঁদের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবার ও তার বাইরের লেখকবৃন্দও যোগ দিয়েছিলেন। 'ভারতী'তে বহু রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 'স্বাক্ষরহীনতার ছায়ায় সেগুলি একরকম প্রচ্ছন্ন'। এই রচনাগুলি যথাসম্ভব উদ্ধার ও রবীন্দ্র-রচনাবলীভুক্ত করতে বিশ্বভারতী আর দ্বিধা করেন নি।

'সাধনা' পত্রিকার স্থায়িত্বকাল চার বৎসর। প্রথম তিন বছর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যত সম্পাদক-নাম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তিনিই ছিলেন নিয়ামক ও নির্ধারক। চতুর্থ বৎসরে প্রকাশ্যত তিনি সম্পাদনা-দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (২৮ ভাদ্র ১৩১৭), 'সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।' এই প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১১৭ সংখ্যক চিঠি স্মরণযোগ্য, যেখানে বলেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ পরিমার্জনার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। 'সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের কর্মস্থল প্রধানত শিলাইদহ। 'সাধনা'কে পরিপূর্ণ করার প্রভূত সময় তাঁর হাতে ছিল। এই পত্রিকায় তিনি যে বিভাগগুলির সূচনা করেন— যেমন গ্রন্থসমালোচনা/সমালোচনা, সাময়িক পত্রিকার পর্যালোচনা— এই-সব তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে তিনি একটি দিনের কথা বলছেন যখন 'দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উত্তরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে।'

'সাধনা'র মলাটসহ স্বতন্ত্র সংখ্যা দেখার সুযোগ হওয়ায় লক্ষ করেছি, অন্তত তাঁর সময়ের (শেষ বৎসরের) রচনাসূচি মুদ্রিত হত প্রচ্ছদের বিপরীত পৃষ্ঠায়, সেখানে কোথাও লেখক-নাম মুদ্রিত হয় নি। ষাণ্মাসিক সূচিতে কয়েকটি বাদে লেখকনাম দেখা যায়। রবীন্দ্ররচনা এই পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি। সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালোচনাগুলিতে সম্পাদক লেখক-নাম বর্জন করেছেন। এগুলির রচয়িতা অপর কেউ হলে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁর বা তাঁদের নাম মুদ্রিত করতে কার্পণ্য করতেন না। অপেক্ষাকৃত গৌণ রচনাগুলি থেকে তিনি নিজের নাম তুলে নিয়েছেন বলা যায়। এ-ছাড়া, আমাদের মনে রাখা দরকার পূর্বে স্বাক্ষরহীন রচনা পত্রিকা-সম্পাদকেরই হত। কথাপ্রসঙ্গে স্বীকৃত 'দেওয়ান গোবিন্দরাম' ও 'মনোরমা'র সঙ্গে অপর গ্রন্থসমালোচনাগুলি, একটু ধৈর্য ধরে পড়লেই বোঝা যায় এগুলি একই ব্যক্তির এবং তিনি রবীন্দ্রনাথই। ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, বিষয় সংক্ষেপীকরণের কুশলতা এবং গ্রন্থের মধ্যে সঠিকস্থানে আলোকপাত স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথকেই চিনিয়ে দেয়। এ-ছাড়াও কোনো কোনো স্পষ্ট সূত্র আছে যা একান্তই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত। রচনাগুলি সঠিকভাবে প্রশান্তকুমার 'রবিজীবনী'তে যুক্তিসহ চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বভারতী রচনাবলীর সম্পাদন সমিতি এই রচনাগুলি গ্রহণ করে কোনো অবাঞ্ছনীয় কাজ করেন নি। 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে এই রচনাগুলি যে অস্বাক্ষরিত তার উল্লেখ না থাকা অবশ্যই ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতে হবে। পরবর্তী সংস্করণে এরূপ দু'একটি সংস্কার করা যেতেই পারে। কিন্তু অস্বাক্ষরিত রবীন্দ্ররচনা বর্জন কখনই নয়।

আর দু-একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে প্রসঙ্গটি শেষ করা যেতে পারে। অস্বাক্ষরিত 'গোঁফ এবং ডিম' বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রচনাবলীতেও আছে, ১৫-খ খণ্ডটি বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। প্রভাতকুমার এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলে চিহ্নিত করেই মন্তব্য করেছেন 'রচনাটি অত্যন্ত এলোমেলো...।' এ-রকম দুর্বল এলোমেলো রবীন্দ্ররচনা স্বাক্ষরিতরূপেও পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও অস্বাক্ষরিত কিছু রচনাকে অনেক দিক বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখানে তা-ই করা হয়েছে। আর— 'কঙ্কাবতী' রবীন্দ্রনাথেরই। বিজনবিহারী যখন গ্রহণ করেছিলেন সেই-সময়ে কোনো রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ আপত্তি করেন নি। প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী কালে প্রশান্তকুমারও। বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ দ্বিধাহীনভাবেই গ্রহণ করেছেন!

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলীতে একটি সম্পাদকমণ্ডলী থাকেন, ব্যক্তিবিশেষকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয় না। ঊনত্রিংশ থেকে একত্রিংশের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় নি। এই খণ্ডগুলি প্রস্তুত করার সময় কোন্ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, এখানে তা জানানো বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। এই খণ্ডগুলিতে (২৯-৩১) যে সমস্ত লেখা বিন্যস্ত হয়েছে তার তালিকা করেছেন দু'জন। সেই তালিকার প্রতিলিপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর পর পাঠানো হয়েছে গ্রন্থপরিচয়। তার বেশ কয়েকদিন পর রবীন্দ্রভবন ও গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ রচনাবলীর সদস্যবর্গকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহ্বান করেছেন। সেই সভায় কখনই নির্বিচারে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি, যোগ বিয়োগ হয়েছে একাধিক রচনা এবং গ্রন্থপরিচয় অংশ। বিস্ময়ের কথা এই যে, সংবাদপত্রে যে-রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে, তার লেখকও ঐ সম্পাদনা সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। সভাস্থলে আলোচনা ও মতামত প্রকাশের এত অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রসঙ্গটি কেন তখন উত্থাপন করেন নি, এই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছেই। ১৪০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দুটি খণ্ড রচনাবলীর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ/প্রশ্ন ১৪১৩ বঙ্গাব্দে উত্থাপন করা যায় না, তা নয়; কিন্তু একজন সদস্যের এত সময় লাগে।

শান্তিনিকেতন
৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬

নমস্কারান্তে,
অনাথনাথ দাস

১০

নির্দেশক সংখ্যা : ভি.সি./বি-১ (ভি)
তারিখ ২১ আগস্ট ২০০৬

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর শেষ দু-একটি খণ্ডে কতকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথের নয় এ-রকম অভিযোগ তুলে সংবাদপত্রে "নকল রবীন্দ্রনাথের ভিড়" নামে একটি প্রতিবাদপত্র বের হয়। এ-বিষয়ে আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন।

শারীরিক কারণে আমার উত্তর দিতে খুবই বিলম্ব হল। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমাকে মার্জনা করবেন।

লেখকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমি মোটেই একমত নই। 'সাধনা' পত্রিকায় বহু অস্বাক্ষরিত রচনা রবীন্দ্রনাথেরই। এই রচনাগুলির বক্তব্য ও গঠনশৈলী থেকেই তা বোঝা যায়। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথও চিঠিপত্রে এই সত্য স্বীকার করেছেন। এখানে বিস্তারিত লেখার অবকাশ নেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে স্বতন্ত্রভাবে এ নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

অনুরূপভাবে 'সাধনা'-পূর্ব পত্রিকা 'ভারতী'তেও রবীন্দ্রনাথের এ-রকম অস্বাক্ষরিত লেখা আছে এবং পূর্ববর্তী রবীন্দ্রগবেষকগণ তা স্বীকার করেছেন। এ নিয়ে কোনো বিতর্ক ওঠে নি। এই-সমস্ত লেখায় রচনার রাবীন্দ্রিকতা নিবিষ্ট গবেষকমাত্রই অনুভব করতে পারেন।

এই অস্বাক্ষরিত রচনাগুলি এইভাবে সংগ্রহ ও পুনর্মুদ্রণ না করলে পত্রিকার জীর্ণ পৃষ্ঠায় সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যেতে চলেছে। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডসমূহে এই অস্বাক্ষরিত রচনাগুলি গ্রন্থিত না হলে ভবিষ্যতে জবাবদিহি দিতে হবে। তবে সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রচনাবলীর পরিশিষ্ট অংশে রাখা যেতে পারে।

প্রতিবাদ-পত্রলেখক তাঁর বক্তব্য বিশ্বভারতীকে জানাতে পারতেন। তা ছাড়া এটাও স্মরণযোগ্য যে তিনি এই কমিটির একজন সদস্যও। রচনাবলী প্রকাশের পূর্বে যে-সমস্ত আলোচনাসভা হয়েছিল, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি— সেইসময় কেউই কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। তা হলে এত বছর পরে প্রতিবাদকারী কোন্ উদ্দেশ্যে এ-রকমভাবে সরব হলেন?

নমস্কারান্তে

নিবেদক
সুবিমল লাহিড়ী

সম্পাদকের নিবেদন

সুখেন গঙ্গোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক। এখন বয়স ৭৮। জন্ম ১ অগস্ট ১৯২৯। দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতনেই ৬০ বছর কেটে গেল তাঁর। তখন কলাভবনের ডিরেক্টর নন্দলাল বসু। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হয়ে এলেন সুখেন গঙ্গোপাধ্যায়। তখন কলাভবনে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজি, রামকিঙ্কর বেইজ, পেরুমলজি, গৌরী ভঞ্জ। কলাভবনের পাঠ শেষ করার পর নন্দলাল বসুর অধীনে তিন বছর ম্যুরাল ডিজাইন নিয়ে কলাভবনে গবেষণার কাজ করেন। পরে এই কাজেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে অসামান্যতার পরিচয় দেন। ১৯৫৪ সালে বেনারস হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-শিক্ষকরূপে যোগ দেন। তিন বছর সেই কাজে যুক্ত ছিলেন। তার পর মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর আগ্রহে ও তৎপরতায় এই শিল্পী বারাণসী ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং কলাভবনের শিক্ষকরূপে যোগ দেন। দরখাস্ত করে বা ইন্টারভিউ দিয়ে নয়; নন্দলাল বসুর সুপারিশক্রমে উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আহ্বানে সুখেনবাবু বিশ্বভারতীর কলাভবনে যোগ দেন ১৯৫৭ সালে। ১৯৬৬ সালে দু বছরের জন্য জাপানে যান গবেষণার কাজে এবং জাপানের সমকালীন চিত্র ও ম্যুরাল চিত্র নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করেন। সুঠাম দীর্ঘদেহী সুদর্শন হাসিখুশি এই প্রবীণ শিল্পী এখন শান্তিনিকেতনেরই স্থায়ী বাসিন্দা। এনড্রুজপল্লীতে নির্মিত তাঁর নিজের বাড়ির দোতলার স্টুডিয়োতে বসেই তাঁর সারাটা দিন কেটে যায়। ম্যুরাল শিল্পে ইনি এখন ভারতবর্ষের প্রথম সারির একজন। ১৯৫২ সাল থেকে তাঁর যে কাজের ধারা শুরু হয়েছে তা আজও কিছুমাত্র

থামে নি। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে তাঁর ম্যুরাল শিল্পকীর্তি স্থাপিত হয়েছে। তাঁর কাজের সংগ্রহ রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালায়। 'নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন; তবে জাপানের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রথমাবধি। সদালাপী প্রাণখোলা মানুষ। তাঁর স্টুডিয়োতে বসে আমাকে দেখালেন এই মুহূর্তে কতগুলি কাজ করছেন একসঙ্গে। ছবির কাজের সঙ্গে লেখালেখির কাজেও উৎসাহী। স্মৃতিকথা লিখে যাচ্ছেন কলমে এবং তুলিতে। গত শতকের চার ও পাঁচের দশকের শান্তিনিকেতনের স্মৃতি, কলাভবনের স্মৃতি, পাতার পর পাতা জুড়ে স্কেচ করে যাচ্ছেন। স্মৃতির এ্যালবাম থেকে বেরিয়ে আসছে পুরাতন শান্তিনিকেতন জীবন্ত হয়ে। শান্তিনিকেতনের কোণে কোণে আশি-নব্বইয়ের কোঠায় অবস্থিত প্রবীণ শিল্পীদের নিভৃত বাসকক্ষে তাঁদের দুরন্ত আবেগ, কর্মপ্রবাহ শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁদের অনাবিল ভালোবাসা ও মমতা দেখে বিস্মিত হতে
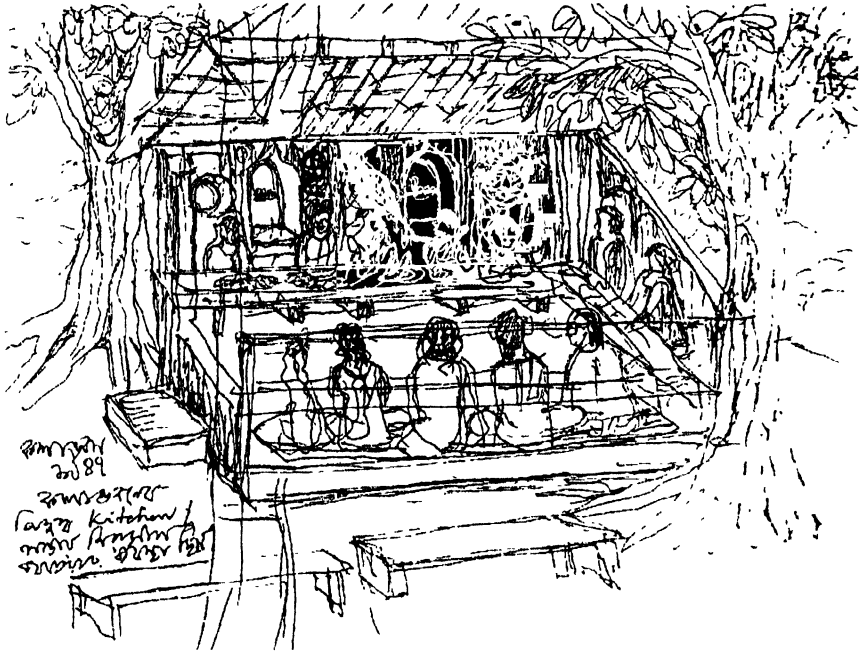
হয়। গরম কাল। খালি গা। পরনে লুঙ্গি। দূরে একটি প্যাডেস্টাল পাখা ঘুরছে। টেবিল চেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাত এবং দিন, মাস এবং বছর জুড়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করে যাচ্ছেন শিল্পী সুখেন গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী পত্রিকায় রামকিঙ্কর বেইজ সংখ্যায় তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন তাঁর শিক্ষকশিল্পীর। ওই সংখ্যা সম্পাদনাতেও আমরা তাঁর আনুকূল্য পেয়েছিলাম। আমাদের একান্ত অনুরোধে বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্র রচনা করে দিয়েছেন সুখেন গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর আঁকা একটি কালার স্কেচও এই সংখ্যার প্রবেশকচিত্ররূপে মুদ্রিত হল। ইঙ্ক ব্রাশ পেন ও কালার দিয়ে আঁকা শিলং পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি। শিলংয়ের সৌন্দর্য দেখে শিলংয়ের ছবি আঁকা। কিন্তু এ ছবি তাৎক্ষণিক স্কেচ নয়— পাহাড়ের সামনে বসে যে দেখে-দেখে এঁকে ফেলা হল তেমনটা আদৌ নয়। তখন শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা ওইভাবে ছবি আঁকতেন না। পাহাড়ের কোণে কোণে যে সৌন্দর্য তা দেখতেন, উপভোগ করতেন

এবং স্মৃতির মণিকোঠায় তা সঞ্চিত করে রাখতেন; পরে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তৈরি হত নতুন ছবি শিলং পাহাড়ের নতুন চিত্ররূপ নতুন ক্যানভাসে। ছবি দেখাতে দেখাতে রামকিঙ্করের আঁকা শিলং পাহাড়ের ছবিও দেখালেন। জানালেন রামকিঙ্করের এ-ছবিও কিন্তু পরে আঁকা শান্তিনিকেতনে বসে। বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত প্রবেশক চিত্রে আকাশ মেঘ গাছপালা। ঢেউখেলানো পাহাড় রঙের বৈচিত্র্য— সব মিলিয়ে প্রকৃতির একটা পূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত। তাঁব এই মুহূর্তের আঁকা স্কেচ-খাতা থেকে পুরাতন কলাভবন তথা শান্তিনিকেতনের স্মৃতিবিজড়িত দুটি ছবি তুলে এনেছি তাঁর ছবির খাতা থেকে তাঁরই প্রসন্ন অনুমোদনে— তাঁর কথার সঙ্গে আঁকা স্কেচ দুটিও গাঁথা রইল এখানে। তাঁর কলমে তুলিতে তাঁর পরবর্তী শিল্পভাবনায় পুরাতন শান্তিনিকেতন মূর্ত হয়ে উঠুক।

এই সংখ্যার 'সংযোজন'-এ 'রবীন্দ্রনাথের অস্বাক্ষরিত রচনা' বিষয়ে একটি জরুরী বিতর্ক পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মূল বিচার্য বিষয়টি হল পুরাতন সাময়িকপত্রে মুদ্রিত কোনো অগ্রন্থিত অস্বাক্ষরিত রচনা প্রমাণ ব্যতিরেকে ববীন্দ্রনাথের রচনা বলে গ্রহণ কবা কত দূর যুক্তিসঙ্গত। এ বিষয়ে ২০০৬ সালের ১৩ অগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় যে-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার সূত্রে ওই কাগজে পরে বেশ কয়েকটি চিঠিও ছাপা হয়। বিষয়টি রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী বিবেচনায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীরজতকান্ত রায় মহাশয় কয়েকজনকে পত্র দিয়ে এ-বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর পত্রের উত্তরে যে চিঠিগুলি তিনি পান, মূল প্রবন্ধ সহ প্রাপ্ত সেই চিঠিগুলি প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি বিবেচনা করেন। তাঁর মতে 'আমাদের policy হল full information'। যদি প্রবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে রচনাবলীর সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমাণিত হয়। আর যদি রচনাবলী সম্পাদনায় কোথাও কোনো ভুল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটাও যে বিশ্বভারতী গোপন করতে চায় না, বর্তমান সংখ্যার 'সংযোজন' পাঠকের কাছে সেই বার্তাই পৌঁছে দিল। পাঠকেব কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার এই স্বচ্ছ নীতি কার্যকর করা সম্ভব হল উপাচার্য মহাশয়ের উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আনুকূল্যেই। বরাবরই রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ। এই সংযোজন অংশটি অধ্যক্ষ তথা প্রকাশক কর্তৃক অতি সুচারুভাবে সংকলিত। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, ভবিষ্যতে যে-কোনো রচনাবলীতে— বঙ্কিম হোক, শরৎ হোক, বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্কর হোক— কোনো অস্বাক্ষরিত অগ্রন্থিত রচনা বিনা প্রমাণে রচনাবলীতে সংগ্রহ করা আদৌ উচিত কিনা— এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখন যে-কোনো রচনাবলী সম্পাদনার ক্ষেত্রেই আমাদের কাছে বিচার্যের বিষয় হয়ে উঠল।